সেকালের স্মৃতি

নাভানা

পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা ৭২

সেকালের স্মৃতি

কোন পূজনীয় সুহৃদ্ একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিতে ছিলেন, ষাট বৎসরেই আমাদের আয়ুঃ শেষ ; তাহার পর যদি কেহ দুই দশ বৎসর জীবিত থাকেন—তাহা তাঁহার পরমায়ু 'ফাউ' মাত্র। সুতরাং ভগবান এই জীবন-সন্ধ্যায় বহু শোক-দুঃখ ও অশান্তি ভোগের জন্য অঞ্জলি ভরিয়া আয়ুর যে ফাউ দান করিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার আহ্বানের প্রতীক্ষায় দুঃসহ জীবন-ভার বহন করিতে হইতেছে। আশা উৎসাহ, উদ্যম, সুখ-শান্তি সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে ; মহাসিন্ধুর ওপার হইতে মৃত্যুর করুণ সঙ্গীত কানে আসিয়া বাজিতেছে ; এখন 'মরিতে ঝরিতে শুধু বাকী।'

সে কালের স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিয়াছি, এমন সময় দৈনিক 'বসুমতী'তে সার চার্লস টেগার্টের বিলাতী বক্তৃতার সারমর্মের কিয়দংশ পাঠ করিলাম। সার চার্লস্ এখন বিলাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ ; তিনি ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ; কিন্তু তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন ; শ্রীঅরবিন্দকে বিপ্লববাদীদের অন্যতম নেতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়াছেন। আমি জানি, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইবে না এবং অরবিন্দের ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা বহুবার ঘটিয়াছে। তিনি কোন দিন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই ; এখন তিনি সাধন মার্গের যে স্থানে উপনীত হইয়াছেন, সার চার্লসের ন্যায় শক্তিশালী বৈষয়িকের সহস্র আক্রমণেও সেই স্থান হইতে তাঁহার বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রীঅরবিন্দ যে সময় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিনে সর্ব্বোচ্চ নম্বর (record mark) পাইয়া সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় সার চার্লস সাধারণ 'মিঃ টেগার্ট' রূপে বঙ্গীয় পুলিসের একটি ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত ছিলেন ; তখন তাঁহার অরবিন্দের কার্য পদ্ধতির সমালোচনা করিবার শক্তি বা অধিকার ছিল না ; ইংলন্ডে তখন সার চার্লস্ টেগার্টের নামও কেহ জানিত না, কিন্তু অরবিন্দের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্ব শক্তিতে ইংলন্ডের যুবক সমাজ তখন মুগ্ধ। সত্য বটে, অরবিন্দ অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের অযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অরবিন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশতঃ বৃটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করিতেছিলেন, সার চার্লসের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অরবিন্দ চিরদিনই আপনা-ভোলা, সংসারের সুখ-দুঃখে তিনি চিরদিনই উদাসীন। সাংসারিক প্রতিষ্ঠা, উন্নতি, পদ-গৌরব তিনি চিরদিনই তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন। সত্য বটে, অরবিন্দ বরোদা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বরোদার চাকরী লাভের জন্য কোনদিন লালায়িত হয়েন নাই, বরোদার বর্ত্তমান মহারাজা গুণগ্রাহী সার সয়াজি রাও গায়কবাড় সেনাখান খেল সম্‌সের বাহাদুর অরবিন্দের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরোদা সার্ভিসে নিযুক্ত করেন ; এবং সেই সময় বরোদা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল লিট্‌লভেল সাহেব ছুটি লইয়া দেশে যাওয়ায় যদিও অরবিন্দ

তাঁহার পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ গায়কবাড় তাঁহার কলেজে 'মাস্টারী' করিবার জন্যই অরবিন্দকে এদেশে লইয়া আসিয়া চাকরীতে বহাল করেন নাই। চাকরীর প্রতি কোনদিন অরবিন্দের স্পৃহা ছিল না। যে মনুভাই মেটা অরবিন্দের অধস্তন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি পরবর্ত্তী যুগে ও পরিণত বয়সে বরোদা সার্ভিসের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ চাকরী দেওয়ানের পদ এবং 'সার' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন; অরবিন্দের যেরূপ যোগ্যতা ও তাঁহার প্রতি মহারাজার যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তাহাতে আমরা আশা করিয়াছিলাম, অরবিন্দ একদিন বরোদা গবর্নমেন্টের সর্ব্বোচ্চ পদে আরূঢ় হইবেন। কিন্তু মহারাজা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অরবিন্দকে বরোদায় রাখিতে পারিলেন না। অর্থলোভ ও খ্যাতির মোহ অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। সিভিল সার্ভিসে ইহার অধিক কি হইত?

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, অরবিন্দ বরোদায় কোন দিন রাজনীতিচর্চ্চা করিতেন না, বিপ্লববাদের ও কোন ধার ধারিতেন না। তবে সেই সময় তিনি কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটির সমালোচনা করিয়া বোম্বের অন্যতম প্রধান পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 'সেই প্রবন্ধগুলি এরূপ সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ যে, তাহা বোম্বে প্রদেশের শিক্ষিত সমজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধে কংগ্রেসের ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহামতি তিলক তাঁহাকে ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় বিরত হইতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার অমোঘ লেখনীকে বিরামদান করিয়াছিলেন। মহামতি তিলকের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল; এই অপরাধে তাঁহাকে বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহ করা অসঙ্গত। তিনি কোনদিন রান্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই; গরজের অনুরোধে সার চার্লস্ তাঁহাকে আজ বিপ্লববাদীর পর্যায়ভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না!

অরবিন্দ আজন্ম সন্ন্যাসী। বাল্যকাল হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে ইংলন্ডে বাস করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বিলাস-লালসা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পাঁচ টাকা মূল্যের একখানি লোহার খাটিয়ায় একটি পাতলা তোষক ও একখানি কম্বল বিছাইয়া রাত্রিশেষে কয়েক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার পরিচ্ছদের বিন্দুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। আমি দুই বৎসরের অধিককাল তাঁহার বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি; কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দেখি নাই; মূল্যবান জুতা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি তিনি কোনদিন ক্রয় করেন নাই। তাঁহার একমাত্র সখ ছিল সিগারেট-ধূমপান। তাঁহার গৃহে রাশি রাশি সিগারেটের বাক্স সঞ্চিত থাকিত। বোম্বের বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেতার দোকান হইতে প্রতি মাসেই রেল-পার্শেলে কত পুস্তক আসিত তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। সেই সকল পুস্তকের অধিকাংশই উপন্যাস; কেবল ইংরাজী উপন্যাস নহে, এবং ইংরাজী কাব্য ও উপন্যাসেরই যে তিনি অনুরক্ত পাঠক ছিলেন, একথাও বলিতে পারি না; ফরাসী, জর্ম্মান, রুসিয়ান, ইংরাজী, ইটালিয়ান, গ্রীক, কত ভাষার পুস্তক আসিত, তাহা আলমারীতে ধরিত না; ঘরের চতুর্দ্দিকে তাহা পুঞ্জীভূত হইত। তিনি যখন গ্রীষ্মাবকাশে কিংবা অন্য কোন/ছুটী উপলক্ষে দেশে আসিতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে যে সকল ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি আসিত, তাহা নানা ভাষার পুস্তকেই পূর্ণ থাকিত, তাহা বস্ত্রাদি বা পরিচ্ছদের বাহুল্য বর্জ্জিত।

অরবিন্দকে কোনদিন কোন ব্যায়াম করিতে দেখি নাই; তিনি সায়ংকালে তাঁহার বাংলোর প্রকাণ্ড বারান্দায় ঘন্টাখানেক দ্রুতপদে ঘুরিয়াই ব্যায়ামের অভাব পূরণ করিতেন।

কলেজে যখন চাকরী করিতেন, তখন সকাল সকাল কলেজ হইতে আসিয়া কাগজ কলম লইয়া টেবিলের কাছে বসিতেন, এবং কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতার খাতা ছিল; রামায়ণ-মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন, এবং ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়া দ্রুত লিখিয়া যাইতেন। তাহার পর যখন পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। রাত্রি নয়টা বা দশটার মধ্যে টেবিলে বসিয়া যৎসামান্য আহার শেষ করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতেন, রাত্রি একটা, কোনদিন দুইটা পর্যন্ত একই ভাবে পাঠ করিতেন; তাহার পর একটি ক্ষুদ্র ও অনুচ্চ বালিসে মাথায় দিয়া সেই সঙ্কীর্ণ লোহার খাটিয়ায় শয়ন করিতেন। প্রভাতে উঠিয়া এক গ্লাস ইসবগুল-মিশ্রিত শীতল জল পান করা তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল।

অরবিন্দ কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন, কোন দিন মহারাজার তুরুক-সোয়ার তাঁহার নিকট পত্র আনিত, মহারাজা কোন বিষয়ের পরামর্শের জন্য তাঁহাকে প্রাসাদে যাইতে অনুরোধ করিতেন। কোন কোন দিন অরবিন্দ সাহিত্যালোচনায় এরূপ তন্ময় থাকিতেন যে, মহারাজার আদেশ পালনেও বিলম্ব হইত। মহারাজ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেন; তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধ মধুর ছিল বলিয়াই মনে হইত।

দুই বৎসরের অধিককাল একত্র বাস করিয়াও আমি অরবিন্দকে কোনদিন আমার সহিত বা অন্য কাহারও সহিত রাজনীতি সংক্রান্ত কোন আলোচনা করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা কোন কোনদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, কখন কখন ক্লাসের পাঠ জানিয়া লইত; তাহাদের সহিত তাঁহার কাব্য ও সাধারণতঃ সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইত। তিনি তাহাদের নিকট রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। বরোদায় তাঁহার বন্ধু সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত ছিল। কলেজের কোন কোন অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। বরোদার যাদব পরিবারের সহিত অরবিন্দ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহারা মহারাজার হিতৈষী অমাত্য ছিলেন। বড় যাদব পুলিস বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, আমি তাঁহাকে কোনদিন দেখি নাই, দুই একদিন দেখিয়া থাকিলেও তাঁহার কথা আমার স্মরণ নাই। দ্বিতীয় যাদব খাসেরাও বরোদার কাড়ি প্রান্তের (জেলা) 'সুবা' বা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, পরে তিনি বরোদার 'আর সুবা' বা শাসন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুদক্ষ রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি বিলাতের কৃষিকলেজ হইতে কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে আসিয়া বরোদা সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি বরোদায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক এক দিন তাঁহার গরুর গাড়ীতে অরবিন্দের বাংলোয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। সেই গরুর গাড়ী আমাদের দেশের গরুর গাড়ীর মত নহে। গাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ীর মত স্প্রিং ছিল, গাড়ীর উপর সুদৃশ্য আচ্ছাদন, আর গাড়ীর বলদ দুইটি যেন এক একটা হাতী। তাহাদের শিং উজ্জ্বল ধাতু দ্বারা বাঁধানো, গলায় ঘণ্টার মালা। তাহারা ঘোড়ার মত দ্রুত বেগে গাড়ী টানিত। খাসে রাও সাহেবের সহিত অরবিন্দের যে সকল গল্প হইত, তাহা পারিবারিক বা বৈষয়িক; তাঁহাদের কথাবার্ত্তা অধিকাংশ সময় ইংরাজীতেই হইত; কখন কখন উভয়েই মারাঠী ভাষা ব্যবহার করিতেন।

কিন্তু ছোট যাদব লেফ্‌টেনান্ট মাধব রাও যাদবের সহিতই অরবিন্দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন, ইহাও এইরূপ ঘনিষ্ঠতার অন্যতম কারণ। মাধব রাও বিলাতের সামরিক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়া বরোদার 'মিলিটারি সার্ভিসে' প্রবেশ করেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি

লেফটেনান্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন ; তিনি যখন অরবিন্দের বাংলোয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পদোচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতাম। তিনি জানিতেন, আমি গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখি, এজন্য তিনি আমাকে 'পোয়েট' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অরবিন্দের সহিত তাঁহার গল্প আরম্ভ হইলে সে গল্প আর ফুরাইত না, হাসির গর্‌রা উঠিত ; বলা বাহুল্য, সেই সকল গল্পে রাজনীতির সংস্রব থাকিত না। একদিন আমি তাঁহাদের উভয়কে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে দেখিয়া অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, "তোমরা উভয়েই ভয়ঙ্কর গম্ভীর-প্রকৃতির লোক, কিন্তু তোমাদের হাসির ঘটা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।" আমার কথা শুনিয়া অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, "এ আর কি হাসি দেখিলে! দাদামশায় (স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু) ও তাঁহার বন্ধু দ্বিজেনবাবু (স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা) যখন গল্প করিতে করিতে হাসেন, তখন মনে হয়, তাঁহাদের হাসির চোটে ঘরের ছাদ উড়িয়া যাইবে।"—বস্তুত খোলা প্রাণের ও রকম মুক্ত হাসি একালে প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

অরবিন্দ যে অতবড় একজন বিপ্লববাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া কোনদিন কল্পনা করিবারও সুযোগ পাই নাই ; এ জন্য সার চার্লস টেগার্টের অভিমত পাঠ করিয়া আমি বিস্ময় দমন করিতে পারি নাই।

অরবিন্দের আহারেরও কোনরূপ পারিপাট্য দেখিতে পাইতাম না। আমরা উভয়ে একত্র আহার করিতাম, কোন দিন রন্ধন এরূপ কদর্য্য হইত যে, আমার তাহা খাইতে কষ্ট হইত ; কিন্তু অরবিন্দ বিনা প্রতিবাদে প্রশান্ত ভাবে তাহা গলাধঃকরণ করিতেন। তাঁহার বাংলোতে কিছুদিন একটি পাচিকা পাকশালার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল ; তাহার পর একটা গুজরাটী চাকর জুটিয়া যায়। তাহার নাম 'কৃষ্ণা', ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দুই হাতে রূপার বালা, কানে মাকড়ি, অপরিচ্ছন্নতার সজীব মূর্ত্তি। আহার হইত ডাল, ভাজা, কোন একটা তরকারী, মাছের ঝোল, ভাত ও রুটী। কোন কোন দিন পাঁটার মাংস।

ও দেশের পাচকের একঘেয়ে রন্ধনে অবশেষে সহিষ্ণু অরবিন্দেরও অরুচি ধরিয়া গেল ; এজন্য একবার গ্রীষ্মাবকাশে আমরা দেশে আসিয়া একটি পাচক ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিলাম ; সে বাঁকুড়াবাসী। তাহার বাসস্থান এবং কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের লোভে সে আমাদের সহযাত্রী হইয়া সেই বান্ধব বর্জ্জিত গুজরাটে চলিল বটে, কিন্তু সে দেশে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, সে বড় কঠিন ঠাঁই। কেহ তাহার বাঙ্গালা কথা বুঝিতে পারে না, কাহারও সহিত সে মিশিতে পারে না। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে মাছের যে অবস্থা হয়, তাহার অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইল। কয়েকদিন বরোদায় বাস করিয়া সে কাঁদাকাটি আরম্ভ করিল, তাহার উপর তাহার রন্ধন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া আমাদের চক্ষুস্থির! একদিন তাহাকে গলদা চিংড়ির কারি রাঁধিতে বলা হইলে সে প্রায় এক পোয়া ঘি ঢালিয়া চিংড়ি মাছগুলি ভাজিয়া এমন রান্না রাঁধিল যে, আঁস্‌টে গন্ধে তাহা মুখে করা গেল না! চিরসহিষ্ণু অরবিন্দ অবশেষে তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।

দীর্ঘকালের মধ্যে অরবিন্দকে কোন দিন রাগ করিতে দেখি নাই, তাঁহার অসাধারণ সংযমের পরিচয়ে বিস্মিত হইতাম। দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করিলেও মদ্যের প্রতি তাঁহার আসক্তির কোন পরিচয় পাই নাই। বাসায় তিনি সিগারেট ভিন্ন অন্য কোন নেশার জিনিষ স্পর্শ করিতেন না। মহারাজের সহিত ভোজনে যোগদানের জন্য তিনি কখন কখন নিমন্ত্রিত হইতেন, বিলাতী আদর্শে ভোজন টেবিলে শুনিয়াছি, অতি উৎকৃষ্ট মূল্যবান সুরা পরিবেশন করা হইত ; কিন্তু রাজভোজের পর বাসায় ফিরিয়া অরবিন্দ সম্পূর্ণ অবিচলিত ও প্রকৃতিস্থ

থাকিতেন।

অরবিন্দের চিঠিপত্র লিখিবার অভ্যাস অত্যন্ত অল্প ছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজনের নিকট কদাচিৎ চিঠিপত্র লিখিতেন ; তিনি একদিনে একখানি খাতার চারি পাঁচ পৃষ্ঠা কবিতা লিখিতে পারিতেন, কিন্তু কাহাকেও একখানি চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলে তিন চারি দিনেও তাহা শেষ হইত না। 'গ্রে গ্রেনাইট' নামক ধূসর বর্ণের চিঠির কাগজেরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন ; সেই কাগজে তিনি মুক্তার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে পত্র লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার কোন পত্রই প্রায় দীর্ঘ হইত না। তিনি সাধারণত তাঁহার ভগিনী সরোজিনী ও মাতুল যোগীন্দ্রবাবুকেই চিঠিপত্র লিখিতেন। যোগীন্দ্রবাবু প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ; ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, এবং তিনি খ্যাতনামা সাংবাদিক (জর্নালিষ্ট) ছিলেন। এই ব্যবসায়ই তাঁহার জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। অরবিন্দ তাঁহার মাসী ও মাস্‌তুতো ভগিনীদের নিকটও চিঠিপত্র লিখিতেন। সার চার্লস্ টেগার্ট বিপ্লববাদিগণের নেতা বারীন্দ্রকে অরবিন্দের উপদেশে ও পরামর্শে পরিচালিত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বারীন্দ্রকে তিনি কদাচিৎ পত্র লিখিতেন, এমনকি, তাঁহাকে দুইচারি মাসেও একখানি পত্র লিখিতেন কিনা সন্দেহ। বারীন্দ্র অরববিন্দের উপদেশে রাজনীতিক মত সংগঠন করিয়াছিলেন বা সরকারের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দল পাকাইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগ বা সন্দেহ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই মনে হয়। বারীন্দ্র দ্বারা কোন দুরূহ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, ভ্রাতার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে এরূপ ধারণা কোনদিন আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি যতদিন বরোদায় ছিলাম, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে বারীন্দ্র একবারও বরোদায় গমন করেন নাই। আমি দেশে ফিরিয়া 'বসুমতী'র কর্ণধার কর্ম্মবীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর সহযোগিতায় বসুমতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরে অরবিন্দ বরোদার চাকরীর মায়া ও উচ্চপদের আশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া 'বন্দে মাতরমে'র পরিচালন কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন ; সেই সময়ের পূর্ব্বে এবং আমার বরোদা-ত্যাগের পর বারীন্দ্র বরোদায় গিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু অরবিন্দ যতদিন বরোদায় ছিলেন, ততদিন কলিকাতার সাহিত্য বা রাজনীতিক সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ হয় নাই। তিনি অবকাশ উপলক্ষে দেশে আসিয়া অধিকাংশ সময় দেওঘরেই অতিবাহিত করিতেন, কখন কখন ভাগলপুরে তাঁহার এক কাকার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, কদাচিৎ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের গৃহে অবস্থিতি করিতেন।

আমি যখন বরোদায় ছিলাম, সেই সময় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার পত্র ব্যবহার ছিল। সে সময় আমি 'সাধনা' ও 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতাম ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তঁহার পত্রে আমার নিকট অরবিন্দের সংবাদ লইতেন, কিন্তু অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল না 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'—এই কবিতা এই ঘটনার বহু পরে–বঙ্গভূমি যখন অরবিন্দের প্রতিভা ও ত্যাগের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই সময় রচিত হইয়াছিল। তবে মনে হয়, বিশ্বকবি অরবিন্দের প্রতিভার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, নতুবা তিনি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই অরবিন্দের সংবাদ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন ? অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার পক্ষপাতী ছিলেন, তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীতে যে সকল কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সকলগুলি প্রকাশযোগ্য কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি

বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিয়া একটি ইংরাজী 'সনেট' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ সেই সময় ঢাকা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল কবিতা সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিবে,—অরবিন্দ কোনদিন এরূপ ধারণা পোষণ করিতে পারেন নাই। শিক্ষা-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক ঘোষ বিবাহ করিয়াছিলেন, অরবিন্দ হাসিয়া বলিতেন, 'উহা দাদার ব্যয়বহুল বিলাসিতা (এক্সপেন্সিভ লকসারী)।' বরোদার চাকরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অরবিন্দও বিবাহ করিয়া ছিলেন, কিন্তু যাঁহার প্রকৃতি চিরদিনই সন্ন্যাসির প্রকৃতির অনুরূপ, কোন বন্ধন যাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তিনি কেন যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। তিনি কলিকাতার 'বঙ্গবাসী কলেজে'র সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রাতার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; অরবিন্দের শ্বশুর মহাশয় আসামের কৃষি বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয় নাই। কারণ, কিছুদিন পরেই অরবিন্দের পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল।

আমরা যখন বরোদায় ছিলাম, সেই সময় চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেস চিত্রশিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া য়ুরোপ হইতে ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি ইংলন্ড হইতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সুপারিস-চিঠি লইয়া বোম্বে হইতে প্রথমেই বরোদায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বরোদার গায়কবাড় মহারাজা দাদাভাই নৌরজীর সেই সুপারিস চিঠি পাইয়া পরম সমাদরে শশিকুমারবাবুর অভ্যর্থনা করেন ; বরোদার গায়কবাড় মহারাজের একটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত 'অতিথি ভবন' (গেস্ট হাউস) আছে—সেই ভবনে শশিকুমারবাবুর বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শশিকুমারবাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সুপরিচিত ছিলেন, তিনি য়ুরোপ প্রবাসকালে তাঁহার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহা সেই সময়ের 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হইত। শশিকুমারবাবু ময়মনসিংহের অধিবাসী ; প্রথম জীবনে তিনি ময়মনসিংহের কোন বাঙ্গালা স্কুলে পণ্ডিতি করিতেন, কিন্তু চিত্রবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। তাঁহার শিল্পানুরাগের পরিচয় পাইয়া ময়মনসিংহের স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর তাঁহার য়ুরোপে চিত্রশিল্প-শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শশিকুমারবাবু বরোদায় আসিয়া একদিন অপরাহ্নে আমাদের বরোদা ক্যাম্পের বাংলোয় উপস্থিত হইলেন, এবং অরবিন্দের সহিত পরিচিত হইলেন। কয়েকদিনের পরিচয়ে আমাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইল। শশিকুমার বাবু 'গেস্ট হাউসে' বাস করিবার সময় বরোদা সরকার হইতে প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ী পাইয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া তিনি নানাপথ ঘুরিয়া 'গেষ্ট হাউসে' ফিরিয়া যাইতেন, এবং সন্ধ্যার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আলাপ চলিত। শশিকুমার বাবু ফরাসী দেশে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, স্বাধীন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া তিনি পরাধীনতার কষ্ট বুঝিতে পারিতেন, এজন্য তিনি ইংরাজ সরকারের তেমন পক্ষপাতী হইতে পারেন নাই। তিনি কোনদিন বৃটিশ সরকারের শাসননীতির প্রতিকূল সমালোচনা করিলেও অরবিন্দ কোনদিনও তাঁহার কোন উক্তির সমর্থন করেন নাই। সার চার্লস যাঁহাকে বিপ্লববাদীদের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে বা কথায় একদিনও ঐরূপ কোন ভাব পরিস্ফুট হইতে দেখি নাই, এ অবস্থায় কি করিয়া তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি ? শশিকুমারবাবু য়ুরোপ-প্রত্যাগত হইলেও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল আলাপ করিতে পারিতেন না। তিনি ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ;

এবং মিস্ ফ্লামা নাম্নী একটি ফরাসী তরুণীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। হেস মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, মিস্ ফ্লামা এদেশে আসিলে ব্রাহ্ম-মতে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, কিন্তু শশিবাবু বলিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালকগণ সেই অজ্ঞাত কুলশীলা মহিলার সহিত ব্রাহ্ম-মতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই, এ জন্য শশিবাবু অরবিন্দের নিকট অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনুদারতার নিন্দা করেন। অরবিন্দ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন ; কিন্তু তিনি শশিকুমারবাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মিস্ ফ্লামা এদেশে আসিয়া ভারত-গৌরব শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন ; শুনিয়াছি, তাঁহার চেষ্টাতেই বিবাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শশিকুমারবাবু যে সময় বরোদায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় একজন ইংরাজ চিত্রকর শিমলা-শৈল হইতে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সুপারিস-চিঠি লইয়া কিছু কার্য্যের চেষ্টায় বরোদায় আসিয়াছিলেন ; গায়কবাড় মহারাজ সেই ইংরাজ শিল্পীকে অনেকগুলি কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, এজন্য শশিকুমারবাবু সেখানে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই ; তবে মহারাজ তাঁহাকে কয়েকখানি তৈলচিত্র অঙ্কনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ করিয়া তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ কয়েক সহস্র টাকা লইয়াই তাঁহাকে বরোদা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বরোদা-ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি 'গেষ্ট হাউসে' বসিয়া অরবিন্দের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা এরূপ অল্প সময়ে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাঁহার তুলি-চালনার নৈপুণ্যে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। শশিকুমারবাবু কলিকাতায় আসিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাসা লইয়াছিলেন। আমি একদিন তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার ফরাসী পত্নীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই সময় তাঁহার একটি কন্যা হইয়াছিল, সে ঠিক তাহার মায়ের মত হইয়াছিল। শশিকুমারবাবুও অতি সুপুরুষ ; অরবিন্দ বলিতেন, তাঁহাকে দেখিলে ইটালিয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার শিল্প দক্ষতার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাইব, কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত একখানি মাত্র চিত্র সেকালের 'প্রদীপ্ত' নামক মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা একখানি পৌরাণিক চিত্র, স্মরণ হইতেছে, তাহা কুন্তির চিত্র। বঙ্গদেশ এখন শশিকুমারবাবুকে বিস্মৃত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এখন তিনি মধ্য-ভারতের কোন মিত্র-রাজ্যের চিত্রশিল্পীর পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার স্বদেশ বঙ্গদেশে তাঁহার অন্ন জুটিল না, বাঙ্গালার ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বরোদায় অবস্থিতিকালে একজন গুজরাটী ব্যারিস্টার মধ্যে মধ্যে বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন ; তাঁহার নাম বাপুভাই মজুমদার। তিনি পরে কোন দেশীয় রাজ্যের প্রধান বিচারপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ; গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি যথারীতি আহ্নিক-পূজা করিতেন, কিন্তু সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া যখন ইংরাজী ভাষায় আলাপ করিতেন, তখন মনে হইত, কোন খাঁটি ইংরাজ কথা বলিতেছে! তিনি অত্যন্ত সুরসিক ও সরল-প্রকৃতি আমুদে লোক ছিলেন ; তিনি বেশ মজার গল্পে সকলকে হাসাইতে পারিতেন। তিনি দুই একটা বাঙ্গালা বুলি শিখিয়াছিলেন, যখন তখন আওড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। আমাকে দেখিলেই বলিতেন "নভেলিস্ট, আপনি কেমন আছে ?"—"বাবু, আপনি কল্‌কাতা যাবে ?" আমরা এক একদিন পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়া বহুদূর ঘুরিয়া আসিতাম। সেই সময় এবং বাসাতেও অনেক সময় আমাদের নানারকম গল্প চলিত, কিন্তু রাজনীতি বা

ইংরাজের শাসননীতি প্রসঙ্গে কোন আলোচনা আমাদের গল্পে স্থান পাইত না। অরবিন্দ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক ছিলেন। বস্তুতঃ, কথায় বা ব্যবহারে কোন দিন এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই, যাহাতে অরবিন্দকে বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদকামী ভয়ঙ্কর বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারিত। 'বন্দে মাতরম্' দেশাত্মবোধের বিকাশ-চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোনদিন গুপ্তহত্যার সমর্থন করে নাই; অরবিন্দের হৃদয় প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি গুপ্তহত্যার সমর্থনের আরোপ করা কেবল অন্যায় নহে, গর্হিত বলিয়া মনে হয়। অরবিন্দ নরহত্যার সমর্থন করিতে পারেন—ইহা ধারণার অতীত। অরবিন্দের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্ব্বিরোধ নিরীহ সাহিত্য সেবীর এরূপ কলঙ্ক প্রচার অল্প নির্লজ্জতার পরিচয় নহে।

স্বাধীন দেশে আবাল্য প্রতিপালিত হইয়া অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি প্রীতি প্রখর হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আজ বহুদিন পরে মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা—যে দিন আমরা "ষ্টার থিয়েটারে" স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সময় 'বসুমতীর সম্পাদন' ভার আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। সুহৃদ্বর স্বর্গীয় পণ্ডিত সমালোচক শ্রেষ্ঠ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। গ্রন্থকার ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুরোধে সুরেশবাবু আমাদিগকে প্রতাপাদিত্যের অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রিতে 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে লইয়া গিয়াছিলেন। অনেক দিনের কথা ঠিক স্মরণ নাই, তবে মনে হইতেছে সেই দলে অরবিন্দ, শশিকুমার হেস, রাজসাহীর কান্তকবি, স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন, সুরেশবাবু, আমি এবং আরও দুই একজন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলাম। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র প্রতাপাদিত্যের এবং স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি বিক্রমাদিত্য ও রডার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে অভিনয়ের অপূর্ব্ব সাফল্য দর্শনে অরবিন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন—সেই সুগভীর জলধিতে যেন জোয়ারের বান ডাকিয়াছিল। অভিনয় শেষে ক্ষীরোদবাবু সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিনয় কেমন দেখিলেন?"—সুরেশবাবু বলিলেন, "প্রতাপাদিত্য কেমন লাগিল, তাহাই জিজ্ঞাসা করুন, আজ নয়—ইহার উত্তর পরে পাইবেন।"

তাহার পর দুই সপ্তাহ ধরিয়া সাপ্তাহিক 'বসুমতীতে' প্রতাপাদিত্য নাটকের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সুরেশবাবু আর কোন নাটকের সেরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। সেই সমালোচনাটি সুরেশবাবুর সমালোচন-শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আজ যাঁহারা ভারতীয় পুঁথিগত অভিজ্ঞতা ও উচ্চপদের সুযোগ লইয়া অরবিন্দকে বিপ্লবপন্থীদের পথি প্রদর্শক বলিয়া দুর্নামগ্রস্ত করিতেছেন—অরবিন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকিলে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ সকল কথা বলিতে লজ্জা অনুভব করিতেন।

২

সেকালের স্মৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, যদিও তাহা ৩৩/৩৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা এবং সেই সময় যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পরিণত বয়স্ক যুবক, তাঁহাদের অনেকেই কর্ম্মক্ষেত্রে

এখন যশস্বী, প্রতিষ্ঠাপন্ন ও বহুজন সম্মানিত ; তথাপি সেই সময়কে সে-কাল বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সে সময় আমরা ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক ; কিন্তু আমদের বাল্যকালকেই প্রকৃত পক্ষে সে-কাল বলা উচিত। এই জন্য অর্দ্ধশতাব্দী বা তাহারও কিছুকাল পূর্ব্বে সুখশান্তিপূর্ণ, ছায়াশীতল, শ্যামল পল্লীবক্ষে আমাদের শৈশব-জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, এ দীর্ঘকাল পরে তাহার আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা সেই প্রাচীন পল্লীর আবেষ্টন ও প্রভাবের ভিতর কি ভাবে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, তাহার আলোচনা উপলক্ষে অনেক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অপরিহার্য ; লেখকের পক্ষে ইহা ধৃষ্টতা মনে হইলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া সেই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। দেশের স্বনামধন্য বিখ্যাত লেখকগণ স্ব স্ব জীবন-স্মৃতিতে যে সকল আত্ম-কথার আলোচনা করেন, নানা কারণে তাহা উপভোগ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু অখ্যাত ক্ষুদ্র লেখকের আত্মকথার আলোচনা পাঠক-পাঠিকাগণের অপ্রীতিকর, এমন কি, বিরক্তি-জনক হইবারই আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে-কালের পল্লীর পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে নানা কারণে তাহার পরিবর্জ্জন অসাধ্য হইয়া উঠে।

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে যে পল্লী দেখিয়াছিলাম, যে পল্লীতে শান্তিপূর্ণ নিরুদ্বেগ শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত করিয়াছিলাম, গত পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে সেই পল্লীর কি ঘোর পরিবর্ত্তন ! ইহা যে আমাদের সেই সুখময় শৈশবের পল্লী, এখন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ; পল্লীগ্রামে সে-কালের নর-নারীর সহিত এ-কালের নর-নারীর আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, রুচি প্রবৃত্তির কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গপল্লীর কি বিস্ময়াবহ বিশাল পরিবর্তন ! আমাদেব শৈশবের সেই পল্লীর অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। সহরের ছায়ায় সকলই আচ্ছাদিত।

আমাদের বাসপল্লী মেহেরপুর নদীয়া জেলার উত্তর প্রান্তস্থিত মহকুমা। ইহার উত্তরসীমা পদ্মা নদীর দক্ষিণ তটভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত সঙ্কীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী জলঙ্গী বা খ'ড়ে নদী মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে নদীয়াকে পৃথক করিয়াছে। পদ্মার সহিত জলঙ্গী নদীর সংযোগস্থলে, মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব্বসীমা প্রান্তে জলঙ্গী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানি বহু প্রাচীন। এই গ্রামের নাম হইতে জলঙ্গী নদীর নামকরণ হইয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু জলঙ্গী নদী যেখানে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে, বহুদিন পূর্ব্বে সেই স্থানটি পলি পড়িয়া এরূপ ভরাট হইয়াছিল যে, সেখানে নদীর মোহনার চিহ্নমাত্র ছিল না। কৃষকরা সেই পলিমাটির উপর লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া ধান্য রোপন করিত। নদীর উভয় দিকের উচ্চ পাড় দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইত, এক সময় সেখানে নদী ছিল। কিন্তু কয়েক মাইল দূরে এখনও জলঙ্গী নদীর ক্ষীণ জলধারা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে তাহাতে পদ্মার জল প্রবেশ করে। এই জলঙ্গী বা খ'ড়ে নদীর অবশিষ্টাংশে বর্ষা ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময়েও জল থাকে ; সেই জলধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু সংখ্যক গ্রাম, প্রান্তর, শস্যক্ষেত্রের প্রান্ত দিয়া নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের নিকট ভাগীরথীর জলস্রোতের সহিত মিশিয়াছে। কৃষ্ণনগরের অদূরে, মুর্শিদাবাদ রেললাইনের একটি সেতু এই নদীর উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বন্ধনে জলঙ্গী নদীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। রেল-পথের উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় বাঙ্গালার অধিকাংশ নদীর স্রোতের বেগ ও বিস্তার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে দিন কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী যাইতে হইয়াছিল ; বহুদিন পরে পদ্মার লৌহ-শৃঙ্খল 'হাডিং ব্রীজ' বা 'সাঁড়ার পুল' দেখিলাম। উহার দক্ষিণ তীরে নদীয়ার ভেড়ামারা স্টেশন, উত্তরতীরে পাবনা জেলার পাক্সী ষ্টেশন। উভয় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী 'ব্রীজ' পার হইতে তিন

মিনিট সময় লাগিল। কিন্তু পুলের নীচে বিশালকায়া পদ্মার অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ হইল। বহুদূর-প্রসারিত চর স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ জলরেখা বুকে লইয়া কঙ্কালসার মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া আছে। নদীচরে অগণ্য বাবলাগাছ। এই সাঁকো নির্ম্মাণের সময় শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারিগণের বাসের জন্য যে নগর বসিয়াছিল, এখন তাহা বাবলার একটি বিস্তীর্ণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে; দূরে দূরে কচিৎ দুই একখানি পর্ণ-কুটীর। সুবিস্তীর্ণ পুলের উপর গাড়ী উঠিলে পুলের অতিকায় স্তম্ভগুলির নিম্নস্থিত বহুদূর-বিস্তৃত চরের দিকে চাহিয়া সে-কালের কথা মনে পড়িল। প্রথম যৌবনে বরোদায় যাইবার বহুপূর্ব্বে রাজসাহীতেই আমার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। সেই সময় মেহেরপুর হইতে দুইটি বিভিন্ন পথে রাজসাহী যাইবার উপায় ছিল। একটি পথ গরুর গাড়ীর সোজা পথ। মেহেরপুরে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদ্মাতীরবর্ত্তী আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে উপস্থিত হইতাম, এবং বেলা ১২টা বা ১টার সময় আই·জি· এস· এন· কোম্পানীর ষ্টীমারে চাপিয়া অপরাহ্ন ৪টা বা ৫টার সময় রাজসাহীর ষ্টীমার-ষ্টেশন 'আখড়ার ঘাটে' পৌঁছিতাম। কখন কখন মেহেরপুর হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া দামুকদিয়া ঘাটে নামিতাম, সেখানে প্রভাতে ৮টার সময় আই· জি· এস· এন· কোম্পানীর ষ্টীমার ধরিতাম। একবার ষ্টীমার ষ্টেশনে ষ্টীমার পাইলাম না। শুনিলাম, পদ্মার চরে ষ্টীমার দুইদিন হইতে 'ইন্টার্নড'। অগত্যা দামুকদিয়া ঘাটে রেলের ষ্টীমার 'আলিগেটর' কি 'ক্রোকোডাইল' ঠিক স্মরণ নাই, অবলম্বন করিয়া সারা স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর নাটোর, এবং নাটোর হইতে গো-শকটে চৌদ্দক্রোশ দূরবর্ত্তী রাজসাহীতে প্রত্যাগমন। সেই সময় পদ্মার যে বিস্তার তরঙ্গরাশির যে উদ্দাম নৃত্য, যে লীলাভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, এখন পদ্মার অবস্থা দেখিয়া তাহা স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু তথাপি পদ্মাকে বিশ্বাস নাই; কে জানে, মানুষ তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারিবে কিনা? অনেকের ধারণা, পুলের নীচে যে চর পড়িতেছে, তাহা ক্রমশঃ ভরাট হইবে, নদী বাঁকিয়া অন্য দিকে চলিয়া যাইবে; জলস্রোত অন্য খাদে বহিবে, এবং পুল যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই অকর্ম্মণ্যভাবে দাঁড়াইয়া দূর হইতে নবপথগামিনী পদ্মার অঙ্গ ভঙ্গ নিরীক্ষণ করিবে! তখন হয়ত পদ্মার উপর আর একটি পুল নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হইবে, এবং সে জন্য গৌরীসেনের অক্ষয় ভাণ্ডারে টাকার অভাব হইবে না।

কথাটা মিথ্যা বা কল্পনার বিকার বলিয়া মনে হয় না, কারণ পদ্মার গতি এইরূপই বিচিত্র! মনে পড়ে, শৈশব-কালে জলঙ্গী গ্রামে মামার বাড়ী যাইতাম। মামার বাড়ীর অট্টালিকার ছাদ হইতে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বহুদূর মুক্ত প্রান্তর এবং তাহার প্রান্তভাগে মসীলেখাবৎ একটা কালো দাগ দেখিতে পাইতাম; শুনিতাম, উহাই পদ্মা। এখন পদ্মা সেখানে নাই; কয়েক বৎসরে তিন চারি ক্রোশ সরিয়া আসিয়া জলঙ্গী গ্রামখানি গ্রাস করিয়াছে। জলঙ্গীর অট্টালিকা শ্রেণী, সুবিস্তীর্ণ আম-কাঁঠালের বাগান,—পুষ্করিণী, থানা, বাজার, জেলা-বোর্ডের সুপ্রশস্ত পথ এবং পথপ্রান্তবর্ত্তী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট-পাকুড়ের গাছ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; এখন আবার সেখানে চর পড়িতেছে। গত চল্লিস বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন? আরও চল্লিস বৎসর পরে হার্ডিং সেতুর কি অবস্থা হইবে—কে বলিতে পারে?

যে পলাশীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালার শেষ গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছিল, সেই পলাশী আমাদের মেহেরপুর মহকুমার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পলাশীর প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত এই মহকুমার সীমা প্রসারিত। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে মুর্সিদাবাদের সীমা; কিন্তু সিরাজের সহিত ক্লাইভের যুদ্ধের সময় পলাশীক্ষেত্রে যে আম্রকানন ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শুনিয়াছি, পলাশীক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি অনুচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ

আকাশের দিকে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলিত করিয়া মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ও সিরাজের শোচনীয় পরাজয়ের বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই যুদ্ধের আর কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই ; তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পলাশীর মাঠে "কি হ'লো রে জান। পলাশীর ময়দানে নব্বাব হারালো পরান"—এই করুণ গান গাহিয়া গ্রাম্য কৃষককরা হল কর্ষণ করিতে করিতে মাটীর নীচে কামানের দুই একটি গোলা পাইয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাহা পাওয়া না। এখন ভাগীরথীর উভয় তীরে রেলের লাইন ; পূর্ব্বতীরে পূর্ব্ববঙ্গ-রেল পথের বহরমপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি ষ্টেশন ; পশ্চিমতীরে ই আর রেলপথের খাগড়াঘাট ষ্টেশন। এখন বেলা ৯টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া বহরমপুরে ট্রেনে চাপিলে বেলা ৪টার পূর্ব্বে কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া যায় ; কিন্তু সেকালে বহরমপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে অনেকে উইল করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিতে হইত। আমাদের মেহেরপুর হইতে গরুর গাড়ীতে দুই দিনে খাগড়ায় আসিতে হইত। সেকালে ও একালে কত প্রভেদ। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

আমাদের গ্রামে সেকালে দুই ঘর বড় জমীদার ছিলেন। এক ঘর ব্রাহ্মণ, তাঁহারা "মুখোয্যেবাবু" নামে পরিচিত ; আর এক ঘর—মল্লিকবাবুরা বৈদ্য। এখনও এই দুই ঘর বর্ত্তমান ; কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ প্রাচীন জমীদার-বংশের যে অবস্থা, এখন তাঁহাদেরও সেই অবস্থা। বহু শরিকে বিভক্ত হওয়ায় উভয় বংশই দুর্ব্বল ও হৃত গৌরব। তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাও ম্লান হইয়াছে।

আমাদের বাল্যকালে এই মুখোপাধ্যায়-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বর্গীয় দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম। তিনি সরল প্রকৃতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দোতলা বৈঠকখানার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডে প্রায় দেড় বিঘা জমীর উপব আমাদের বসত বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাড়ীতে মৃৎপ্রাচীর বিশিষ্ট চারিখানি ঘর ছিল ; তাহাদের চাল ছিল উলু-খড়ের। প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে আমার পিতামহ উলুখড় কিনিয়া ঘরের চালগুলি নূতন করিয়া ছাইয়া লইতেন। পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে জমীদারী সেরেস্তার চাকরী করিতেন ; আমার দুই কাকা তাঁহার নিকট থাকিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে লেখা পড়া করিতেন ; ছোটকাকা হুগলীর নর্ম্মাল স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পড়িতেন। আমার পিতামহ বাড়ীতেই থাকিতেন এবং সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বাল্যকালে মুখোয্যে জমীদারবাবুর দোতলার বৈঠকখানায় গীতবাদ্য ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। জমীদারবাবু পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া সঙ্গীতালোচনা করিতেন। তাঁহার দোতলা হইতে আমাদের অন্দরমহল দৃষ্টিগোচর হইত, এ জন্য আমার পিতামহ আমাদের বাড়ীর উত্তরদিকে, জমীদারবাবুর দোতলার দক্ষিণদিকের দ্বার, জানালার সমান উচ্চ করিয়া দরমার বেড়া দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দীননাথবাবুর পরিবারবর্গের সহিত আমাদের পরিবারের সদ্ভাবের কখন অভাব হয় নাই ; তাঁহাদের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, সেই সময় আমার স্বর্গীয় পিতামহ এই বংশের পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এ জন্য তিনি এই পরিবারকে প্রভুর ন্যায় সম্মান করিতেন, এবং তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও আমরা শূদ্র হইলেও আমাদের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতেন। অধিক কি, এই পরিবারে যাঁহারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, তাঁহাদিগকে "কাকা" বলিয়া ডাকিতাম, এবং নিজের কাকার মত সম্মান ও ভক্তি করিতাম। একালের ছেলেরা পিতার সহোদরকেও সেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা বা ভয় করে না। তখন হিঁদুয়ানীর সদাচারনিষ্ঠা একাল অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল ; তথাপি স্মরণ হয়, জমীদার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে

তাহাদের রান্নাঘরে একসঙ্গে বসিয়া ভাত খাইয়াছি। অবশ্য একাল হইলে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিত না ; কারণ, একালে হিন্দুধর্ম্মের প্রহরিস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের প্রবীণ সম্পাদকবাবু সত্তরের কোঠায় আসিয়াও তাঁহার রচিত ভ্রমণ কাহিনীতে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি খড়্গপুর ষ্টেশনে রেঁস্তোরা গাড়ীর পরম মুখরোচক অন্ন ব্যঞ্জন তৃপ্তির সহিত গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন ! যে সময় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবলবেগে সংগ্রাম চলিতেছে, সে সময় একথা স্বীকার করিলে যথেষ্ট 'মরাল করেজ্' প্রদর্শিত হয় কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার সময় কোন স্পষ্টবাদী গোঁড়া হিন্দু এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে আত্মসমর্থনের উপায় থাকে কি ?

আমার বাল্যকালে স্বর্গীয় দীননাথবাবু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সেকালের বাবুগিরির আদর্শ কিছু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি সোনার গড়গড়ায় দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত মূল্যবান্ তাম্রকূটের ধূম পান করিতেন, এবং গড়গড়ার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন তাঁহার কর্ণ-কূহরে প্রবেশ করিয়া কর্ণপীড়া উৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় গড়গড়াটি একতলায় রাখিয়া, তাহার সুদীর্ঘ নলের সাহায্যে দোতলায় বসিয়া ধূমপান করিতেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষের অদূরে তাঁহাদের খিড়কির সীমায় দুই একটি তালগাছ ছিল। একটি তালগাছের নীচে একখানি পর্ণ কুটীরে একটি চণ্ডালিনী বাস করিত ; তাহার নাম ইচ্ছা। আমাদের বাল্যকালে ইচ্ছা বৃদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটিও চুল পাকে নাই বা দাঁত পড়ে নাই। ইচ্ছার মত ঝগড়াটে স্ত্রীলোক দেখা দূরের কথা, নাট্যকারের কল্পনা করাও কঠিন ! ঝগড়া করিবার লোক না পাইলে সে বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করিত ! তালপাতা বায়ুপ্রবাহে কম্পিত হইত, সন্-সন্ শব্দ করিত, সেই সঙ্গে ইচ্ছার মাথা গরম হইত ; সে তালগাছ ও বাতাসকে গালি দিত ! সুতরাং বলা-বাহুল্য, পাড়ার স্ত্রীলোকদের সহিত সামান্য কারণে বা অকারণে তাহার ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার কর্কশ কণ্ঠের বিরাম ছিল না। দীননাথবাবু তাহাকে বহুবার ঝগড়া করিতে নিষেধ করিয়াও তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারেন নাই ; তাঁহার যেরূপ প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে ইচ্ছাকে তাহার কুটীর হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন, তাঁহার অমোঘ আদেশে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র কুটীরখানি বিধ্বস্ত হইতে পারিত ; কিন্তু তিনি এইভাবে তাহার ক্ষতি না করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য এক বিশেষ শক্তি 'অর্ডিনান্স' জারি করিলেন ; তাহা সম্পূর্ণ 'অরিজিনাল', এবং তাহার ফল এরূপ অব্যর্থযে, পুলিসের দারোগাবাবুদেরও তাহা অনুকরণের অযোগ্য নহে। তাঁহার আদেশে তাঁহার পাইক ইচ্ছার স্বজাতি লোহারাম সর্দ্দার একটা প্রকাণ্ড আড়াইমনী বস্তা আনিয়া, ইচ্ছার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে তাহার ভিতর নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর একটা প্রকাণ্ড মর্দ্দা বিড়াল ধরিয়া আনিয়া, সেটাকে সেই বস্তায় পুরিয়া বস্তার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। বিড়ালটা পলায়নের পথ না পাইয়া ইচ্ছাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। ইচ্ছা গলা ছাড়িয়া যতই চীৎকার করে, লোহারাম, ততই বলে, "চ্যাঁচা মাগী, আরও জোরে ! বিড়াল যতক্ষণ তোর টুঁটি ছিঁড়ে মুখ বন্ধ না করায়, ততক্ষণ বস্তার মুখ আল্‌গা করছিনে।"—অবশেষে সে বস্তার ভিতর অতিষ্ঠ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল আর সে কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিবে না ; বাবু আর কোনদিন তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইবেন না।—তখন লোহারাম বস্তার মুখ আল্‌গা করিল। সেইদিন হইতে ইচ্ছা চাঁড়ালনীর কলহ-প্রবৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু তাহার গালে, কপালে ও দেহের বিভিন্ন অংশে বিড়ালের সুতীক্ষ্ণ দন্ত নখরের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। কেহ কেহ ইচ্ছাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, "ইচ্ছে, আর যে তোর গলার আওয়াজ শুনতে পাইনে ?" —ইচ্ছা বলিয়া ছিল, দীনুবাবু বলেছে—"এবার আর বিড়াল নয়, বস্তার মধ্যে আমাকে পুরে কুকুর ছেড়ে দেবে।"

বিড়াল ইচ্ছার পরিধেয় বস্ত্রখানি আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দেওয়াতে বাবু তাহাকে একখানি নূতন কাপড় বকশিস্ দিয়াছিলেন ; ইহাতেই তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছিল ; কিন্তু সে আর কোন দিন নূতন বস্ত্রের লোভ করে নাই।

এই মুখোয্যে-বংশের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়। সে সময় মেহেরপুর অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের প্রবল প্রতাপ। বাবু মথুরানাথকে বা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র চন্দ্রমোহনবাবুকে দেখি নাই। মথুরানাথ এই জমীদার-বংশকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন যে, সেই সময় কোন কবির দলের ওস্তাদ উৎসবের আসরে গান করিতে আসিয়া পূজার ঘটা দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

"সত্য যুগে সুরথ রাজা
করেছিলেন দেবীর পূজা,
ত্রেতা যুগে রাম।
কলিযুগে মথুরানাথে
সদয় হলেন ভবানী,—
হায় কি পূজোর ঘটা—
মেহেরপুরে মহিষমর্দ্দিনী।"

এহ ছড়াাঢ াকছুাদন পূর্ব্বেও মেহেরপুরের প্রাচীন অধিবাসীদের মুখে শুনিয়াছি। এখন তাঁহারা সকলেই পরলোকগত।

মেহেরপুর কাশিমবাজারের জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, মথুরাবাবু কাশিমবাজারের স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণনাথের নিকট হইতে মেহেরপুরের জমীদারী পত্তনী লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিশ্চিন্তপুর কান্সার্নের নীলকর ম্যানেজার সাহেব অনেক কৌশলে রাজা কৃষ্ণনাথকে বশীভূত করিয়া যৎসামান্য অর্থব্যয়ে এই জমীদারী ইজারা লইয়াছিলেন। মথুরাবাবু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু সাহেবী চাতুর্য্য ও কৌশলের নিকট তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ পরাজয় বহুবারই ঘটিয়াছে।

মথুরানাথ মেহেরপুরের জমীদারী হস্তগত করিতে না পারিলেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এই অঞ্চলের নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সমান তেজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একবার মথুরানাথের পুত্র চন্দ্রমোহনবাবু কৃষ্ণনগরের সদর হইতে পাল্কীযোগে মেহেরপুর আসিতেছিলেন, সেইসময় কোন নীলকুঠীর ম্যানেজার লাঠিয়াল পাঠাইয়া তাঁহার পাল্কী আটক করিয়া অপমান করিয়াছিল। এই সংবাদ শুনিয়া মথুরানাথ এক রাত্রিতে সহস্রাধিক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলের সকল নীলকুঠী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কুঠীয়ালদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। পথের ধারে মথুরানাথের অট্টালিকার দেউড়ি ছিল ; শুনিয়াছি, এই অঞ্চলের নীলকর সাহেবরা সেই দেউড়ির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় ঘোড়া হইতে নামিয়া দেউড়ি পার হইতেন। একালে ইহা উপকথার ন্যায় অবিশ্বাস্য !

কিন্তু চন্দমোহন অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন ; একে ব্রাহ্মণ, তাহার উপর জমীদার,

গ্রামের কোন সাধারণ লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন না করিলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার বহু পূর্ব্বে যখন মেহেরপুরে জমীদার চন্দ্রমোহনের পরাক্রম দুর্দ্দমনীয়, সেই সময় মেহেরপুরে বলরামচন্দ্র নামক একজন ধর্ম্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাদের নাম 'বলরামী সম্প্রদায়।' স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে এই বলরামী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম মেহেরপুরের মালো-পাড়ায় অস্পৃশ্য হাড়ীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু হাড়ীর ঘরে জন্মিয়াও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি যৌবনকালে মল্লিক জমীদারদের গৃহ-বিগ্রহ আনন্দবিহারীর দেবায়তনের রক্ষী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই চাকরী পাইয়া বলরাম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বিগ্রহের বাসগৃহে প্রবেশ করিতে না পাইলেও দূরে থাকিয়া ভক্তিভরে আনন্দবিহারীর পূজার্চ্চনা করিতেন। আনন্দবিহারীর সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, মস্তকে শিখিপুচ্ছ-শোভিত রত্ন-মুকুট ও চরণযুগলে সোনার নুপূর ছিল ; বলরামের প্রতি এই সকল অলঙ্কার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

বলরামচন্দ্র এই কার্য্যের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। কারণ, সে সময় আমাদের নদীয়া জেলার জমীদারবর্গের বরকন্দাজ, পাইক বা সিপাই-শান্ত্রীদলের মধ্যে বলরামের মত সুদক্ষ তীরন্দাজ আর একজনও ছিল না। সেকালের প্রাচীন গ্রামবাসীরা বলিতেন, সেই সময় নদীয়া বহরমপুরে সুপ্রসিদ্ধ দস্যুদল-নায়ক বিশে গোয়ালার অত্যাচারের সীমা ছিল না। একালের মত সেকালের পুলিসের শক্তি ও শৃঙ্খলার তেমন পরিচয় পাওয়া যাইত না। তাহার উপর পুলিসের দারোগা, জমাদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ তেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল না এবং যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনই তাহাদের অনেকের লক্ষ্য ছিল। 'চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সাবধান হ'তে'—এই সর্ব্বজন বিদিত উক্তি তাহাদের অনেকেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারিত। এজন্যে বিশে গোয়ালা 'বিশ্বনাথবাবু' এই নামগ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সদলে দস্যুবৃত্তি করিত। সে বড় বড় জমীদারদের পত্র লিখিয়া তাহাদের বাড়ী ডাকাতী করিতে যাইত। সে পাল্কীতে যাইত, তাহার অনুচররা সশস্ত্র তাহার অনুসরণ করিত। পরাক্রান্ত জমীদাররা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে কাঁপিতেন। সে যেখানে ডাকাতী করিতে যাইত, সেই স্থান হইতে অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিতে না ; কোন জমীদারের লাঠীয়াল বা পাইক-বরকন্দাজরা তাহার গতিরোধ করিতে পারিত না।

মল্লিকবাবুরা একদিন বিশ্বনাথবাবুর নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। সে লিখিল, কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে সে তাঁহাদের গৃহে সদলে উপস্থিত হইবে, যদি ইহাতে তাঁহাদের অনিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অমুক মাঠে রাত্রি এক প্রহরের সময় কোন পাইক মারফৎ তাহাকে দুই হাজার টাকা সেলামী পাঠাইতে হইবে ; সেই টাকা পাইলে সে সদলে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবে, নতুবা তাঁহাদের মঙ্গল নাই।

মল্লিকবাবুদের বাড়ীর কর্ত্তা বিশ্বনাথবাবুর এই পত্র পাইয়া প্রমাদ গণিলেন, বিনা-মেঘে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি প্রাণ ভয়ে ও মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাহার নিদ্রাত্যাগ করিলেন, দুর্গোৎসবের অব্যবহিত পরে নগদ দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইবারও সুবিধা হইল না।

প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বিশস্ত অনুচর বলরামের হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল।

তিনি বিশ্বনাথবাবুকে ও তাহার অনুচরগণকে একাকী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফিরাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলরামের প্রভুভক্তিতে মুগ্ধ হইলেও এই কার্য্য তাঁহার অসাধ্য মনে করিয়া তিনি বলরামের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু বলরাম তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না ; জমীদারবাবুকে অবশেষে অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিতে হইল। বলরাম ধনুঃশর মাত্র সম্বল করিয়া 'রণ পা'য়ের' (একজোড়া সুদীর্ঘ বংশদণ্ড, তাহার গ্রন্থিতে পা রাখিয়া দস্যুরা দ্রুতবেগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিত) সাহায্যে মেহেরপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বনাথবাবুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কোজাগর-পূর্ণিমার রাত্রি। রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বেই সেই প্রান্তরের সীমা প্রান্তে বিশ্বনাথবাবুর পাল্কীর বেহারাদের কণ্ঠোচ্চারিত হুম্ হুম্ হুক্কা, হুম্ হুম্ হুক্কা' ধ্বনি বলরামের কর্ণগোচর হইল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুচরবর্গের ভীষণ হুঙ্কার!—বলরাম চক্ষুর নিমেষে বিশ্বনাথবাবুর পাল্কীর বেহারাদের গতিরোধ করিলেন। বিশ্বনাথ ডাকাত বিস্মিতভাবে পাল্কী হইতে নামিয়া তরবারি কোষমুক্ত করিল। বলরামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—তিনি মল্লিকবাবুদের দ্বারবান।

বিশ্বনাথ অবজ্ঞাভরে বলিল, "তোদের জমীদারবাবুকে যে দু'হাজার টাকা সেলামী পাঠাতে লিখেছিলাম—তা এনেছিস?"

বলরাম মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এক পয়সাও আনি নি। আমি বেঁচে থাকতে তুমি আমার মনিবের বাড়ীতে ডাকাতী করবে? তা হবে না বাবু, তুমি আর তোমার দলের লোক আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে আমাকে হঠাও—তারপর মেহেরপুরে ডাকাতী করতে যেও।"

বিশ্বনাথ তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "তুই ত একটা ফড়িং রে, তোকে সাবাড় করতে কতক্ষণ? কিন্তু তুই একা, আমরা সকলে মিলে তোকে খুন করবো বিশ্বানাথবাবু সে রকম কাপুরুষ নয়। শুনেছি, তুই ভালো তীরন্দাজ, তোর শক্তির পরিচয় দে।—ঐ দ্যাখ, পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে আকাশে কতকগুলা বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছে, যদি তীর দিয়ে ওদের একটাকে বিঁধে মাটীতে ফেলতে পারিস, তা হ'লে বুঝবো, তুই সত্যই বাহাদুর ; আমি পরাজয় স্বীকার ক'রে ফিরে যাব। যদি না পারিস, তা হ'লে আজ মেহেরপুরে গিয়ে তোর মনিবের সর্ব্বস্ব লুঠ করবো, কেউ তাকে রক্ষে করতে পারবে না।"

বলরাম ঊর্ধ্বাকাশে দৃষ্টিপাত করিলেন। কাজাগরী পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে চরাচর প্লাবিত। সেই আলোকে বহুশত গজ উর্দ্ধে একপাল বুনো হাঁস, যেন গগন-সাগরে সাঁতার দিতেছিল। বলরাম চক্ষুর নিমেষে ধনুকে বাণ জুড়িলেন, উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বাণ ছুঁড়িলেন। দুই মিনিটের মধ্যে একটি হাঁস শরবিদ্ধ-বক্ষে ধরাশায়ী হইল। কয়েক গজ দূরে হাঁসটাকে মাটীতে পড়িয়া পক্ষান্দোলন করিতে দেখিয়া বলরাম তাহা কুড়াইয়া আনিলেন, এবং বিশ্বনাথবাবুকে উপহার দিলেন। বিশ্বনাথের অনুচররা স্তম্ভিত, সকলেই বলরামের লক্ষ্যভেদের কৌশল লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাক। বিশ্বনাথ বলরামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুই একটা মানুষ। তোর শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি খুশী হয়েছি! আমার যে কথা, সেই কাজ। এই মাঠ থেকেই আমি ফিরে যাচ্ছি।"

বিশ্বনাথবাবু সদলে প্রত্যাগমন করিল। শুনিয়াছি, জমীদারবাবু কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ বলরামকে পুরস্কার দানে উদ্যত হইলে বলরাম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে একদিন রাত্রিকালে বলরামের অজ্ঞাতসারে আনন্দবিহারীর অঙ্গ হইতে তাঁহার অলঙ্কারাদি অপহৃত হইলে প্রভুভক্ত বলরামকেই চোর বলিয়া সকলে সন্দেহ করিয়াছিল।

এই মিথ্যা অপবাদে বলরাম এরূপ মর্ম্মাহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই রাত্রিতেই মেহেরপুর ত্যাগ করিলেন। বহুদিন পর্যন্ত কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই ধারণা হইল, বলরাম মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

বহু বৎসর পরে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া বলরাম মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার কেশ-বেশ দরবেশের মত। বলরাম সুদীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যার ফলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ; দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তিনি বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তাহাদের অনেকে তাঁহার সঙ্গে মেহেরপুরে আসিলে ভৈরব নদের তীরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া সশিষ্য সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। নদতীরবর্ত্তী সেই আশ্রমটি এখনও 'দরবেশের আখড়া' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার শিষ্য ও অনুচররা সাধারণতঃ 'দরবেশ' নামে পরিচিত। এই সকল দরবেশ ভিক্ষাজীবী। তাহাদের 'আখড়ায়' স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামী দরবেশরা 'জয় বলরাম চন্দ্র' বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে। তাহারা যে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, সেই পাত্র আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'দরিয়াবাদ নারিকেলের খোল' নামে প্রসিদ্ধ। একালে বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুক আর অধিক দেখা যায় না ; ঐরূপ ভিক্ষাপাত্রও প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে। বৎসরান্তে দোলের সময় মেহেরপুরস্থ 'দরবেশের আখড়ায়' বলরামের দোল হয়। সেই উপলক্ষে বঙ্গের, বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের নানা জেলা হইতে বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসক ও উপাসিকা-বৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে। তিনদিন উৎসব স্থায়ী হয় ; একদিন লুচির ফলার, একদিন চিঁড়ার ফলার, এবং একদিন অন্ন-মহোৎসব হইয়া থাকে। বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত সকল লোক একত্র বসিয়া আহার করে, তাহারা জাতিভেদ মানে না।

বলরাম কোন দিন নিজের উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চেলা ও শিষ্য-সেবকরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। বলরামের উদ্দেশ্যে তাহারা মস্তক নত করে, কিন্তু অন্য কাহাকেও প্রণাম বা নত মস্তকে অভিবাদন করে না।

এইবার পূর্ব্ব-কথার অনুসরণ করিব।

বলরাম সিদ্ধিলাভ করিয়া দীর্ঘকাল পরে মেহেরপুরে ফিরিলে এবং শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ সহ নদীতীরে 'আখড়া' স্থাপিত করিলে মেহেরপুরের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসিবর্গের মধ্যে তুমুল আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইল। অনেকে, বিশেষতঃ উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকরা বলরামকে 'প্রতারক' 'বুজরুক', 'ভণ্ড' প্রভৃতি শব্দে অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। বলরামের শিষ্যরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের গ্রাহ্য করে না, তাঁহাদের চরণে মস্তক অবনত করে না ; তাহাদের এই স্পর্দ্ধা কেহই মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। বলরামও তাঁহার শিষ্যদের এই প্রকার অবিনয় ও 'তেজের' কথা নানা প্রকার অত্যুক্তি ও অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ভূ-স্বামী চন্দ্রমোহন বাবুর কর্ণগোচর হইল। চন্দ্রমোহন বাবু একটা নগণ্য হাড়ীর চেলাদের দম্ভের কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "বটে ! একটা অস্পৃশ্য হাড়ীর চেলাদের এত তেজ !" —বাবুর পারিষদরা চতুর্গুণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার একবার পরীক্ষা করলেই সব জান্‌তে পারবেন ; আপনার ছি চরণে এই দুনিয়ার কে মাথা না নোয়ায় ? কার ঘাড়ে তিনটি মাথা যে, আপনাকে প্রেণাম না ক'রে সাম্‌নে দাঁড়াবে ? কিন্তু ঐ বলা হাড়ীর চেলারা মনিষ্যিকে মনিষ্যি জ্ঞান করে না ;—ধর্ম্মাবতার এর একটা বিহিত না করলে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের আর মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে না !"

একদিন হঠাৎ ইহা পরীক্ষার অবসর হইল। চন্দ্রমোহন পথের ধারে তাঁহার বৈঠকখানায়

বসিয়াছিলেন—সেই সময় বলরামের একটি ভক্ত শিষ্য লখা একটি মাটীর ভাঁড় লইয়া সেই পথে কলুবাড়ীতে তেল আনিতে যাইতেছিল। প্রত্যেক পথিক জমীদারবাবুকে বৈঠকখানায় ধূমপানে রত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল, কিন্তু বলরাম-শিষ্য লখা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই, এইভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এক জন মো-সাহেব লখার ব্যবহারের প্রতি জমীদারবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "ঐ দেখুন, বলার চেলাটা মাথা উঁচু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, ধর্ম্মাবতার যেন ওর কাছে মশা-মাছির তুল্যি!"

জমীদারবাবু হুঙ্কার দিতেই সোনা ও রূপো নামক তাঁহার দুইজন বিশালদেহ অনুচর তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল। কিন্তু জমীদারবাবুকে কোন কথা বলিতে হইল না, তাঁহার মো-সাহেবের ইঙ্গিতে সোনা ও রূপো লখাকে ঘাড় ধরিয়া প্রায় শূন্যে তুলিয়া বাবুর সম্মুখে হাজির করিল।

একজন মো-সাহেব বলিল, "বেটা, তুমি বলা হাড়ীর চেলা হয়ে কি পীর না কেষ্টো বেষ্টো হয়েছ যে, রাজার সামনে দিয়ে চলে গেলে, পেন্নামটা করতেও তোমার মরজি হলো না? রাজা, ব্রাহ্মণ, সব তোমার কাছে তুশ্চ! তুমি ভেবেছো কি? এক্ষুনি ওঁর পায়ের কাছে গড় হয়ে দণ্ডবত করো।"

লখা নড়িল না, মাথা নামাইল না; মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "উনি রাজা, বামুন, সব মানি। কিন্তু ছিরি বলরাম চন্দরের ছিচরণে যে মাথা নুইয়েছি, সে মাথা আর কোথাও নোয়াতে পারবো না—তা তিনি যে হোন, আর যত বড়ই হোন।"

হঠাৎ বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুলকি পড়িল। পারিষদের ইঙ্গিতে রূপো ও সোনা লখাকে বৈঠকখানার থামে বাঁধিয়া এরূপ প্রহার করিল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল। তাহার দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল; কিন্তু সকলে চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণ রাজ চরণে তাহার উন্নত মস্তক অবনত করাইতে পারিল না। অগত্যা জীবন্মৃত অবস্থায় তাহাকে মুক্তিদান করা হইল।

লখা রক্তাক্ত দেহে টলিতে টলিতে অতিকষ্টে অদূরবর্ত্তী আখড়ায় ফিরিয়া আসিল এবং বলরামের পদপ্রান্তে শোনিতাপ্লুত অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঠাকুর, তোমার ছিরিচরণে যে মাথা নুইয়েছি, সেই মাথা চন্দোর-মোহনের পায়ের কাছে নোয়াতে পারি নি ব'লে তার মোসাহেবগুলার হুকুমে তার পাক-বরকন্দাজ আমার কি দুর্দ্দশা করেছে, দেখ ঠাকুর! আমি ত কোন অপরাধ করিনি, বিনি অপরাধে মেরে আমার হাড় গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে, আঁচড়িয়ে খাম্‌চিয়ে আমার চামড়া ছিড়ে নিয়েছে; এই দেখ রক্ত আর ঠেক মানছে না। তোমাকে এই অন্যায়ের বিচার করতে হবে ঠাকুর! আমি জানি, তুমি সব পারো। তোমার ছিরি মুখ থেকে একটা শাপ বেরুলে ওরা সবাই উড়ে-পুড়ে যাবে, সকলে ছাই হয়ে যাবে। তুমি শাপ দিয়ে ওদের ধ্বংস কর, ঠাকুর! তোমার ক্ষ্যামোতা ওদের একবার দেখাও, প্রভু বলরামচন্দ্র! তুমি থাকতে তোমার দাসানুদাসের এত শাস্তি?—তোমাকে প্রতিফল দিতেই হবে ঠাকুর!"

বলরাম আহত শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "লখা, তুই নালিশ করছিস্ কাদের নামে? শিয়াল-কুকুরে কামড়ালে কেউ কি তাদের নামে নালিশ করে? তুই বলবি, ওরা কি শিয়াল-কুকুর? ওরা যে মানুষ। কিন্তু আমি ত দেখছি, ওরা মানুষ নয়, ওরা শিয়াল-কুকুর, না হয় বাঘ-ভাল্লুক। মানুষের চেহারার ভিতর থেকে আমি শিয়াল-কুকুরের দাঁত, নখ, শিয়াল-কুকুরের প্রবৃত্তি, হিংসুটে স্বভাব, সবই দেখতে পাচ্ছি। কেবল হাত-পা

আর কথা কইবার শক্তি থাক্‌লেই কি তাকে মানুষ বলতে পারি ? মানুষের কাজ, মানুষের ধর্ম্ম মানুষকে ভালবাসা, মানুষের দুঃখে কষ্টে কষ্ট বোধ করা, তাদের বিপদে সাহায্য করা, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া, আনন্দ দেওয়া, সদুপদেশ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে মানুষকে মানুষ করা ; যারা তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে বলছিস্, মানুষের ঐ সকল গুণ তাদের কারও আছে কি ? না লখা, আমার কাছে তুই শিয়াল কুকুরের নামে নালিশ করিসনে। শিয়াল-কুকুরের অপরাধের বিচার করি—সে শক্তি আমার নেই। বিচারের কর্ত্তা ভগবান্ ! আমি তোর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—তোর ব্যথা দূর হবে। তুই মনে কোন আক্ষেপ রাখিস্ নে।"

বলরামের সান্ত্বনার কথায় লখার ক্ষোভ দূর হইল, তাঁহার কর স্পর্শে তাহার আঘাত-বেদনা অন্তর্হিত হইল।

এই বলরাম অস্পৃশ্য, নীচ জাতীয় হাড়ী ! আমাদের জন্মগ্রহণের অল্পকাল পূর্ব্বে বলরাম ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ সমাহিত বা অগ্নিতে দগ্ধ করা না হয়। তাহা যেন শিয়াল-শকুনির ক্ষুণ্ণিবারণের জন্য কোনও নির্জ্জন স্থানে সংরক্ষিত হয়। তাঁহার অন্তিম আদেশ পালিত হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে তাঁহার আখড়ায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আখড়ার প্রান্তবর্ত্তী নদীর ঘাটটি ইষ্টকবদ্ধ করা হইয়াছিল। উক্ত অট্টালিকায় বলরামের ব্যবহৃত খড়ম, লাঠি, ছত্র এবং শয্যা সংরক্ষিত হইয়াছে। বলরামের ভক্তরা দেশ-দেশান্তর হইতে এগুলি দেখিতে আসে।

১২৮০ সালে আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় মাঘমাসের একদিন প্রত্যূষে আমরা মুখুয্যে-পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া 'গোয়ালা চৌধুরী'র গড়ের নিকট বড় রাস্তার ধারে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ্য স্থলে আমাদের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসি। সেদিন অতি ভীষণ দুর্যোগ, দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পথ-ঘাট প্লাবিত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল। সেইদিন আমাদের নবগৃহে প্রবেশ।

এই 'গোয়ালা চৌধুরী'র গড়ের কেটি কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে ; বাঙ্গালায় বর্গির হাঙ্গামার সহিত সেই কাহিনী বিজড়িত, পরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(৩)

১২৮০ সালের মাঘ মাসে আমরা মুখুয্যে পাড়ার পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়ে নূতন বাড়ীতে আসিলাম। যে জমীতে এই বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণের লাখেরাজ। আমার কাকার কাছে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারানী ভবানীর নাম-স্বাক্ষরিত একখানি দানপত্র দেখিয়াছিলাম। তাহা হরিদ্রাভ তুলট কাগজে লেখা। তাহার মাথার দিকে 'শ্রীরানী ভবানী' এই স্বাক্ষর ছিল। মোটা মোটা অক্ষর : কতকাল পূর্ব্বের লেখা ; কিন্তু' কালী জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল। জানি না, নাটোরের এই সম্পত্তি কতদিন পরে কি উপলক্ষে কাশিমবাজার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আমাদের নূতন বাড়ীর সীমার মধ্যে অনেকগুলি আম-কাঁটালের গাছ এবং কতকগুলি খেজুরগাছ ছিল। বাড়ীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় কয়েক ঝাড় বাঁশ ছিল। তখন শীতকাল। নবীন বাগ্‌দী নামক একজন 'গাছী' আমাদের বাড়ীর খেজুর গাছগুলি চাঁচিয়া তাহা হইতে রস সংগ্রহ করিত। নবীন এক একদিন সায়ংকালে আমাদিগকে এক এক ঘটি 'জিরেন কাটে'র রস উপহার দিয়া যাইত। শীতের সন্ধ্যায় সেই রস পান করিয়া আমাদের বুকের ভিতর কাঁপুনী ধরিত। আমরা

গৃহকোণে মৃৎপ্রদীপের আলোকে পুরু কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িতাম। দীর্ঘ শীতের রাত্রি সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া যাইত। এই জীবন-সন্ধ্যায় নিরুদ্বেগ শৈশবের সেই সুখময় সন্ধ্যার কথা স্মরণ হইলে কি এক অব্যক্ত বেদনায় বুক টন্-টন্ করিয়া উঠে। যাঁহাদের স্নেহে ও আদর-যত্নে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলাম, আজ তাঁহারা কোথায়? যৌবনে যাঁহাদিগকে লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারাই বা আজ কোথায়? সকলই স্বপ্ন মনে হয়!

আমাদের বাসগৃহগুলি ছিল মাটী-কোঠা। একালে পল্লী-গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ীতে সেরূপ মাটী-কোঠা কদাচিৎ দেখিতে পাই। একালে যাহাদের আর্থিক অবস্থা একটু স্বচ্ছল, তাহারা ছোটখাটো ইস্টকালয়, অভাবে টিনের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে উলুখড়ের ছাউনিও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; কারণ, তাহাতে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ অগ্নিভয়। সেকালে গোপপল্লীতে শীতকালে গরুর ঘরে সাঁজাল দেওয়া হইত। শুষ্ক কাঠ, ঘাস স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত। সেই অগ্নির উত্তাপে গরু-বাছুরের শীত নিবারণ হইত; দরিদ্র গৃহস্থরা সায়ংকালে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বসিয়া সুখ-দুঃখের গল্প বলিত, এবং কলিকায় 'দা-কাটা' তামাক সাজিয়া তৃপ্তির সহিত ধূমপান করিত। কিন্তু তাহাদের অসতর্কতায় কখন কখন সাঁজালের আগুন গো-শালার বাঁশের বেড়ায় ধরিয়া যাইত, অবশেষে তাহা গো-শালার মট্‌কায় উঠিয়া বায়ুবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, এবং পল্লীর বহু গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইত, কখন কখন গৃহস্থ-রমণীরা ধান সিদ্ধ করিতে বসিয়াও এইরূপ বিভ্রাট ঘটাইত। যেখানে ধান সিদ্ধ হইত, তাহার অদূরে পাকাটীর স্তূপ, আশে-পাশে বিচালীর গাদা। কৃষক-রমণী কোন কারণে উঠিয়া গিয়াছে, সেই সময় উনানের আগুন পাকাটীতে ধরিয়া বিচালীর স্তূপ বিধ্বস্ত করিত, এবং জ্বলন্ত বিচালী উড়িয়া বাসগৃহের চালে পড়িত, তাহার পর সমগ্র পল্লী অগ্নিময় হইয়া উঠিত। প্রতি বৎসর এই ভাবে বহু সংখ্যক চাষী গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিতে হইত। ঘরের চালে আগুন লাগিলে তাহাতে শুষ্ক বাঁশের সাজ জ্বলিয়া উঠিত, দুম্‌দাম্ শব্দে 'উখো' অর্থাৎ বাঁশের শুষ্ক গ্রন্থিগুলি ছুটিয়া প্রতিবেশীর গৃহের চালে পড়িত ও 'মট্‌কা'য় সেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত। গৃহস্থরা ঘরের চালগুলি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চালের উপর কলাপাতা, মানগাছের পাতা, ভিজা কাঁথা প্রসারিত করিয়া কলসপূর্ণ জল লইয়া ঘর মটকার পাশে বসিয়া থাকিত, তথাপি 'উখো'র আগুন হইতে চাল রক্ষা করিতে পারিত না। কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে তাহার প্রতিবেশীরা সেই অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া স্ব-স্ব ঘর বাঁচাইবার চেষ্টা করিত; কিন্তু সম্মিলিত চেষ্টার অভাবে প্রায় কাহারও ঘর অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইত না। বিশেষতঃ পাড়ার দুই চারিটা কূপের জলে পল্লীব্যাপী অগ্নি নিব্বাপিত হইত না। চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘড়া জল তুলিবার পর কূপগুলিতে আর ঘড়া ডুবিত না। তখন নিরুপায় পল্লীবাসীরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিত। তাহাদের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইত।

গৃহস্থিত আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রাদি রক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা মাটীকোঠা নির্ম্মাণ করিত। মাটীর দেওয়াল, সেই দেওয়ালের উপর কাঠের 'আড়া' (কড়ি)। পল্লীগ্রামের গৃহস্থরা কাঁটাল-গাছের, জাম বা কড়ুই গাছের গুঁড়ি চিরিয়া এই সকল 'আড়া' প্রস্তুত করিত। অতি অল্প সংখ্যক গৃহস্থেরই শাল কাঠের আড়া ব্যবহারের সৌভাগ্য ঘটিত; সাধারণতঃ অট্টালিকাতেই শালকাঠের আড়া ব্যবহৃত হইত; কারণ, পল্লী অঞ্চলে শালকাঠের আড়া দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য ছিল। আমাদের ঘরগুলিতে কাঁটাল-কাঠের আড়া ছিল। মাটীর দেওয়ালের উপর প্রত্যেক ঘরে ছয়টি বা আটটি আড়া প্রসারিত থাকিত,

তাহার উপর খাটালে খাটালে আম, জাম, কাঁটাল-কাঠের তক্তা পাতিয়া গৃহের অভ্যন্তর ভাগে দেওয়া হইত। সেই তক্তার উপর কয়েক ইঞ্চি পুরু মাটীর আবরণ থাকিত। তাহার উপর উলুখড়ের চাল। খড়ের ভিতর অগ্নি প্রবেশ করিতে না পারে, এ জন্য দ্বার-জানালার সমান আকারে 'মাটীঝাপা' প্রস্তুত রাখা হইত। কতকগুলি বাঁশের বাখারী পর পর সাজাইয়া সেগুলি রজ্জুবদ্ধ করা হইত, এবং তাহার উপর পুরু করিয়া মাটী লেপিয়া তাহা শুকাইয়া রাখা হইত। পল্লীর কোন বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড হইলে 'মাটী কোঠা'র মালিক সেই সকল 'মাটীঝাঁপা' দ্বারা রুদ্ধ দ্বার-জানালা আচ্ছাদিত করিত এবং তাহাদের কিনারাগুলি কাদা দিয়া দ্বার-জানালার প্রান্তবর্ত্তী দেওয়ালের সঙ্গে আঁটিয়া দিত। অগ্নিতে ঘরের চাল ও চালের নিম্নস্থিত বাঁশের সাজ ভস্মীভূত হইলেও ঘরের ভিতরে কোন সামগ্রী নষ্ট হইত না। অগ্নিকাণ্ডের পর দ্বার-জানালা হইতে 'মাটীঝাঁপা' অপসারিত হইত, এবং মাটীকোঠার উপর পুনর্ব্বার বাঁশের সাজ দিয়া, উলুখড় দ্বারা তাহা ছাইয়া লওয়া হইত। সেই সকল বাঁশের সাজ গর্ত্তের জলে পচাইয়া লওয়ায় সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হইত এবং তাহাতে সহজে ঘুন ধরিত না। এই সকল মাটী-কোঠায় কাঠের খুঁটি ব্যবহৃত হইত। কাঠের খুঁটি ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেকে বাঁশের মোটা খুঁটি ব্যবহার করিত ; কিন্তু বাঁশের খুঁটি মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত। খড়ের চালের অন্য অসুবিধাও ছিল ; প্রবল ঝড়ে তাহ উড়িয়া যাইত, বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টি হইলে খড়গুলি পচিয়া যাইত ; উই পোকাতেও চাল নষ্ট করিত। খড়ের ঘরের এইসকল অসুবিধা ছিল বলিয়া অনেক গৃহস্থ বহু কষ্টে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া দুই একখানি 'পাকাঘর' নির্ম্মাণ করিত। এইরূপে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামে বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

নবীন বাগ্‌দী শীতকালে গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য শতাধিক খেজুরগাছ 'কাটিত'। গৃহস্থ প্রত্যেক গাছের খাজানা স্বরূপ দুই সের খেজুর গুড় পাইত। সেই দুই সের গুড় দিয়া সে কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত রস লইত। তিন দিন রস গ্রহণের পর তিন দিন গাছকে বিশ্রাম বা 'জিরেন' দেওয়া হইত। চতুর্থ দিন যে রস সঞ্চিত হইত, তাহাই 'জিরেন কাটে'র রস। সেই রস অতি মধুর। খেজুরের চারা-গাছের রস অপেক্ষা পরিণত বয়স্ক বৃক্ষের রস অনেক অধিক মিষ্ট ; তাহার পরিমাণও অধিক হইত। কোন কোন সতেজ গাছে এক রাত্রিতে প্রায় এক ঠিলি রস সঞ্চিত হইত। নবীন শীতকালে বেলা প্রায় তিনটার সময় গাছ বাঁধিতে আসিত। একগাছা মোটা দড়ি মালার মত তাহার দুই কাঁধে ঝুলিত ; মনে হইত, তাহার উভয় স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া একটা 'দাঁড়াস' (ঢোঁড়া) সাপ ঝুলিতেছে। সে মালকোঁচা আঁটিয়া কাপড় পরিত এবং অর্দ্ধহস্ত বিস্তৃত লোমাবৃত ছাগচর্ম্ম কোমর-বন্ধের মত কোমরে জড়াইত ; তাহাতে আবদ্ধ চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি তাহার পশ্চাতে ঝুলিত। সেই থলির ভিতর বক্রমুখ তীক্ষ্ণধার কাটারী ও দুই চারিটি কঞ্চির নলি থাকিত। কঞ্চি চিরিয়া পাঁচ ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এক একটি নলি প্রস্তুত করা হইত। উক্ত থলির সঙ্গে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা বাঁকা 'হুক' থাকিত ; নবীন খেজুরগাছে যে বিলি বাঁধিত, সেই বিলির গলার দড়ি সেই হুকে বাধাইয়া সে গাছে উঠিত কিন্তু গাছে উঠিবার সময় দুই হাত লম্বা একটি বংশদণ্ড তৎসংলগ্ন দীর্ঘরজ্জু তাহার সঙ্গে থাকিত। তাহার পর কাঁধে যে মোটা দড়ি থকিত, তাহা কাঁধে লইয়াই সে গাছে উঠিত ; তাহার পর দুই হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডটি গাছের সঙ্গে আড় করিয়া বাঁধিয়া তাহার দুইপাশে দুই পা রাখিয়া দাঁড়াইত, এবং সেই মোটা দড়ি দিয়া গাছের সঙ্গে শরীর আবদ্ধ করিত ; সেই সময় সে পশ্চাতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িত ও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া ঠোঙ্গা হইতে কাটারী বাহির করিয়া গাছের হুক অপসারিত করিত। কিছুকাল চাঁচিবার পর স্থূল

'চৌচা' অপসারিত হইলে ক্ষতস্থানে বিন্দু বিন্দু রস দেখা যাইত ; তখন সে বাঁশের নলিটি ঢালু করিয়া তাহাতে বিধাইয়া দিত। অতঃপর চামড়ার ঠোঙ্গাসংলগ্ন আংটা হইতে মাটীর ঠিলি খুলিয়া লইয়া রজ্জুদ্বারা তাহা নলির নীচে ঝুলাইয়া দিত। নলি দিয়া রস গড়াইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহা সারারাত্রি সেই ঠিলিতে সঞ্চিত হইত। ঠিলিটি নলির মুখ হইতে কোন কারণে সরিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে খেজুর গাছের পশ্চাদ্বর্ত্তী শাখা টানিয়া সম্মুখে আনিয়া তাহা চিড়িয়া তদ্দ্বারা ঠিলির গলা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত। তাহার ঠোঙ্গায় কখন কখন চাকা চাকা করিয়া কাটা মানকচু থকিত ; সে তাহা কোন কোন ঠিলির ভিতর ফেলিয়া রাখিত। সন্ধ্যার পর গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা কোন খেজুর গাছে উঠিয়া রস চুরি করিত ; কিন্তু ঠিলিতে মানকচু থাকিলে কেহ সেই রস চুরি করিত না। মানকচু-সিক্ত রস পানের অযোগ্য। তাহা পান করিলে গলা কুট্‌কুট্ করে।

নবীন রাত্রিশেষে অন্ধকার থাকিতেই খেজুর গাছ হইতে ঠিলি খুলিয়া লইয়া যাইত। একখানি বাঁশের বাঁকের দুই ধারে রসপূর্ণ ঠিলিগুলি ঝুলাইয়া লইয়া সে তাহার 'বাইনে' উপস্থিত হইত। সে ঠিলি সংগ্রহের জন্য গাছে উঠিবার সময় তাহার 'ইউনিফর্ম্ম' সঙ্গে রাখিত না কেবল গাছ কাটিবার বা চেঁচিবার সময় ঐ সকল সরঞ্জাম সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন হইত। সে বাঁকের দুই দিকে দশ বারোটা ঠিলি ঝুলাইয়া লইতে পারিত। রস-সংগ্রহের জন্য এই সময় তাহাকে দুই একটি এপ্রেন্টিস বা সহকারী রাখিতে হইত ; তাহরাও ঠিলি পাড়িয়া বাইনে লইয়া আসিত, পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কিছু গুড় পাইত। তাহারা নানাভাবে নবীনকে সাহায্য করিত।

আমরা তখন বালকমাত্র ; নবীনের বাইনের টাট্‌কা গুড়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। বেলা আটটা না বাজিতেই আমরা পাড়ার একপাল ছেলে শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নবীনের বাইনে উপস্থিত হইতাম। তখনও সুলভ মূল্যের 'র‍্যাপার' বা আলোয়ানের প্রচলন হয় নাই ; ফরাসী ছিটের 'দোলাই' ভিন্ন আমাদের অন্য কোন শীতবস্ত্র ছিল না।

নবীন একখানি জীর্ণ অনুচ্চ খড়ের ঘরে বাস করিত। তাহার ঘরে মাটীর প্রাচীর ছিল না ; প্রাচীরের পরিবর্তে চারিদিকে কঞ্চির বেড়া, তাহার উপর গোবর-মিশ্রিত মাটীর প্রলেপ। এই কুটীরের এক পাশের চাল-সংলগ্ন একখানি পর-চালা। সেই 'পরচালা'খানি তাহার 'ঢেঁকিশালা' বা 'ঢিসকেল'।—সে চাষী গৃহস্থ ; দুই এক বিঘা জমী চষিত, তাহাতে যে ধান পাইত, তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে ঢেঁকি না রাখিলে চলিত না। তাহার আঙ্গিনাখানি ধূলাবর্জ্জিত পরিচ্ছন্ন। তাহারই এক প্রান্তে উনন, সেই উননে ধান সিদ্ধ হইত : রন্ধনের কাজও চলিত। আঙ্গিনার এক পাশে বাঁশের খুঁটিতে শিমের 'টাল'। তাহার শিমগাছে প্রচুর শিম ফলিত। অদূরে একটি পেঁপে গাছ, কয়েকটা লঙ্কা-মরিচের গাছ, এক ঝাড় বাঁশ, একটা কাঁটালগাছ। তাহার বাড়ীর চারিদিকে জামাল-কোটার বেড়া। সেই বেড়া ঘেঁসিয়া তাহার গুড়ের 'বাইন'।

গুড় প্রস্তুতের স্থানটির নাম বাইন। একটি বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া রস জ্বাল দেওয়ার জন্য সেই 'বাইনে' উনন করা হইয়াছিল। বাইনের চারিদিকে বাঁশের খুঁটি, তাহার উপর খর্জ্জুর-পত্রের আচ্ছাদন। উননের একপাশে রসের ঠিলিগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখা হইত। নবীন উননে একখানি বৃহৎ মাটীর 'খোলা' চাপাইয়া তাহাতে সকল ঠিলির রস ঢালিয়া দিত তাহার পর শুষ্ক আস্যাওড়া, ভাঁট, কালকাশিন্দা প্রভৃতি আগাছা দ্বারা রস জ্বাল দিত। এই গুল্মগুলি সে নানা স্থান হইতে কাটিয়া আনিয়া শুকাইয়া বাইনে সঞ্চিত রাখিত। রস অগ্নির

উত্তাপে ঈষৎ ঘন ও লোহিতাভ হইলে তাহাকে 'তাতরসা' বলা হইত। পল্লীরমণীদের অনেকে ঘটী আনিয়া নবীনের নিকট হইতে সেই রস চাহিয়া লইয়া যাইত। উহা দ্বারা উৎকৃষ্ট পায়স হয়। শীতকালে অনেকেই রসের পায়স রাঁধিত।

দুই ঘণ্টার মধ্যে খোলার রস ঘন গুড়ে পরিণত হইত। গুড় ঘন হইলে নবীন খোলা নামাইয়া তাহার ভিতর গুড়ের 'বীজ' দিত। ঐ 'বীজ' শুষ্ক গুড় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। খেজুর-শাখার দণ্ড দ্বারা সেই শুষ্ক গুড় খোলার গায়ে মাড়িয়া খোলার গুড়ের সহিত তাহা মিশ্রিত করিলে খোলার গুড় বেশ ঘন হইত। তখন নবীন ঠিলিগুলির মুখ একখানি ময়লা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া এক এক হাতা গুড় ঠিলির মুখের কাপড়ের উপরে ঢালিয়া দিত, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা জমিয়া শক্ত হইত। বাতাসার আকার-বিশিষ্ট সেই গুড় 'সরাগুড়' বা 'গুড়মুচি' নামে প্রসিদ্ধ। নবীনের গুড় জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে সে আমাদের পাতা আনিতে বলিত ; আমরা জামাল-কোটার পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতাম। সে প্রত্যেক পাতায় অল্প-পরিমাণ গুড় দান করিত। আমরা পরম তৃপ্তির সহিত তাহা লেহন করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতাম। নবীন তাহার 'সরাগুড়'গুলি 'কুলোয়' বা ডালায় তুলিয়া রাখিয়া রস সংগ্রহের ঠিলিগুলি সেই উননের চারিদিকে উপুড় করিয়া সাজাইয়া রাখিত। ঠিলিগুলি এইভাবে তাতাইয়া লইলে সঞ্চিত রস ভাল থকে। নবীন সরাগুড়গুলি কুলোয় সাজাইয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। প্রত্যেকখানির মূল্য এক পয়সা। তাহার গুড় ফরসা হইত, স্বাদও ভাল হইত ; এ জন্য তাহার 'সরাগুড়'গুলি শীঘ্রই বিক্রয় হইত। কোন কোন 'গাছী' গুড় জ্বাল দেওয়ার সময় তাহাতে সোডা মিশাইয়া গুড় ফরসা করিত ; কিন্তু তাহাতে গুড়ের স্বাদ বিকৃত হইত। নবীন গুড়ে সোডা মিশাইত না। কখন কখন মশলা-চূর্ণ মিশাইত। আমাদের বাড়ীর কয়েক শত গজ উত্তরে কালী-বাজার। গ্রাম্য দেবতা মা কালীর বাসগৃহ এই বাজারের পূর্ব্বে সংস্থাপিত। তাঁহারই নামানুসারে বাজারটি 'কালী-বাজার' নামে পরিচিত। সাহেব জমীদার-কোম্পানী এই বাজারের মালিক। জমীদার-কোম্পানী প্রতি বৎসর স্থানীয় কোন লোককে বাজার ইজারা-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন। যাহারা বাজারে শাকশব্জী ও মাছ তরকারী বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট হইতে বহু লোক তোলা আদায় করে। জমীদারের 'ইজারাদার' তোলা লইয়া প্রস্থান করিলে বাজার-পরিষ্কারক মেথর তোলা লইয়া গেল ; তাহার পর আসিলেন—'কালীমন্দিরের সেবাইৎ' (পুরোহিত) ; মা কালীর প্রাপ্য তোলায় তাঁহারই অধিকার। তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া মা কালীর পূজার উপাদান সংগ্রহ করেন। শনি-মঙ্গলবারে মা কালীর পূজা উপলক্ষে বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেক ভক্ত নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে ; তাহারা নির্জ্জলা দুধ, নানা প্রকার ফল-মূল, ছানা, ক্ষীর, চিনি, সন্দেশ দিয়া মা কালীর পূজা দিয়া যায়। তাহা বিক্রয় করিয়া পরমসুখে পুরোহিত মহাশয় পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার তোলা লওয়া শেষ হইলে আসিলেন 'সাতালয়ের-দরগার' ফকির। পীরের দরগায় সিন্নি দেওয়ার জন্য তাঁহারও তোলা তুলিবার অধিকার আছে। শুনিয়াছি, আরও দুই একজন গায়ের জোরে তোলা লইয়া যায়। বাজারে তাহাদের জুলুম চলে।

এই কালী মন্দিরের অদূরে মহাদেবের এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ নাকি বহুদিন পূর্ব্বে বর্গীরা (মারাঠা দস্যুরা) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে বর্গীরা মেহেরপুর লুঠ করিতে আসিয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে ; কিন্তু তাহাদের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কথিত আছে, বহুকাল পূর্ব্বে মুরশিদাবাদের কোন নবাব শিকার উপলক্ষে নদীপথে

মেহেরপুর আসিয়াছিলেন। মেহেরপুরের প্রান্তবাহী ভৈরবের অবস্থা তখন শোচনীয় হয় নাই ; ভৈরব তখন আকারে ভৈরব ছিল। নবাবের বজরাগুলি ভৈরব তটে নঙ্গর করা হইলে রাত্রিকালে সহসা এরূপ ঝড়-বৃষ্টি ও দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল যে, নবাব পারিষদ-বর্গ সহ বজরায় বাস করা নিরাপদ মনে করিলেন না।

প্রচণ্ড ঝটিকায় বজরা ডুবিবার উপক্রম দেখিয়া নবাব বাহাদুর সদলে বজরা ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলেন। নদীতীরে কিছুদূরে এক ঘর সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাস ছিল। গৃহস্বামিনীর নাম রাজু ঘোষানী। এই গোপাঙ্গনার খোঁয়াড়ে বিস্তর গো-মহিষ ছিল। দুগ্ধের ব্যবসায়ে তাহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছিল। সে অতিথিবৎসল ছিল এবং নিরাশ্রয় গরীব-দুঃখীকে অন্ন বিতরণ করিত। মা কমলা তাহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন। সেই ঘন-ঘোর রাত্রিতে দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে নবাব বাহাদুর রাজু ঘোষানীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, রাজু নবাবের পরিচয় জানিতে না পারিলেও পরম সমাদরে অতিথি-সৎকার করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট সরু ধানের সুগন্ধযুক্ত চিঁড়া, 'শুকো' দই, পাকা মর্ত্তমান কলা এবং সুস্বাদু গুড় দ্বারা সে নবাব ও তাঁহার অনুচরবর্গের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া সেই রাত্রিতে তাঁহাদিগকে তাহার গৃহে আশ্রয় দান করিয়াছিল। বিপন্ন নবাব রাজু ঘোষানীর গৃহে আতিথ্যলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ;—ঘোষানীকে পুরস্কার-দানের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

নবাব বাহাদুর পরদিন প্রভাতে দেখিলেন, ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে, আকাশ নির্ম্মল, আর কোন দুর্য্যোগের আশঙ্কা ছিল না। নবাব রাজুর নিকট বিদায় গ্রহণের সময় রাজুকে নিজের পরিচয় দিয়া তাহার উপকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ কাল হইলে রাজু তাহার সহৃদয়তার পুরস্কার স্বরূপ হয়ত একখানি 'সার্টিফিকেট অফ অনর' বা তাহার পুত্র 'রায় বাহাদুর' অথবা ঐরকম খেতাব দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইত ; কিন্তু সে কালের নবাব-বাদশাহদের বুদ্ধি কিছু স্থূল ছিল, তাঁহাদের পুরস্কার দানের প্রণালীও বিভিন্ন রকম ছিল। নবাব বাহাদুরের আদেশ শুনিয়া রাজু ঘোষানী করজোড়ে নিবেদন করিল, তাহার পরম সৌভাগ্য যে, সে এক রাত্রি নবাব বাহাদুরের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছিল ; সে গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। সে সাধারণ গৃহস্থ রমনী, নবাব বাহাদুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে, সে শক্তি তাহার নাই ; এ জন্য সে কুণ্ঠিত। সে কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণে সম্মত হইল না। যাহা হউক, অনেক পীড়াপীড়ির পর সে অবশেষে বলিল, তাহার বিস্তর গরু-বাছুর ও মহিশ আছে, কিন্তু সেগুলিকে সে চরাইতে পারে, এরূপ বিস্তৃত গোচারণ ক্ষেত্র নাই। নবাব ইচ্ছা করিলে তাহাকে গোচারণের উপযুক্ত কিছু জমী দান করিতে পারেন। সেই জমীতে তাহার গরুর পাল চরিয়া বেড়াইবে।

অতঃপর নবাব বাহাদুরের আদেশে রাজু ঘোষানীর গো-চারণের জন্য বিনা করে একটি বৃহৎ পরগণা প্রদত্ত হইল ; রাজু ঘোষানীর নামানুসারে এখন সেই পরগণা 'রাজপুর পরগণা' নামে পরিচিত।

রাজু ঘোষানী বিনা করে এই সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি পাইয়া অল্পদিনে বহু অর্থের অধিকারিণী হইল। তাহার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বেই স্বচ্ছল ছিল, এইবার সে রাজার মত সমারোহে বাস করিতে লাগিল। রাজু ঘোষানীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা 'গোয়ালা চৌধুরী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারা মেহেরপুরে একটি গড় নির্ম্মাণ করেন। সেই গড় এখন বর্ত্তমান নাই, কিন্তু যে স্থানে সেই গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থান এখনও 'গড়বাড়ী' নামে পরিচিত। এই গড়ের পার্শ্বেই একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল ; এখন তাহার আকার

সঙ্কুচিত হইয়াছে ; তাহা পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ নাই। তাহা 'গড়ের পুষ্করিণী' নামে পরিচিত এবং এখন তাহা মিউনিসিপালিটীর সম্পত্তি, 'রিজার্ভড্ ট্যাঙ্ক'।

রাজু ঘোষানীর উত্তরাধিকারীরা দস্যুভয়-নিবারণের জন্য এই গড়ের নীচে একটি 'পাতালঘর' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; সেই পাতালঘর কিরূপ দীর্ঘ ও কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের বাল্যকালে এই গড়ের কিয়দংশ খুঁড়িয়া দেখা হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, সেইসময় মেহেরপুরের কোন ইংরাজ সিভিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সেই কাজটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি কে, মিঃ এফ, এ, শ্যাক. কি, জে, ডি, এণ্ডারসন—তাহা স্মরণ নাই ; মিঃ এণ্ডারসন বঙ্গসাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; তিনি 'ইন্দ্র সেন' বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরিত্যগ করিয়া অক্সফোর্ডে আমাদের দেশীয় ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সদাশয় ও দেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রাজ-পুরুষ ছিলেন।

আমরা বাল্যকালে গড়-বাড়ীর ভূগর্ভস্থ অংশ কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। ছোট ছোট পাতলা ইট বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাহা দেখিয়া পাতালঘরের ছাদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু ছাতের নীচে যে অংশ ছিল, তাহা কোন দিন খুঁড়িয়া দেখা হয় নাই। দীর্ঘকাল তাহা একই ভাবে পড়িয়াছিল। এতকাল পরে তাহা খুঁড়িয়া দেখিলে পাতালঘরের অনাবিষ্কৃত অংশের সন্ধান হইতে পারে ; কিন্তু সে জন্য আর কেহ কোন চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল অট্টালিকার অদূরে 'কালাচাঁদ মেমোরিয়াল' হলের পূর্ব্বে যেখানে এখন একটি ছোটখাট কাঁটালবাগানের অস্তিত্ব বিরাজিত, এবং যাহার ছায়ায় ডোমরা মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেই স্থানে মাটীর নীচে উল্লিখিত পাতালঘরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। এখন তাহা সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

রাজু ঘোষানীর বংশধররা দীঘি খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম পার্শ্বে পাতালঘর নির্ম্মাণ করাইলেও তাঁহারা সেখানে সর্ব্বদা বাস করিতেন না ; প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত আমদহ নামক গ্রামে তাঁহারা প্রাসদোপম বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানে বাস করিতেন। এখন সেখানে তাঁহাদের বাস্তুভিটার চিহ্নমাত্র নাই : একটা জলাশয়ের ধারে একটি উচ্চ ঢিপি সেই অট্টালিকার অস্তিত্বের স্মৃতি বহন করিতেছে ; কিন্তু প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছিল—সেই স্থানের অবস্থা দেখিয়া তাহা অনুমান করা কঠিন। কৃষকরা এখন সেখানে ধান্য এবং অরহর, সর্ষপ, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্যের আবাদ করে। আমার ভ্রাতা শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ সেই ঢিপির ভিতর হইতে বিস্তর অনুসন্ধানের ফলে দুইখানি ইষ্টক আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; তাহাতে দেবনাগরী হরূপে কাহারও নামের আদ্যক্ষর লিখিত ছিল। এই সকল স্থান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার যোগ্য।

শুনিয়াছি, গোয়ালা চৌধুরীদের আমদহের এই বাসভবনের সহিত মেহেরপুরস্থ উক্ত পাতালঘরেব যোগ ছিল। তাঁহারা সুড়ঙ্গপথে তাঁহাদের বাসভবন হইতে অন্যের অদৃশ্য ভাবে গড়ের পাতালঘরে যাইতে পারিতেন। দস্যুর আক্রমণ হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের টাকা, মোহর ও অলঙ্কারাদি উক্ত পাতালঘরে লুকাইয়া রাখিতেন। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে তাঁহারা সপরিবার সুড়ঙ্গপথে পাতালঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, এরূপ কিংবদন্তীও বাল্যকালে শুনিতে পাইতাম।

নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে বর্গীব দল তাহাদের অন্যতম অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত

দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল ; তাহারা দক্ষিণ বঙ্গের বহু পল্লী লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল—ইহা কাল্পনিক কাহিনী নহে। "ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ?"—ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইবার এই ছড়া বাল্যকালে বহু পল্লীগৃহিনীর মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম। আমাদের গ্রামে এই ছড়ার প্রভাব একটু বেশীই ছিল। মেহেরপুর অঞ্চলেও বর্গী দস্যুর শুভাগমন হইয়াছিল। তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া রাজু ঘোষানীর বংশধররা তাঁহাদের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি সহ আমদহের বাসভবন হইতে পূর্ব্বোক্ত সুড়ঙ্গ পথে মেহেরপুরের গড়ের পাতালঘরে পলায়ন করিয়া সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। দস্যুরা তাঁহাদের বাসগৃহের বিভিন্ন অংশ খুঁজিতে খুঁজিতে পাছে সুড়ঙ্গ-পথ দেখিতে পায় ও সেই পথে পাতালঘরে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা সেই পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। মেহেরপুরস্থ গড়বাড়ীতে পাতালঘরে প্রবেশের ও তাহা হইতে বাহির হইবার একটি দ্বার ছিল। গৃহস্বামী পরিজনবর্গ সহ পাতালঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহাদের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া গড়ের সন্নিহিত একটি প্রাচীন ও সুবৃহৎ তেঁতুলগাছে উঠিয়া লুকাইয়া থাকে। বর্গীরা তাঁহাদের আমদহের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জন প্রাণীকেও দেখিতে পাইল না, ধনাগারে ধনরত্নাদি কিছুই ছিল না। তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, মেহেরপুরের গড়ে তাঁহাদের যে বাড়ী আছে, তাঁহারা সেই স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। বর্গীর দল আমদহ হইতে মেহেরপুরে আসিয়া গোয়ালা চৌধুরীদের গড় আক্রমণ করিল ; কেহই তাহাদিগকে বাধা দিল না। কিন্তু তাহারা গড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন গৃহে পুরবাসীদের সন্ধান পাইল না। অগত্যা তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া মেহেরপুর ত্যাগ করিল। কিন্তু দুই একজন বর্গী দস্যু তখনও গড়ের সন্নিহিত বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল।

যে বিশ্বস্ত ভৃত্য তেঁতুলগাছের ডালে বসিয়া গড়ের চারিদিক বর্গীদের দাপাদাপি ও লাফালফি লক্ষ্য করিতেছিল, সে যখন দেখিল, বর্গীরা বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে তেঁতুলগাছ হইতে নামিয়া প্রভুকে সুসংবাদ জানাইতে গড়ের দিকে অগ্রসর হইল। যে দুইজন বর্গী গড়ের অদূরবর্ত্তী বনের ভিতর ঘুরিতেছিল, তাহারা সেই ভৃত্যকে দেখিবামাত্র তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া গুপ্ততথ্য জানিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্য শত অত্যাচারেও নির্ব্বাক্ রহিল। তখন ক্রুদ্ধ বর্গী পদাতিকদ্বয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিল। অতঃপর কি হইল, সে সম্বন্ধে দুই প্রকার জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতির মর্ম্ম এই যে, বর্গী দস্যুদ্বয় সেই ভৃত্যের পরিচ্ছেদ খানাতল্লাস করিয়া পাতালঘরের চাবী দেখিতে পায় এবং পাতালঘরের দ্বার আবিষ্কার করিয়া, সহযোগীবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া সদলে পাতালঘরে প্রবেশ করে ; তাহারা পাতালঘরের অধিবাসিবর্গকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। দ্বিতীয় জনরবের মর্ম্ম এই যে, প্রহীরকে হত্যা করিয়াই তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করে। প্রহরীর মৃত্যুতে পাতালঘরের অধিবাসীরা সেই রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ, এ কাল পর্য্যন্ত পাতালঘরের গুপ্তরহস্যভেদের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যে স্থান খনন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পাতালঘরের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল, সেই স্থান খনন করিলে হয়ত একালেও কোন কোন আবিষ্কার হইতে পারে। শুনিয়াছি, আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ দিনাজপুর অঞ্চল হইতে মেহেরপুর আসিয়া গোয়ালা চৌধুরীকে দেওয়ানী পদে গ্রহণ করেন। তাঁহারা গড়বাড়ীর অদূরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন ; কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামায় গোয়ালা চৌধুরীরা নির্ব্বংশ হইলে

তাঁহারা মেহেরপুরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রামে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। মেহেরপুরে শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহারা বসন্তপুরের যে স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানে একটি পুষ্করিণীর শেষ চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; পুষ্করিণীর অদূরে এখনও উচ্চভিটা পড়িয়া আছে, কিন্তু ইষ্টকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই, মাটী খুঁড়িলে অনেক ইট পাওয়া যায়।

গোয়ালা চৌধুরীদের গড়বাড়ী গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত; তাহার উত্তরে কালীবাজার এবং দক্ষিণে বৌ-বাজার। এতদ্ভিন্ন স্কুল, বোর্ডিং, দাতব্য চিকিৎসালয় ও সুবৃহৎ হাসপাতাল, মিউনিসিপাল আফিস, ডাকঘর, কালীবাড়ী ইহার অদূরে সংস্থাপিত; কিন্তু এই স্থানটি ফাঁকা পড়িয়া আছে, অথচ মেহেরপুরের অলিতে গলিতে নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, জমীর দর ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে, কোথাও একটু জমী পড়িয়া থাকিবার যো নাই; আর এই গড়বাড়ীতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া এরূপ প্রকাশ্য স্থানে কেহই বাস করে না—দেখিয়া অনেক আগন্তুক বিস্ময় প্রকাশ করেন! শুনিতে পাওয়া যায়, গোয়ালা চৌধুরীরা এখানে নির্ব্বংশ হওয়ায় গ্রামবাসীদের ধারণা, যে গৃহস্থ পরিবার এই গড়ের সীমার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবে, তাহাদের বংশলোপ হইবে। এই গড়ের সীমার মধ্যে এখন স্কুল-সংলগ্ন মুসলমান বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন গৃহস্থের বাসভবন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই গড়ের সীমার মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে তিনজন গৃহস্থ প্রচলিত প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একজনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্ররা বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। ডাক-বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী চাকরী হইতে অবসর-গ্রহণের পর এখানে বাস করিবার অভিপ্রায়ে একটি দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় পতিপ্রাণা পত্নী ও একমাত্র পুত্র এই বাড়ীতে বাস করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তাঁহাদের ধারণা, এই নিষিদ্ধ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাতেই তাঁহাদের সুখের সংসারে আগুন লাগিয়া গেল। সেই বাড়ীতে এখন ডাকঘর হইয়াছে। ডাকঘরটি পূর্ব্বে অন্য একটি একতলা বাড়ীতে ছিল। এই গড়ের বাড়ীতে ডাকঘরটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য আমি আমার স্বর্গীয় সুহৃদ ডেপুটী-পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল রমনীমোহন ঘোষ মহাশয়কে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলাম; ইহাতে আমারও একটু স্বার্থ ছিল, কারণ, উহা আমার বাড়ী হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে অবস্থিত। এই বাড়ীতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইলে পোষ্ট-মাষ্টাররা ইহার দোতলায় বাস করিতে থাকনে, একতলায় ডাকঘর। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকজন পোষ্ট-মাষ্টার এই বাড়ীতে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পরিবারবর্গের কাহারও না কাহারও প্রাণহানি হইয়াছে; কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কেহ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান পোষ্ট-মাষ্টার এখনও নিরাপদ আছেন। তৃতীয় অট্টালিকার গৃহস্বামী, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র স্থানান্তরে বাস করিলেও অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করায় তাঁহারা এই বাড়ীর সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া উহা কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে ভাড়া দিয়াছেন। কোন গৃহস্থ এই বাড়ী ক্রয় করিত চাহেন নাই। একজন নব্য উকীল এই গড়ের সীমার উত্তরে বাসের জন্য জমী লইলেও সেখানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করেন নাই।

আমার স্মরণ আছে, আমাদের বাল্যকালে এখানে গ্রামস্থ জমীদার স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের প্রমোদ-ভবন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিক

মহাশয় মল্লিক-বংশের অলঙ্কারস্বরূপ, গ্রামস্থ প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেরই তিনি প্রাণস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যেরূপ বিলাসী ছিলেন, যেরূপ আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন, একালে তাহা উপকথার বিষয়ীভূত হইয়াছে। আমাদের বয়স যখন আট দশ বৎসর মাত্র, সেই সময় গ্রামস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির উদ্যোগে, বিশেষতঃ স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণবাবুর আন্তরিক চেষ্টায় গোয়ালা চৌধুরীদের উক্ত গড়বাড়ীতে 'বাসন্তী মেলা' প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ মহা সমারোহে তাহা সুসম্পন্ন হয়—এই দীর্ঘকাল পরেও তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এখনও স্মরণ আছে—এই মেলাক্ষেত্রের উত্তরাংশে একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা আসিয়া দ্রৌপদীর বিবাহ-সভার আদর্শে বহু পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সভাস্থলে যে ক্রমোচ্চ গেলারী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার এক দিকে গান্ধার হইতে জলধিসীমা ; ভারতের বিভিন্ন প্রকার রাজ-পরিচ্ছদেও তাঁহাদের স্ব-স্ব দেশের বিশেষত্ব সূচক শিরস্ত্রাণে মণ্ডিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট, অন্য দিকে নানা দেশের ব্রাহ্মণ ; তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দেখিতে আসিয়াছেন। কাহারও মুখ গম্ভীর, কেহ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে রূপ-লাবণ্যবতী দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া আছেন, গভীর বিস্ময়ে মুখ-বিবর ঈষৎ উন্মুক্ত ; কেহ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিতেছেন, মুখ দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিতেছেন "এ কি তোমার সাধ্য ? কেন বাপু, লোক হাসাইতে আসিয়াছ ?"

গেলারীর সম্মুখে সমতলভূমিতে কয়েকটি মূর্ত্তি ;—প্রথমেই নীলাভবর্ণ অর্জ্জুনের দীর্ঘদেহ অবনত মুখের প্রতি দর্শকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অর্জ্জুনের পদপ্রান্তে একটি আধারে জল, তিনি সেই জলে উর্দ্ধস্থিত মৎস্যের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার উভয় বাহু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, এক হাতে ধনু, অন্য হস্তে 'তিনি আকর্ন পূরিয়া' জ্যা আকর্ষণ করিয়া তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিতেছেন, মুখে গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট, দেখিলেই কবিবর কাশীরাম দাসের সেই বর্ণনাটি মনে পড়ে—

> "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
> পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
> অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা,
> মুখরুচি, কত শুচি করিয়াছে শোভা।"—ইত্যাদ

কিছু দূরে পদ্মপলাশনেত্রা, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, পট্টবস্ত্র মণ্ডিতা, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী পাঞ্চালী ;—এক হাতে ফুলের মালা, অন্য হস্তে দধিভাণ্ড, যেন 'পার্থেরে বরিতে যান দ্রুপদের বালা'। তাহার পশ্চাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভগিনীকে সভাস্থলে পরিচালিত করিতেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত তখন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের এই দৃশ্য দেখিয়া স্থান, কাল, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতাম। পৌরাণিক যুগের এক গৌরবময় দৃশ্য মানস-নেত্রের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

এই মণ্ডপের বিপরীত দিকে—দক্ষিণে আর একটি মণ্ডপ ; সেখানেও মৃন্ময় মূর্ত্তির নানা দৃশ্য। প্রায় পঞ্চান্ন ছাপান্ন বৎসর পূর্ব্বের কথা—সকল দৃশ্য ঠিক স্মরণ নাই। এক স্থানে দাবা-খেলার দৃশ্য, দুইজন দাবারু, একজন বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বড়ে টিপিতেছে, পরিধেয় বস্ত্র শ্লথ, কাছা খুলিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে ডাবা হুঁকা, সে গম্ভীর ভাবে তামাক টানিতে টানিতে প্রতিযোগীর চাল নিরীক্ষণ করিতেছে ; পাশে একজন দর্শক উপবিষ্ট. সে লুব্ধ নেত্রে হুঁকার দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইতেছে, হুঁকাধারীর পশ্চাতে একটি দুষ্ট বালক—সে

তাহার সম্মুখোবিষ্ট দাবারুর মাথার সুদীর্ঘ শিখাটি বাঁ হাতের দুই আঙ্গুলে আয়ত্ত করিয়া ডান হাতের কাঁচি দিয়া শিখার মূল স্পর্শ করিয়াছে, বালকের মুখ প্রফুল্ল, চক্ষুতে দুষ্টুমীপূর্ণ হাসি।

এই দৃশ্যের পার্শ্বেই নবীন-এলোকেশীর মৃন্ময় মূর্ত্তি। এই সময়ের কিছু দিন পূর্বে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি কর্ত্তৃক এলোকেশী-ধর্ষণের মামলা শেষ হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে এলোকেশী-মোহান্ত-ঘটিত কাহিনী লোকের মুখে মুখে আলোচিত হইতেছিল। বসন্তমেলায় তাহারই সং। এলোকেশীর স্বামী নবীন বঁটী উচাইয়া এলোকেশীকে কাটিতে উদ্যত, এলোকেশী সভয়ে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া মাথা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে : পাশে 'তেলী বৌ, বামন পিসী' এবং 'মুক্তকেশী' দাঁড়াইয়া আছে, কেহ আতঙ্কে বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া, নারী-হত্যা অপরিহার্য্য বুঝিয়া দাঁত দিয়া জিভ কাটিতেছে, কেহ নবীনের হাতের বঁটী কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইতেছে। নবীনের অঙ্গে ডবল-ব্রেষ্ট সার্ট, মুখে গোঁফ, মাথায় বাঁকা টেরী, চক্ষু হইতে ক্রোধ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।—কিছু দূরে মাটীর ঘানীগাছ, মাধবগিরি মোহান্ত কয়েদীর জাঙ্গিয়া পড়িয়া কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া ঘানী টানিতেছে। ঘানীর এক পাশে একটি নল, সেই নলের নীচে মৃৎকলস। সেই নল দিয়া ঘানীর তেল কলসীতে পড়িতেছে, এই ভাবে কলসীটি সংরক্ষিত।

কিছু দূরে আর একটি মণ্ডপের অভ্যন্তরে জগৎ সিংহের সহিত ওস্‌মানের অসি যুদ্ধ চলিতেছে। আহত ওস্‌মানের জানু দিয়া শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে ; অদূরে নবাব-দুহিতা আয়েষা দাঁড়াইয়া উভয়ের যুদ্ধ-কৌশল নিরীক্ষণ করিতেছে।—এই দৃশ্য প্রদর্শনের একটু কারণ ছিল। এই মেলায় থিয়েটারের 'ষ্টেজ' বাঁধা হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল—সেই রঙ্গমঞ্চে 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে অভিনীত হইবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর খ্যাতি তখন পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। এই থিয়েটারের সাহায্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল, এই উদ্দেশ্যে সাধারণের কৌতূহল উদ্রেকের জন্যই এই সং-এর অবতারণা। ইহা দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ের বিজ্ঞাপন মাত্র। মেলার পাণ্ডাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

এই থিয়েটারের জন্য মেলার পরিচালকবর্গকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। কারণ, তাহারা গ্রামস্থ সখের থিয়েটার দ্বারা দর্শকগণকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যয়সাধ্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজকাল যেমন গ্রামে গ্রামে দুই একটি সখের থিয়েটারের দলের এবং লাইব্রেরীর আবির্ভাব হইয়াছে,পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে পল্লী অঞ্চলে তাহাদের অভাব ছিল। এই মেলায় যে থিয়েটার হইয়াছিল, তাহাই আদর্শ করিয়া অনেক দিন পরে মেহেরপুরে একটি 'এমেচিয়র থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার পূর্ব্বে এই খেয়াল কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই।

মেহেরপুরের 'বসন্ত মেলা' উপলক্ষে যে থিয়েটারের দল আনীত হইয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব, এবং মেহেরপুরের ন্যায় সুদূর মফঃস্বল পল্লীর পক্ষে তাহা অসাধারণ ব্যাপার। কেবল মুখোয্যেবাবুদের চেষ্টায় উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বে জমীদার স্বর্গীয় বাবু চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় দিয়াছি। তিনি যে কেবল প্রবল প্রতাপ তেজস্বী জমীদার ছিলেন, এরূপ নহে, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সদ্ভাব ও আনুগত্য ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী স্বর্গীয় আশুতোষ দেব অর্থাৎ 'ছাতুবাবু'র সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। বাঙ্গালা ১২৬২ সালের মাঘ মাসে ছাতুবাবুর মৃত্যু হয়, চন্দ্রমোহনবাবু তাহার কিছুদিন পরেই প্রাণত্যাগ করেন : এ জন্য মনে হয়, উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। সম্ভবতঃ উভয় পরিবারের বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই

সময় ছাতুবাবুর কনিষ্ঠ দৌহিত্র স্বর্গীয় বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার খ্যাতনামা অভিনেতা ; কলিকাতায় সখের রঙ্গমঞ্চে তিনি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং পরে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে জগৎসিংহের ভূমিকা লইয়া অভিনয়ের যে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় নাটকাভিনয়ের ইতিহাসে তাঁহার সেই গৌরব চিরস্মরণীয়। শরৎবাবুর সহিত স্বর্গীয় চন্দ্রমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহার অনুরোধে শরৎবাবু মেহেরপুরে আসিতে সম্মত হইয়াছিলেন, এবং সদলে দুর্গম মেহেরপুরে পদার্পণ করিয়া 'বাসন্তী মেলা'র 'ষ্টেজে' দুর্গেশনন্দিনী এবং পরুবিক্রম নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে তখন মেহেরপুরে যাইতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া, পথের কথা ভাবিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিতে হইত। কারণ, চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মেহেরপুর যাইতে গরুর গাড়ী ভিন্ন অন্য যান-বাহন ছিল না। মধ্যে দুইটি নদী পার হইতে হইত। আমরা চুয়াডাঙ্গায় অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় কলিকাতাগামী 'চাটগাঁ এক্সপ্রেস্' ট্রেন ধরিবার আশায় বেলা ৯টার পূর্ব্বে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া ছৈয়ের ভিতর দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিতাম, এবং গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনীতে সর্ব্বাঙ্গ বেদনাপ্লুত করিয়া পাঁচটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে উপস্থিত হইতাম ; নদী পার হইতে বিলম্ব হইলে ট্রেনের আশা ত্যাগ করিতে হইত। আর এখন মোটর-বাসের অনুগ্রহে অপরাহ্ণ ৪টার পরেও মেহেরপুর ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতায় আসিতে পারিতেছি। কিন্তু সেই দুর্দ্দিনে শরৎবাবুর মত মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সদলে গরুর গাড়ীতে মেহেরপুর যাইবেন, ইহা আশা করা অন্যায়। এ জন্য মেলা সমিতি বহুব্যয়ে তাঁহাদের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেদিন অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা, শরৎবাবু ও অন্যান্য অভিনেতা তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বেই মেহেরপুরে উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্রবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন ; কিন্তু তাঁহারা অধিক দৃশ্যপটাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই, এ জন্য শরৎবাবু স্থানীয় চিত্রশিল্পীর সাহায্যে মেহেরপুরেই কয়েকখানি দৃশ্যপট অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ সহোদরের বৈঠকখানা-বাড়ীতে শরৎবাবুর উপদেশে সেই সকল পট অঙ্কিত হইতেছিল। আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অঙ্কন কৌশল নিরীক্ষণ করিতাম, এবং কি গভীর সম্ভ্রমের সহিত শরৎবাবুর সৌম্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। শরৎবাবু তখন যুবা পুরুষ, তাঁহার ন্যায় পুরুষ তাহার পূর্ব্বে আর একজনও দেখিয়াছিলাম কিনা স্মরণ নাই।

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিনে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হইল। টিকিটের মূল্য এক টাকার কম ছিল না ; এক একখানি 'রিজার্ভড' আসনের মূল্য পাঁচ টাকা। মহকুমার অধিকাংশ জমীদার এবং পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা 'রিজার্ভড' আসন অধিকার করিয়াছিলেন ; দুই টাকা ও এক টাকা মূল্যের টিকিট এত অধিক বিক্রয় হইয়াছিল যে, দরমার ঘেরের ভিতর তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। বারো বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকরা অর্দ্ধমূল্যে 'হাফ টিকিট' পাইয়াছিল। কাকা আমাকে আট আনা দিয়া টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পাশে বসিয়া অভিনয় দেখিয়াছিলাম। সময় আর কাটে না, ঐকতানিক বাদ্য নীরব হইলে যবনিকা উত্তোলিত হইল। শরৎবাবু মহামূল্য পরিচ্ছদে একটি বৃহৎ ওয়েলারে আরোহণ করিয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল, ইনি সত্যই জগৎ সিংহ। কিন্তু বালক আমরা, বিদ্যাদিগ্‌গজের অভিনয়েই আমরা অধিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

এই মেলা উপলক্ষে অর্থের অপব্যয়ও অল্প হয় নাই। বাবুরা বাই, খেমটা প্রভৃতির আয়োজনে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেকগুলি

খেমটাওয়ালীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বাইজীর সংখ্যাও অল্প ছিল না। সে কালে উচ্চশ্রেণীর পুরুষদের নীতিজ্ঞান একাল অপেক্ষা অল্প ছিল। গভীর রাত্রিতে মেলার আসরে খেমটা আরম্ভ হইলে সুরার স্রোত বহিয়াছিল, ছেলেদের কৌতূহল প্রবল, এক রাত্রিতে কয়েক বন্ধুতে চুরি করিয়া খেমটা দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ধরা পড়িয়া কাকার কাছে যে প্রহার লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বহুদিন স্মরণ ছিল। যিনি আগ্রহভরে আমাকে থিয়েটার দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, 'খেমটা নাচ' দেখিতে যাওয়ায় তিনি কি জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি দিলেন, তাহা বুঝিবার মত তখন আমার বয়স হয় নাই, কিন্তু বাবুরা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া খেমটাওয়ালীদের সঙ্গে প্রকাশ্য আসরে সে অভদ্র রসিকতা করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিয়াছিলাম।

মেলাস্থলে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছি। নাগরদোলা, ঘোড়াবাজি প্রভৃতি আসিয়াছিল। চাষীরা পান চিবাইতে চিবাইতে নাগরদোলায় উঠিয়া পাক খাইতেছিল। দুই তিন জন সমস্বরে গাহিতেছিল—

"যায় বুজি যৈবনের তরী অকূল তুফানে,
মদনেরই ঢেউ নেগেচে রাখ্‌তে পারিনে।"

এক পয়সায় কুড়ি পাক, কেহ কেহ দুই তিন পয়সার পাক খাইতে লাগিল। কাহারও পাশে পল্লী বারবিলাসিনী। কালো কুচকুচে রং, পায়ে মল, কটিতটে রূপার গোট বা চন্দ্রহার, দাঁতে মিসি, হাসিলে মনে হয় টিকায় আগুন ধরিয়াছে! ত্রিশ বৎসরের গত যৌবনা অভাগিনীর নাকে নোলক! কপালে টিপ,—কি বিশ্রী চেহারা! মদনের ঢেউই বটে!

এই শ্রেণীর পতিতাদের জন্য মেলার এক অংশে কুটীর-শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে যথেষ্ট খাজনা আদায় হইত ; সেদিকে গ্রাম্য চাষীদের দলের কী ভীড়! মেলায় নানা স্থান হইতে দোকানী-পসারী আসিয়াছিল। একদিন এক পয়সা দিয়া কাটামুণ্ডের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ীর পাশেই মেলা, শেষ রাত্রিতে নহবতে যে সঙ্গীতালাপ হইত, আধঘুমে তাহা বড় মধুর মনে হইত। সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত জুয়ার আড্ডায় 'তেতাস' ও 'কুপন' খেলার ধূম—আর সেই দিকেই পল্লীবিলাসিনীদের 'কোয়াটার'।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের একটি যুবক বন্ধু তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র, তিনি মুখুয্যে পরিবারের রত্নস্বরূপ ছিলেন ; পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং কলেজে অধ্যাপনা করিতে করিতে সরকারের বৃত্তি লইয়া বিলাতে কৃষি বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সহোদরের মতই স্নেহ করিতেন। তিনি এই মেলায় অর্থের অপব্যয় ও দুর্নীতির স্রোত দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গুরুজনের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার 'টাইটেল' পৃষ্ঠার উপর হেমবাবুর একটি কবিতার কিয়দংশ 'মটো' রূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল—

"একদিন অনশনে যদি দিন যায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায়?"—ইত্যাদি।

আমরা ছেলের দল অবশেষে মেলার বিরুদ্ধে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলাম।

বহুকাল পরে সেদিন একটি বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম—লেখা-পড়ায় তাঁহার তেমন অনুরাগ ছিল না, কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিকে খুব ঝোঁক ছিল। তাহার পিতা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবার চেষ্টায় মাসিক পাঁচটাকা বেতনে একজন 'প্রাইভেট টিউটার' রাখিয়া দিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের বেতন প্রথমে তিন টাকা ছিল, বন্ধু এক এক কেলাশে তিন বৎসর থাকিয়া পাকা হইয়া প্রমোশন পাইয়া যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, সেইবার মাষ্টার মহাশয়ের বেতন তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকায় উঠিল। আমার কথা শুনিয়া এ কালের কলিকাতার পাঠক-পাঠিকাগণ বোধহয় বিদ্রূপের হাসিতে ওষ্ঠে বিজলী খেলাইয়া বলিবেন—'পাঁচ টাকা মূল্যে প্রাইভেট টিউটার মেলে ?' একালে শিক্ষার ব্যয় যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে—তাহা দেখিলে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু আমি যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার পল্লীর কথা বলিতেছি। কি একখান ইংরাজী কেতাবে পড়িয়াছিলাম, ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী লইয়া এ দেশে আসে, তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা ! সে কালে আয় অল্প হইলেও ব্যয় অতি সামান্য ছিল। একালের মত হাজার রকম বিলাসিতা গৃহস্থ পরিবারে প্রবেশ করিয়া সমাজ-দেহটিকে সুপক্ক মাকালে পরিণত করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। বাল্যকালে গ্রাম্য বাজারে কড়ির প্রচলন দেখিয়াছি। পাঁচ কড়ার শাক, দশ কড়ার বেগুন কিনিলে সংসার চলিত। বর্ষাকালে বানের জল বাড়িলে স্থানীয় মালোরা (জেলে) তাহাদের জেলে-ডিঙ্গি বোঝাই করিয়া নদীর ঘাটে মাছের আমদানী করিত, আমি স্বয়ং এক পয়সায় পাঁচ ছয়টি 'বাট্‌কে' ও আট দশটি মৃগেল মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছি, ওজনে চারি পাঁচ সের—বহিয়া লইয়া যাইতে কষ্ট হইত। আমার ঠাকুরদাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার পিতৃদেবের অন্নপ্রাশনে তিনি দুই টাকার তেল কিনিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিয়াছিাম—দুই টাকার তেলে অন্নপ্রাশনের ভোজ ! তিনি বলিলেন, 'দুই টাকায় বত্রিশ সের তেলে একটা ভোজ হবে না ?'—আমরা তখন টাকায় চারি সের তেল ও আড়াই সেরের অধিক ঘি কিনিতে পাইতাম না। আমাদের গ্রামের মধু নাপিত আমাদের পারিবারিক নাপিত ছিল, সমগ্র পরিবারস্থ সকলকে কামাইয়া সে বার্ষিক এক টাকা বেতন পাইত ; অক্ষয় ধোপা আমাদের কাপড় কাচিত। তাহার বেতন ছিল বার্ষিক পাঁচ টাকা। অথচ অক্ষয়ের বাড়ীতে সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। 'বৈয়ে' (বৈকুণ্ঠ) কলু একখানি ঘানী পিড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু সে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিত। মধু নাপিত একদিন ঠাকুরদাদাকে কামাইতে আসিল, মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাক্লিষ্ট। ঠাকুরদাদা বলিলেন, 'খবর কি মধু, মুখ অতো ভার ভার দেখছি যে !' মধু ঠাকুরদাদার গালে সজল হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল,—'আর কর্ত্তা, ছেলেপুলেদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেওয়া দায় হ'য়ে উঠলো ! মাধব চাটুয্যের চা'লের দোকানে শুনে এলাম, চালের মণ হয়েছে পাঁচ সিকে !'—সেই চাউল একদিন এক মণ আট টাকায় কিনিয়াও পরিবার প্রতিপালন করিয়াছি। আমার বড় মাসীমার শ্বশুরকে গ্রামের জমিদার পদ্ম মল্লিক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "সা'জি, এবার মুগের জোগাড় করতে পারি নি, চাট্টি মুগ পাঠিয়ে দিও।'—মাসীমার শ্বশুর তাঁহাকে চারিটি বলদের পিঠে আট বস্তা মুগ পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন 'এ কটি মুগ আপনার সেবার জন্যে দিলাম, ওর আর দাম দিতে হবে না।'—এ সকল কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। জিনিসপত্র সস্তা, কিন্তু দেশে টাকা নাই ; তখনও ছিল না—তবে ?

যে বাল্যকালের কথা বলিতেছিলাম, তাঁহার কথাটা শেষ করি—বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার

আগ্রহের অভাব দেখিয়া তাঁহার পিতার কোন বন্ধু বলিলেন, 'তোমার সোনার টাট থাক্‌তে ছেলেটাকে মা সরস্বতীর বাহন করবার চেষ্টা করছ কেন ? ওকে দোকানে ভর্ত্তি ক'রে নেওয়াই ভাল।'—বন্ধুর পিতা কুণ্ডু মশায় বলিলেন, 'ব্যবসা-কর্ম্ম ত আছেই ; একটু 'গোব্যরস' ওর পেটে পড়ুক।' 'গোব্যরস' কি না 'ইংজিরি' বিদ্যে এক-আধটু পেটে না পড়লে কেউ মানতে চায় না হে ! আমি কারবারী মানুষ, দরকার হ'লে 'যদিস্মাৎ' ডেপুটী মুনসোফ্‌দের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাহলে শা-রা একবার বস্‌তে বলে না হে ! আর আমার উকীল হরিশ তরঙ্গ ডেপুটী হাকিমের কামরায় ঢুকতেই 'বসেন বসেন' ব'লে কেদারা দেখিয়ে দিলে ! অথচ আমি ও রকম ডেপুটী মুনসোফ দু' পাঁচটাকে চাকর রাখতে পারি।—আমার ইচ্ছে ছোঁড়াটাকে উকীল করি। নিজেরও ত মামলা-মকদ্দমা আছে।' আমার বন্ধুটি উকীল হওয়া দূরের কথা, প্রবেশিকার গোষ্পদও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহার সহপাঠীদের কেহ কেহ উকীল হইলেও তাঁহাদের অবস্থা 'অদ্য ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ', আর বন্ধুটি এখন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবারের মালিক ; তিনি স্বয়ং কারবারের টাকায় যে জমিদারী করিয়াছেন, তাহার আয় বার্ষিক পনের কুড়ি হাজার টাকা ! তাঁহার আমোলে মেহেরপুরের বাজারে একজনও মাড়োয়ারী প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন যাঁহারা মেহেরপুরের বাজারের প্রধান ব্যবসাদার ছিলেন, তাঁহাদের পৌত্র ও দৌহিত্ররা এখন মাড়োয়ারীদের দোকানে পনের কুড়ি টাকা বেতনের চাকরী করিতেছে। কেহ কেহ উকীলের মহুরী বা আদালতের আমলা। মেহেরপুরের বাজারে এখন মাড়োয়ারীরাই নেতৃত্ব করিতেছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ। সাধে কি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, 'ল-কলেজ উঠাইয়া দাও, উচ্চশিক্ষা বন্ধ কর।'

কিন্তু সেকালে ইংরাজী অর্থকরী বিদ্যা ছিল। 'যেমন তেমন চাক্‌রী—দুধ-ভাত'-কথাটা সকলের মুখেই শুনিতে পাইতাম। সেকালে ইংরাজী না শিখিয়াও কেবল 'কেতাবতি বিদ্যা'র জোরে অনেকে চাকরী করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। রাম নারায়ণ নাজীর আমাদের সমাজের চাঁই ছিলেন ; তিনি মুন্সেফী আদালতে নাজীরি করিয়া যে অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অনেক সহপাঠী এবং শিশুর দল মুন্সেফী আদালতের নাজীরিকেই চাকরীর আদর্শ মনে করিত ; তাহাই তাহাদের যৌবনের তপস্যার বিষয় ছিল। আমাদের গ্রামের হরিনাম চক্রবর্তী কেবল বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া কোন প্রবল প্রতাপ বিখ্যাত জমিদারের সদর নায়েব হইয়াছিলেন, এবং নায়েবী করিয়া কেবল যে মহাসমারোহে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করিতেন এরূপ নহে ; তিনি একটি বৃহৎ জমিদারীও রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রথ পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি এখন হতশ্রী হইলেও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। আমার বাল্যকালে আমার কাকা যখন মেদিনীপুর জেলায় মহিষাদল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, সে সময় তিনি উক্ত নায়েব মহাশয়ের অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা বেতন পাইলেও বেতনাতিরিক্ত অর্থ গ্রহণে এরূপ বীতস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিলে আমাদের সমগ্র পরিবারকে অন্নাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল ; অথচ তাঁহার যিনি 'সব ম্যানেজার' ছিলেন, তিনি গল্প করিতেন, প্রথম যৌবনে তিনি মহিষাদল এষ্টেটে মাসিক আট আনা বেতনে চাকরী আরম্ভ করিয়াছিলেন ; যখন তিনি সব-ম্যানেজার—সেই সময় তিনি একটি বড় জমিদারীর মালিক, এতদ্ভিন্ন তিনি একটি হাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্ষিক বারো হাজার টাকা আয় ছিল। মেহেরপুর জমিদারীর তাৎকালিক ইংরাজ মালিক 'নিশ্চিন্তপুর কান্‌সার্ণের' জমিদার ছিলেন, তাঁহাদের সদর নায়েব মৃত্যুকালে তিন লক্ষ

টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং সেকালে বাঙ্গালা-নবীশরাও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

আমার পিতৃদেব বাঙ্গালা নবীশ ছিলেন, কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল ; সে সময় মেহেরপুরে তাঁহার মত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কেহ লিখিতে পারিতেন না ; তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, তিনি সাধারণতঃ কৃষ্ণনগরেই থাকিতেন ; তাঁহার যৌবনকালে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এ জন্য তিনি ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি আস্থাহীন হইলেও ঘরে বসিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি, তিনি আসনে বসিয়া করজোড়ে 'অলখ নিরঞ্জনের' উপাসনা করিতেন, তাঁহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুর প্রবাহ বহিত, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার উপাসনা শেষ হইত না। আমাদের বাল্যকালে 'পদ্যপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবার মেহেরপুর গিয়াছিলেন ; মেহেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় ব্রজরাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শ্যালক ছিলেন। তিনি শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইলে আমরা ছেলের দল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম ; তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাঁহার রচিত পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগের সন্ধ্যা নামক কবিতার কিয়দংশ মনে পড়িয়াছিল,—

> "দেবালয়ে নিনাদিত হতেছে কাঁসর,
> যে বলে বলুক ঐ কাঁসরে কর্কশ ;
> আমার নিকট উহা শ্রুতি-সুখকর,
> হৃদয়েতে আবির্ভাব করে শান্ত-রস ;
> জ্ঞানী নই. পাই নাই পরমার্থ-জ্ঞান,
> বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিনি না চিন্ময়ে ;
> জানি না কি লেখে তন্ত্র পুরাণ নিচয়ে।
> জানি এই, যোগী যারে ধেয়ায় হৃদয়ে,
> সরলা বালিকা পূজে পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়া,
> সেই বিশ্বপতি দেবে সায়াহ্ন সময়ে
> সুখী হই ভক্তিভাবে হৃদে আরাধিয়া।"

এ প্রকার সরল, হৃদয়ের অনাবিল উচ্ছ্বাস পূর্ণ, শান্ত-রসাস্পদ কবিতা একালের 'মিষ্টিক' কবিতার কুজ্ঝটিকা-জালের ভিতর একটিও খুঁজিয়া পাইয়াছি কিনা সন্দেহ। সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল, সাহিত্য-সাধনাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা. ইহাতেই জীবনের সকল সুখশান্তি পর্য্যবসিত ; তাই বুঝি লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এসো না, এ দীন জন-কুটীরে।'—কে জানিত, মা লক্ষ্মী ভবিষ্যৎ জীবনে এ ভাবে বিমুখ হইবেন ? পিতৃদেব তাঁহার প্রথম যৌবনে 'কুসুম-কামিনী' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যদুগোপালবাবুর প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যদুগোপালবাবুর সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল, এবং মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজে তাঁহার কবিত্ব-শক্তিরও কিঞ্চিৎ খ্যাতি হইয়াছিল। পিতৃদেবই মেহেরপুরের প্রথম গ্রন্থকার। আমি এই পৈতৃক সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী। গ্রন্থরচনা করিয়া পিতৃদেব কাহারও কাহারও উপহাসভাজন হইয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাতে বিরত হইলেও একখানি খাতায় 'আকিঞ্চনের মনের কথা' লিখিয়া

রাখিয়া ছিলেন ; তাহাতে সেই সময়ের সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা, ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে আমি সেই খাতাখানি তাঁহার দপ্তরে দেখিতে পাই নাই ; সম্ভবতঃ কাহাকেও পড়িতে দিয়াছিলেন, আর ফেরত পাওয়া যায় নাই।

মেহেরপুরে আমাদের বাড়ীর অদূরে গোয়ালা চৌধুরীদের গড়ের মাঠে যে বসন্ত মেলা হইয়াছিল, এক বৎসর পরে পুনর্ব্বার সেই মেলা বসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বৎসর অর্থাভাবে তেমন সমারোহ হয় নাই ; দশভূজা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বাসন্তী পূজা হইয়াছিল, এবং মেলা উপলক্ষে কতকগুলি দোকান বসিয়াছিল। বারোয়ারীর আসরে যাত্রাগান, ঢপ, কবি, কীর্ত্তন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কিন্তু সে সকলই স্থানীয়। মেহেরপুরের চারি মাইল দক্ষিণে মোনাখালি নামক গ্রামে সেই সময় একটি নূতন যাত্রাদলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এবার মেলায় সেই দল বায়না করা হইয়াছিল। দলপতির নাম স্মরণ নাই ; কিন্তু সে 'সীতার বনবাস' পালায় হনুমান্ সাজিয়াছিল ; সে যখন আসরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সে সাধারণের গমনা-গমনের পথ ত্যাগ করিয়া, আসরের বাঁশের খুঁটী বহিয়া নামিয়া আসল হনুমানের মত 'হুপ্‌হাপ্' শব্দ করিতে করিতে আসরের ভিতর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এই দৃশ্য আমাদের ছেলের দলের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল।

সেই সময় আমাদের গ্রামের কোন কোন সমৃদ্ধ লোকের বাড়ী শীত ও বসন্তকালে দুই তিন মাস ধরিয়া কথকতা চলিত। কথক ঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মেহেরপুরেরই অধিবাসী ছিলেন ; তিনি সুকণ্ঠ ও সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার সরস রসিকতায় শ্রোতার দল, প্রাণ ভরিয়া হাসিত, এবং তাঁহার মধুর ধর্ম্মোপদেশ সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত। তিনি যখন করুণ-রসের অবতারণা করিতেন, তখন পুরুষ ও রমণী সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত। একবার চাটুয্যে-গিন্নী তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া আসিয়া বাড়ীতে তিন মাস 'কথা' দিয়াছিলেন ; এই উপলক্ষে তাঁহাদের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় বাঁশের 'চ্যাটাই'-এর আচ্ছাদন দ্বারা একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার নীচে দক্ষিণ প্রান্তে কথক ঠাকুরের উপবেশনের জন্য একখানি কাঠের তক্তপোষ সংস্থাপিত ছিল। সেই আসনে 'উত্তরমুখো' হইয়া বসিয়া কথক ঠাকুর কথকতা করিতেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অনুচ্চ টুলে শালগ্রাম-শিলা সংস্থাপিত হইতেন। কথক ঠাকুরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর প্রসারিত সতরঞ্চিতে বসিয়া শ্রোতারা কথা শুনিতেন। আঙ্গিনার উত্তর-সীমায় একখানি খড়ো ঘর ছিল ; তাহার সম্মুখে চিক টাঙ্গাইয়া পল্লী রমণীগণ সেই চিকের অন্তরালে বসিতেন।

অপরাহ্ন চারিটার সময় কথারম্ভের সংবাদ প্রচারের জন্য চাটুয্যে-বাড়ীতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। আমরা ছেলের দল সেই শব্দ শুনিয়া কথা শুনিতে ছুটিতাম। বিলম্ব হইলে স্থানাভাব হইতে পারে ভাবিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া 'ফরাস' অধিকার করিতাম। গ্রামস্থ অধিকাংশ ভদ্রলোক পাঁচটা বাজিবার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকরা মাটীতে বসিয়া নিস্পন্দভাবে কথা শুনিত। কথক ঠাকুরের ললাট চন্দনচর্চ্চিত, নাসিকায় দীর্ঘ তিলক ; শিখার গ্রন্থিতে একটি ফুল। দেহ রেশমী নামাবলি দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য। তিনি তূলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাঠের আবরণাবৃত প্রায় এক হাত দীর্ঘ পুথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন ; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন ; কখনও হাসাইতেন, কখনও কাঁদাইতেন। কথা কহিতে কহিতে শ্রান্তি-বোধ হইলে ট্যাঁক হইতে নস্যপূর্ণ শামুক বাহির করিয়া দুই এক টিপ নস্য লইতেন, এবং সম্মুখস্থিত তো-করা গামছাখানি দ্বারা নাকমুখ মুছিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গীতের সুরে

কথা আরম্ভ করিতেন।

এক কথকতা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপরি প্রাপ্তিও মন্দ হইত না। সন্ধ্যার পর কথা শেষ হইলে কোন দিন তিনি চিকের অন্তরালস্থিত পুরমহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'মা সকল, কাল রামের বিবাহ, বিবাহে 'নকৃতা' দিতে হয়,—তা যেন মনে থাকে।'—কোনদিন বলিতেন, 'কাল লক্ষ্মণ-ভোজন, সিধা আনিতে ভুলিও না।'—কেহ নূতন কাপড় দিত, কেহ কাঠের 'বারকোশ' পূর্ণ করিয়া সিধা দিত, কেহ নূতন কাঁসার ডিসে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দিত ; এতদ্ভিন্ন ডাব, পেঁপে, তরমুজ, সুপক্ক কলা, এবং নানাবিধ তরকারিও তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইত।—এবং ভাবে এক এক বাড়ীতে দীর্ঘকাল কথকতা চলিত।—একালে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের এই সুন্দর প্রথাটি বিলুপ্ত হইয়াছে ; আমাদের পল্লী হইতে কথকতা উঠিয়াই গিয়াছে। সে কালে যাঁহারা কথকতা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন, এ কালে তাঁহাদের বংশধররা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গার্ল স্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া সেকেলে রামায়ণ, মহাভারত আর স্পর্শ করেন না ; এখন তাঁহারা সাহিত্যে 'আর্ট' ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক, নব্য ঔপন্যাসিকদিগের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, রামায়ণে আর মন উঠে না।

ঘরে বসিয়া কাকার কাছে কথামালা পড়িলাম ; কিন্তু 'বাঘ ও বকের' গল্প পড়িয়া সময় নষ্ট করিতেছি দেখিয়া ঠাকুরদাদা আমাকে অধিকারী পাড়ার পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। শ্রীচরণ অধিকারীর চণ্ডীপণ্ডপে সেই পাঠশালা বসিত। সীতানাথ অধিকারী সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু তিনি বেতের সাহায্যে বিদ্যার অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার ন্যায় ঔদরিক ফলারে ব্রাহ্মণ গ্রামে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তাঁহার বাঁ পাখানি অন্য পা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ছিল ; এ জন্য হাঁটিবার সময় তাঁহাকে একটু খোঁড়াইতে হইত। কেহ কেহ বলিত, যৌবনকালে তিনি পরকীয়া-প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—ইহা তাহারই ফল ! তিনি সামান্য কারণে বা অকারণে যে সকল পড়ুয়াকে বেত্রাঘাত করিতেন, তাহারা তাঁহার অদৃশ্য থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত,—

"খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং
কার হাঁড়িতে ফ্যান্ খেয়েছিস,
কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং ?"

কে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এইভাবে উপহাস করিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না ; এ জন্য পাঠশালায় আসিয়া অধিকাংশ পড়ুয়াকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেন। দুই একজনের অপরাধে প্রায় সকলেই শাস্তি পাইত।

স্নেহ-মমতাহীন, বেত্রমাত্র সম্বল এই লুব্ধ গুরু মহাশয়ের হাতে আমার শিক্ষা আরম্ভ হইল ; তিনি আজ পরলোকে, বিশেষতঃ গুরুনিন্দা মহাপাপ, কিন্তু এখানে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে আমার এই স্মৃতি-কথা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেকেলে গুরু মহাশয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী একালে উপকথার বিষয় হইয়াছে, অধুনালুপ্ত যে সকল জীবের অস্তিত্ব এখন কেবল কল্পনাতেই স্থান পাইতেছে, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ কদাচিৎ কোন যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সেকালের পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী এবং সেকেলে গুরু মহাশয়দের রীতি-প্রকৃতি ও চরিত্র-চিত্র একালের সাহিত্যে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।

আমি আমার পাঠ্যপুস্তক কথামালা ও শ্লেট-পেন্সিল লইয়া যেদিন সীতানাথ অধিকারীর পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিনের কথা এখনও আমার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রহিয়াছে। অধিকারী পাড়ার ও মুখুয্যে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরাই এই পাঠশালায় পড়িতে আসিত। আমরা আমাদের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়াতে আমাকে ভিন্ন পাড়া হইতে আসিতে হইত। গুরু মহাশয় আমার হাতে কথামালা ও শ্লেট দেখিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন ; তাহাতে কতখানি বিস্ময় ও বিরক্তি ছিল, তাহা ঠিক বুঝাইতে পারিব না। তিনি কথামালাখানি নাড়িয়া চাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বিদ্যেসাগর এই সকল বই লিখে ছেলেগুলার মাথা খাচ্ছে, না হে বাপু, ঐসব 'বাগের' আর 'বগের' কেচ্চা এখানে চল্‌বে না। তোমাকে একখান শিশুবোধক কিন্‌তে হবে। শটকে, কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পোন শিখতে হবে ; আর তালপাতে লিখতে হবে। কাল থেকে পাততাড়ি, খাগের কলম, এক দোয়াত ঝিউনীর কালী, আর বস্‌বার জন্যে ছোট একখান 'পাটী' কি কুশাসন আন্‌বে।"

কেঁচেগণ্ডূষ ! আমি বিপদে পড়িলাম। কোথায় কিরূপে পাততাড়ি সংগ্রহ করি ? সৌভাগ্যক্রমে আমার কাকার শ্বশুর-বাড়ীতে তালগাছ ছিল, তাঁহার শ্যালক মণি পালকে মুরুব্বী করিলাম ; তিনি তাঁহাদের কৃষাণকে আদেশ করায় সে তালগাছে উঠিয়া দুই তিনটা ডেগ্‌রো কাটিয়া দিল। তাহারই সাহায্যে কতকগুলি পাতা পাততাড়ির উপযোগী করিয়া কাটিয়া লইলাম ; কিন্তু টাটকা পাতা সবুজবর্ণ, তাহার উপর কালী ফুটে না। পাঠশালার পড়ুয়াদের উপদেশে সেই পাতাগুলি একত্র বাঁধিয়া, পাতকুয়ার পাশে যেখানে বাড়ীর মেয়েরা স্নান করিতেন, সেই স্থানের মাটী খুঁড়িয়া কাদার ভিতর পুঁতিয়া রাখিলাম। স্যাঁতা মাটীর ভিতর চারি-পাঁচ দিন প্রোথিত থাকায় তালপাতাগুলির রঙ্ ফিকা হইল, মসৃণতাও কমিয়া গেল। মহা উৎসাহে সেগুলি ধুইয়া শুকাইয়া লইলাম। সরস্বতী-পূজার সময় জলচৌকীর উপর ঠাকুরদাদার রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পূজার জন্য দেওয়া হইত ; সেই সময় মাটীর দোয়াতে দুধ ও খাকের কলম দেওয়ার নিয়ম ছিল, পল্লী গ্রামের গৃহস্থ গৃহে সরস্বতী পূজার সময় এই নিয়মটি এখনও পালিত হয়। ঠাকুরদাদার দপ্তরে ঐরূপ খাকের কলম অনেকগুলি ছিল, তাহাই একটা তাঁহার নিকট চাহিয়া লইলাম। কাকা লিখিবার জন্য 'বিলাতী-কালী' প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; একখানি লোহার কড়াইয়ে বাবলার ছাল, হীরাকস প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস জলে ভিজাইয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইয়াতে দেওয়া হইত, তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ কষ বাহির হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে গাঢ় হইলে তাহাই লিখিবার কালী রূপে ব্যবহৃত হইত। এই কালীকে 'কষ কালী' বা 'বিলাতী কালী' বলা হইত। একটা মাটীর দোয়াতে সেই কালী ঢালিয়া লইয়া একখানি নূতন শিশুবোধক, পাততাড়ি, একখানি মাদুরের আসন ও সেই দোয়াতসহ মহা উৎসাহে পাঠশালায় উপস্থিত হইলাম। গুরু মহাশয় আমার দোয়াতের কালী পরীক্ষা করিয়া ক্রোধে মুখ বিকৃত করিলেন, তাহার পর আমার পিঠে দুম্ করিয়া এক কিল মারিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোর ঝিউনীর কালী ?—এ ইংরাজী কালীতে তালপাতায় লেখা চল্‌বে না। এ কালী ফেলে দিয়ে কাল ঝিউনীর কালী আন্‌বি, দোয়াতের ভিতর 'কেঠো' দিবি, আর একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে বালি আন্‌বি, বালি না দিলে তালপাতের লেখা ধ্যাবড়া হয়ে যাবে।"

'কেঠো' জিনিষটি কি, তাহা হয়ত এ কালের ইংরাজী-নবিশ পাঠকরা বুঝিতে পারিবেন না।—উহা এক টুকরা ছেড়া ন্যাকড়া, তাহা দোয়াতের ভিতর রাখিলে হঠাৎ দোয়াত উল্টাইলে কালী নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, এবং কলমে অধিক কালী উঠিয়া লেখা ধ্যাবড়াইয়া যায় না

'ঝিউনী'র কালী প্রস্তুতের কৌশল জানিতাম না। আমাদের পাঠশালার সদ্দার পোড়ো সতীশ স্বর্ণকার আমাকে তাহা শিখাইয়া দিল। অর্দ্ধদগ্ধ আতপ চাউলকে আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'ঝিউনী' বলে। তদ্দ্বারা কিরূপে কালী প্রস্তুত হয়, তাহা এই 'ফাউন্টেন পেনে'র যুগে এবং যে সময় বাজারে দেশী ও বিদেশী পঞ্চাশ রকম কালী কিনিতে পাওয়া যায়, সে সময় এ কালের ছেলেদের না জানাই সম্ভব। কিন্তু সে কালে ঝিউনীর কালী ভিন্ন বাঙ্গালা নবীশদের লেখা চলিত না ; দোকানদারদের খাতাপত্রও সেই কালীতেই লেখা হইত। মা আমার আবদার অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া 'কাঠখোলায়' (অর্থাৎ খোলা-হাঁড়িতে বালি না দিয়া) এক খোলা আতপ চাউল ভাজিয়া দিলেন। ভাজিতে ভাজিতে খোলা হাঁড়ি হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হইতে লাগিল, এবং চাউলগুলি পুড়িয়া কালো হইল। আমি সেই পোড়া চাউলগুলি একটা বাটিতে ভিজাইয়া রাখিলাম। আট দশ ঘণ্টা ভিজিবার পর সেই জলের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ হইল। তখন খানিক চুল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা খোলা হাঁড়ির গা ঝাড়িয়া খানিক 'ভুষো কালী' একখানি কাগজে সঞ্চিত করিলাম। তাহার পর একটা পাথরের খোরায় সেই ভুষো ঢালিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণ ঝিউনির জল দিয়া একটা খোটনার সাহায্যে খুঁটিতে লাগিলাম। কালীটা অত্যন্ত গাঢ় হইল দেখিয়া তাহাতে আরও খানিক ঝিউনীর জল, কিঞ্চিৎ হীরাকস ও গঁদের আটা দিয়া দশ পনের মিনিট খুঁটিতেই সেই কালী ব্যবহারযোগ্য হইল। সেই কালী মাটীর দোয়াতে ঢালিয়া দোয়াতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার 'কেঠো' দিলাম। খাকের কলম দিয়া সেই কালীর সাহায্যে তালপাতায় যখন আমার আঁকা-বাঁকা ছোট-বড় হরফগুলা ফুটিয়া উঠিল, তখন এত আনন্দ হইল যে, তাহা ঠাকুরদাদাকে না দেখাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। ঠাকুরদাদা সস্নেহে বলিলেন, "লেখায় যখন তোর এত যত্ন, তখন তুই বড় হয়ে ভাল লিখ্‌তে পারবি।"—আমরা সেকালে হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতাম, এ কালের ছেলেরা তাহা পণ্ডশ্রম মনে করিবে। যখন ইংরাজী স্কুলে ক্লাশে পড়িতাম, তখন ক্লাশের শিক্ষক মহাশয় 'কাপি বুক' দেখিয়া খাতায় প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া আনিতে বলিতেন ; আমার প্রতিবেশী বন্ধু ও সহপাঠী সুরেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর ও লেখার টান আমার অপেক্ষা ভাল ছিল। মাষ্টার মহাশয় আমাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য হস্তাক্ষরে নম্বর দিতেন, সুরেন্দ্রনাথ ২০ নম্বরের মধ্যে ১৬/১৭ পাইতেন, আমি ১৪/১৫ পাইতাম। আমি বন্ধুর হস্তাক্ষরের হিংসা করিতাম। তিনি এখন মফঃস্বলে কোর্টের বড় উকীল, বড় বড় ব্যারিষ্টারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মামলা জিতিয়া আসেন ; মান-সম্ভ্রম ক্ষমতা-প্রতিপত্তিতে কে তাঁহার সমকক্ষ ? আর আমি ? মাতৃভাষার নগণ্য সেবক, অসহায় বার্দ্ধক্যে জীবনের যুদ্ধে পরাভূত। তথাপি সে কালের সেই বাল্য বন্ধুত্বের কথা স্মরণ হইলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। প্রথম জীবনে যাহাদের সহিত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারা আজ কোথায় ? সন্ধ্যার স্তিমিত দীপালোকে একাকীগৃহকোণে বসিয়া নিজেকে নিতান্ত নির্ব্বান্ধব ও নির্ব্বাসিত বলিয়া মনে হয়। কোথায় বাল্যের সেই সুখ, আনন্দ ও তৃপ্তি !

কিন্তু তথাপি শৈশবে গুরু মহাশয়ের বেত খাইয়া পাঠশালার বিরুদ্ধে অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তিনি একাদশীর উপবাসের পর দ্বাদশীর পারণ করিবেন, সে জন্য তিনি সকল পড়ুয়াকে সিধা আনিতে বাধ্য করিতেন। সিধায় চাউল, ডাল, তরকারীর পরিমাণ অল্প হইলে বেত চলিত। পড়ুয়াদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত নামক একটি ছাত্র গুরু মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিল। তাহার বাবার মশলার ও তামাকের দোকান ছিল। মধুসূদন গুরু মহাশয়ের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ সকল জিনিস তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে দোকান হইতে আনিয়া গুরু মহাশয়কে উপহার দিত। বিশেষতঃ অম্বুরী তামাকে গুরু মহাশয়ের অত্যন্ত লোভ ছিল।

গুরু মহাশয়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া মধু আমাদের দলপতি হইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আমরা তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিতাম না। এ জন্য মধু আমাদের বিরুদ্ধে গুরু মহাশয়ের কাছে 'ঠকামী' করিত; তাহার কথায় আমরা শাস্তি পাইতাম। শেষে আমরা দল বাঁধিয়া মধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলাম। মধুকে ক্ষ্যাপাইবার জন্য একটি ছড়া রচিত হইল, তাহা এই—

"মোদো খায় খোদোর বীচি,
নীলমণি খায় ফ্যান্।
মোদোর বাপের দাড়ি ধ'রে,
নাচ্‌বে কোলা ব্যাং"

এই ছড়া শুনিয়া মধু রাগিয়া আগুন। সে গুরু মহাশয়ের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। সীতারাম অধিকারী গুরু মহাশয় ভিজা গামছাখানি তো করিয়া মাথায় দিয়া টুলে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে আমাদের বিচার আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, "মশায়, ও ছড়ায় মধু ক্ষ্যাপে কেন? 'মোদো' মধুর নাম নয়, 'খোদোর বীচি' যে কি জিনিস, তা আমাদের জানা নেই, নীলমণি কে, তাও জানি না, আর ফ্যান খাওয়াও দোষের কথা নয়। বিশেষতঃ মধুর বাপের দাড়িগোঁফ নাই, কোনও ব্যাংও দাড়ি ধ'রে নাচে না।"—গুরু মহাশয় এই সুস্পষ্ট জবাবের উত্তরে আমার পাঁজরে শপাং শপাং করিয়া বেত মারিলেন, এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তোর বাবা কেতাব লেখে তুই তারই ছেলে ত! ও ছড়া তুই-ই বেঁধেছিস্!"—সঙ্গে সঙ্গে হাতে মাথায় পিঠে শপাশপ বেত পড়িতে লাগিল। সেই বেতের চোটে কিনা বলিতে পারি না, সেই রাত্রিতে আমার জ্বর আসিল। রংটা একটু ফরসা ছিল, বেতের আঘাতে পিঠে দড়ার মত দাগ হইয়াছিল। বাবার এক বিধবা পিসী আমাদের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, কারণ, আমার জন্মের পূর্ব্বেই পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গত ৭০ বৎসরের মধ্যে আমাদের বৃহৎ পরিবারে আমার পিতাঠাকুরের প্রথমা পত্নী (আমার মাতা ঠাকুরানীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী) ব্যতীত সধবা অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হয় নাই! দিদিমা আমার পিঠের দুর্দ্দশা দেখিয়া খোঁড়া গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা রহিত করিলেন। ঠাকুরদাদার 'খঞ্জে' হইতে তাঁহার তামাক কি কারণে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইত, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন, সুতরাং তিনিও আর আমাকে অধিকারী পাড়ার পাঠশালায় পাঠাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। সেই স্থানেই আমার ধারাপাত শিক্ষার খতম, এবং শিশুবোধকের 'গুরুদক্ষিণাতেই' পাঠশালার গুরুদক্ষিণা শেষ হইল। ১৩০৪ সালে যখন 'বসুমতীর' কর্ণধার কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ 'বসুমতীর' গুরুভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করেন, সেই সময় পূজার অবকাশে আমি মেহেরপুরে গিয়াছিলাম, সে সময় অধিকারী মহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন: তিনি কোমরে চাদর বাঁধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম করিলে তিনি আমাকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, এবং হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাপু হে, আমার বেতের গুণেই আজ মা সরস্বতী তোমার 'পৃতি' সদয়। এখনও আমি 'গুমোর' ক'রে সকলকে বলি, আমিই গাধা পিটিয়ে তোমাকে ঘোড়া করেছি। তা বাপু, পুকুরে ঘোড়া নয়, মস্ত বড় তাজী ঘোড়া।" ইত্যাদি আমি তাঁহাকে সবিনয় জানাইলাম—তাঁহার বেতের মহিমা কখন ভুলিতে পারিব না।

পাঠশালা ডিঙ্গাইয়া বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। সেই স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়া হইত। সেখানে কিছুদিন পড়িয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। আমার কাকা তখন রাজমহলের স্কুলের চাকরী ত্যাগ করিয়া আসিয়া মেহেরপুরের ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং প্রায় পঞ্চান্ন বৎসরকাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনেকের তিন পুরুষকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ইংরাজী স্কুলে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।

ইংরাজী স্কুলে আমার সহপাঠীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। আমাদের প্রতিবেশী, মুন্সেফী আদালতের উকীল দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মনোমোহন ওরফে মুনু বা মনু তিন চারি বৎসর এক এক শ্রেণীতে পাকা হইয়া যে বার আমাদের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইল, সেবার মনু এমন এক কীর্ত্তি করিয়াছিল যে, সে কথা কোনদিন ভুলিতে পারিব না। মনু তখন দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠকায় ষোল সতের বৎসর বয়সের কিশোর। তাহার নষ্টামীর সীমা ছিল না। তাহার জিহ্বাটি মুহূর্ত্তের জন্য মুখ বিবরে আবদ্ধ থাকিত না, এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্তভাবে লালা নিঃসারিত হইত। তৃতীয় শিক্ষক জানকী মাষ্টার ক্লাশে অঙ্ক কসিতে দিয়াছেন, আমরা শ্লেটে অঙ্ক কষিতেছি; মনু মনোযোগ সহকারে একটি বানর আঁকিয়া তাহার নীচে লিখিল—"থার্ড মাষ্টারের আসল চেহারা।"—আমরা সকলেই অঙ্ক দেখাইলাম, মনু আর শ্লেট নামায় না। জানকী মাষ্টার বেত্র-প্রয়োগে আমার বাল্যের গুরু মহাশয় সীতানাথ অধিকারীর জোড়া ছিলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতিবেশী, এবং জ্ঞাতি; সম্বন্ধটা ঠিক স্মরণ নাই। জানকী মাষ্টার বেত উঠাইয়া বলিলেন, "এই মনু, অঙ্ক হয়েছে?"—মনু লালাবর্ষণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হয়েছে, ল্যাজটুকু বাকী।"—"ল্যাজ বাকী কি রে? অঙ্কর ল্যাজ!"—তিনি মনুর সম্মুখে আসিয়া তাহার হাতের শ্লেট টানিয়া লইয়া দেখিলেন মনু বানর আঁকিয়াছে! তিনি উহা নিজের প্রতিকৃতি বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও যখন দেখিলেন, মনু তাহার নীচে মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছে—"থার্ড মাষ্টারের আসল চেহারা"—তখন তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনুর সর্ব্বাঙ্গে সবেগে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। মনু সবেগে প্রচুর লালা নিঃসারিত করিতে করিতে দেহের নানা ভঙ্গী করিয়া আক্রমণে বাধাদানের চেষ্টা করিতে লাগিল। মারের চোটে কচার ডাল ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু মনুর দুষ্টুমীভরা মুখে কাতরতার চিহ্ন দেখা গেল না, চক্ষুতে এক বিন্দু অশ্রু নাই। ক্রুদ্ধ জানকী মাষ্টার শ্লেটখানি লইয়া হেড্‌মাষ্টার রাখাল বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাখালবাবু আমাদের ক্লাশে আসিয়া মনুকে বেঞ্চির উপর 'নীল ডাউন' করিয়া দিলেন। মনু চারিদিকে চাহিয়া তাহার পার্শ্বস্থ সহপাঠীর কানে কানে বলিল, "ল্যাজটা ছোট হয়েছে ব'লে মাষ্টারমোশায়ের রাগ!"

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় স্কুলের ঘণ্টা পড়িলে আমরা ক্লাশে প্রবেশ করিবার সময় একখানি কাগজ সেই কক্ষের সম্মুখস্থ দেওয়ালে ঝুলিতে দেখিলাম, তাহাতে মোটা মোটা হরফে লেখা—

"হেড্ মাষ্টার মদে কামড়।
তার নীচেতে প্রবোদ ধামড় ॥
প্রবোদ ধামড়ের নেই কোন রাগ।
তার নীচেতে জানকী বাঘ ॥
জানকী বাঘের দাঁত কিটি মিটি

তার নীচে বেজা টিক্ টিকি ॥
ফোর্থ মাষ্টার গুলী খান।
ফিফৎ মিট্‌মিটে শয়তান।"

স্কুলের পাঁচজন শিক্ষকের গুণ-বর্ণনা! হেড মাষ্টার রাখালবাবু বহুদর্শী সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার ছিলেন ; কিন্তু দেবী সুরেশ্বরীর উপাসক বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। এক এক দিন সন্ধ্যার পর তাঁহারা আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সম্মিলিত হইয়া গল্প-গুজোব করিতেন। আমাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। একদিন আমাকে শ্লেট লইয়া অঙ্ক কষিতে দেখিয়া বলিলেন, "বল ত চারের অর্দ্ধেক কত ?"—আমি বলিলাম, "দুই, ও আর কে না জানে ?" রাখালবাবু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোর কিছু হবে না, গাধা!—চারের অর্দ্ধেক দুই না শন্নি ?" আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে তিনি বলিলেন, "শন্নি নয় ?—দ্যাখ।"—তিনি আমার পেন্সিলটি হাতে লইয়া একটা '৪' লিখিলেন, এবং নীচের আধখানা মুছিয়া ফেলিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, বলিলেন, "এটা কি '২' না '০' ?"

আমার কাকা দ্বিতীয় শিক্ষককে কেহ কখন রাগ প্রকাশ করিতে দেখিত না ; অত্যন্ত গুরু অপরাধ ভিন্ন তিনি ছাত্রদের উপর বেত চালাইতেন না, তথাপি স্কুলের ছেলেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি আদর্শশিক্ষক ছিলেন, এবং প্রাচীন কালের অধ্যাপকের আর্দশে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় শিক্ষক জানকী অধিকারীর বেতের চোটে ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইত, এবং তিনি যখন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিতেন, তখন বাঘের-সহিত তাঁহার তুলনা চলিতে পারিত। বস্তুতঃ, সেই ছড়ায় স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকের বিশেষত্বের উল্লেখ ছিল, এবং উহা মুনুর রচিত—এবিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। কিন্তু মুনু অপরাধ স্বীকার করিল না ; তাহার হস্তাক্ষরও অন্যরকম। তাহার পিতা উকীল ছিলেন, তাঁহার নিকট মুনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মুনুর অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া উহাকে শাস্তি দিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" কিন্তু মুনুর অপরাধ প্রতিপন্ন হইল না। ক্লাশের কোন ছাত্র অপরাধ করিয়া ধরা না পড়িলে সকল ছাত্রের 'ফাইন' করিবার প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দুষ্টুমীতে মুনু একটি 'জিনিয়াস' ছিল। আমাদের পাড়ায় মনুদের বাসার কয়েক শত গজ পশ্চিমে হারাধন সরকার নামক একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন ; তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তিনি মধ্যাহ্নে আদালতের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; কোন বিদেশী লোক মামলা-মোকার্দ্দমা উপলক্ষে আদালতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার উকীল ঠিক করিয়া দিতেন, পারিশ্রমিক লইয়া দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, কোন মামলায় সাক্ষী জুটাইয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিতেন ; এইরূপ উপার্জ্জনে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'গাছতলার মোক্তার' বলিত ; তাঁহার একটি ছেলে ছিল, নাম রজনীকান্ত। আমাদের এক পাড়ায় বাস ; রজনী আমাদের সঙ্গে খেলা ও আমোদ-প্রমোদ করিত।

মুনুর কয়েকটি হাঁস ছিল। কিন্তু আমাদের পাড়ায় শৃগালের উপদ্রব অধিক থাকায় হাঁসগুলি একে একে অদৃশ্য হইয়াছিল। এ জন্য মুনু শিয়াল মারিবার সঙ্কল্প করিল ; কিন্তু বন্দুকের অভাবে গুলী করিয়া মারিবার সুযোগ হইল না। রজনী বলিল, তাহাদের আড়পাড়ায় আখের গুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু শিয়ালে গুড় খাইয়া যায় বলিয়া কৃষকেরা ফাঁদ

পাতিয়া শিয়াল ধরে, তাহার পর লাঠাইয়া মারিয়া ফেলে। রজনী সেইরূপ ফাঁদ পাতিয়া শিয়াল ধরিয়া দিতে চাহিল ; রজনীর উপদেশে মুনু একটি সুদীর্ঘ ও সরল বাঁশের 'আগালে' লইয়া আসিল, তাহার অগ্র ভাগ সুদৃঢ় সরু, সহজেই নোয়াইতে পারা যাইত। রজনী সেই বংশদণ্ডের অগ্রভাগে একগাছা শক্ত শনের দড়ি বাঁধিয়া, তাহার গোড়াটা প্রায় এক হাত মাটীর ভিতর পুতিয়া দিল ; তাহার পর সেই বংশদণ্ডের এক পাশে একটি গর্ত্ত কাটিয়া সেই গর্ত্তের ভিতর পাকা কাঁটালের 'ভুতুড়ি' রাখিল, এবং পূর্ব্বোক্ত শনের দড়ির প্রান্তে একটি ফাঁস প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গর্ত্তটি পরিবেষ্টিত করিল ; তাহা এ ভাবে আট্‌কাইয়া রাখিল যে, শিয়াল কাঁটালের 'ভুতুড়ির' লোভে গর্ত্তে মুখ দিলেই সেই ফাঁস তাহার গলায় আঁটিয়া বসিবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশদণ্ডের অগ্রভাগ সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিবে, এবং শিয়ালটা ফাঁসে আবদ্ধ হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে। তাহার পর বংশদণ্ডটি উৎপাটিত করিয়া লাঠি মারিয়া শিয়ালটিকে হত্যা করা কঠিন হইবে না বুঝিয়া আমরা আনন্দে নাচিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টায় ফাঁদ পাতা হইল। ফাঁদের ভিতর গর্ত্তে পাকা কাঁটালের ভুতুড়ি রাখিয়া আমরা সকলেই মুনুদের বৈঠকখানায় উঠিয়া দেওয়ালের আড়ালে লুকাইলাম, এবং অধীরভাবে শৃগালের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

রজনীর পিতা হারাধন সরকার অত্যন্ত সর্তক লোক ছিলেন ; তিনি পুত্রের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সে আমাদের মত দুষ্ট ছেলের দলে মিশিয়া বখিয়া না যায়, এ জন্য তাঁহার চেষ্টা-যত্নেরও অভাব ছিল না। কিন্তু রজনী সুযোগ পাইলেই তাহার পিতার হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিত। তাহার পিতা তাহাকে ধরিতে আসিলে সে পলায়ন করিত, বা কাহারও 'মাটীকোঠা'য় উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত।

সেদিন অপরাহ্নে হারাধন সরকার কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিয়া রজনীকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সাড়া না পাইয়া যখন অদূরবর্ত্তী পথে আসিয়া আমাদের কলরব শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল, তাঁহার পুত্ররত্ন আমাদের দলে মিশিয়া কোন অপকর্ম্মের ফন্দী আঁটিতেছে!

তিনি পথে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন, "রজনী-রোজো-রজা !— হারামজাদা আছে ওখানে, সাড়া দেবে না! যাচ্ছি তোর কান ধ'রে—"

ক্রোধে সরকারজীর কণ্ঠরোধ হইল। তিনি তাঁহার ছেঁড়া চটি জোড়াটার 'ফটাং ফটাং' শব্দে সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া, হেলিয়া পড়া জামগাছটার তলা দিয়া মুনুদের বৈঠকখানার পশ্চাতের আঙ্গিনায় আসিতেই তিনি মুনুকে দেখিতে পাইলেন ; তাহাকে উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাঁদরটা এখানে আছে ?"

মুনু ভাল মানুষের মত বলিল, "আপনি বাঁদর পুষেছেন না কি ? কৈ, কোনও দিন ত দেখি নি। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে বুঝি ? না, এদিকে আসে নি।"

সরকার বলিলেন, "আমার ছেলে রজনীর কথা বল্‌ছি। সেটা যদি বাঁদর না হবে ত তোমাদের দলে মিশ্‌বে কেন ? সে কোথায় লুকিয়েছে বল। জুতো মেরে—"

মুনু বাধা দিয়া বলিল, সরকার মশাই, মুখ সামলিয়ে কথা বল্‌বেন ; আপনি কায়েত, আর আমরা বামুনের ছেলে ; আপনার এত 'আস্পর্দ্ধা', আপনি আমাদের বাড়ী এসে জুতো মার্‌তে চা'ন !"

সরকার বলিলেন, "আমি বলছি আমার ছেলেকে।—সে এখানে কর্‌ছে কি ? তোমরা একদল ষণ্ডামার্কা এক জায়গায় জুটেছ, কার বাগান লুঠ করবে ? সর্ব্বনাশের ফন্দী আঁটছো

কার ?"

মুনু আঙ্গিনায় নামিয়া বলিল, "মানুষের নয়, শিয়ালের। দেখুন সরকার মোশাই, আমার ছ'টা হাঁস ছিল, একে একে সবগুলো শিয়ালের পেটে গিয়েছে, তাই শিয়াল মারবার জন্যে ঐ দেখুন ফাঁদ পেতে রেখেছি। আমরা ত শিয়াল ধরবার ফাঁদ পাত্‌তে জানি নে। রজনী ফাঁদটা পেতে দিয়েছে।"

এ কথায় হারাধন সরকারের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে গিয়েছে, নেকাপড়া ছেড়ে শিয়াল মারবার জন্যে ফাঁদ পাত্‌তে এসেছে ? তার ফাঁদের মুখে মারি লাথি !"

সরকার মহাশয় ক্রোধে কাঁপিরে কাঁপিতে দ্রুতবেগে অদূরবর্ত্তী ফাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া উত্তেজিত ভাবে সেই ফাঁদের গর্ত্তে কাঁটালের ভুতুড়ির উপর সবেগে পদাঘাত করিলেন। আর কোথায় যাবে ? মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার হাঁটুর নীচে ফাঁস বাধিয়া গেল ; বাঁশের আগা তীরবেগে সোজা হইল, এবং সেই সুদৃঢ় শনের দড়িতে আবদ্ধ হইয়া দশ হাত ঊর্দ্ধে তিনি হেঁট মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে ঝুলিতে লাগিলেন ! তাঁহার ছেঁড়া চটি জোড়াটা পা হইতে খসিয়া নীচে পড়িল। তিনি দড়িতে ঝুলিতে ঝুলিতে করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মলাম, আমাকে নামিয়ে নে, বাবা। আমার পায়ে ফাঁসি ! রক্ষে কর, রক্ষে কর !"

আর 'রক্ষে কর !' তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই যে দিকে পারিলাম, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পাশেই আমাদের বাড়ী, আমি আমাদের বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে লুকাইলাম।

আমাদের প্রতিবেশী যদু ঘোষ মুনুদের বৈঠকখানার পার্শ্বস্থিত জামগাছতলার গলিপথ দিয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। হারাধন সরকারের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ ফাঁদের নিকট উপস্থিত হইল। সে সরকারকে হেঁটমুণ্ডে বাঁশের মাথায় আবদ্ধ দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া ব্যাপার কি ঠিক বুঝিতে পারিল না। গোপনন্দন কিঞ্চিৎ স্থূলবুদ্ধি। সে সবিস্ময়ে বলিল, "হঃ সরকার মোশাই যে ! আপনি শিয়াল মারা ফাঁদের দড়িতে ঝুলচো ! কাঁটালের ভুতুড়ি খেতে এয়েলে নাকি ? বড্ডা নাকাল হচ্চেন ত তোমার।"

সরকার কাতর স্বরে বলিলেন, "বাবা যদু, আমাকে শীগ্‌গির নামিয়ে নে। আমার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার যো হয়েছে।"

যদু বলিল, "আপনি অতখানি উচুতে ঝুলচো, হাত বাড়িয়ে নাগাল পাব না যে।—দুই হাত নীচে বাড়িয়ে একটা ঝাঁকুনী দাও সরকার মোশাই !" যদু ঘোষ সরকারের হাত দুইখানি ধরিয়া নীচে টানিয়া আনিল ও ফাঁদের মুখ আলগা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল। তিনি যদু ঘোষের দুই হাত ধরিয়া কথাটা গোপন রাখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যদু ঘোষ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেও মুনু সেই দিনই কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিল।

এই ঘটনার বহুদিন পরে আর একবার মুনু তাহাদের গ্রামের এক সুদ্‌খোর বাবাজীকে জব্দ করিয়াছিল। বাবাজী তাহাদের গ্রামের এক প্রান্তে বাস করিত ; কিন্তু তাহার জমীজমা ও দেবদাসী ছিল, গ্রাম্য চাষীদের চড়া সুদে সে টাকা ধার দিত, এবং এক পয়সা সুদ ছাড়িত না। মুনু তাহাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল ; কিছুদিন পরে সুযোগ জুটিল।

একবার তাহাদের গ্রামে বাঘের উপদ্রব হওয়ায় গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া গ্রামের জমীদারদের সাহায্য প্রার্থনা করে। বাঘটা অনেকগুলি গরু ও ছাগল-ভেড়া বধ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে গুলী করিয়া মারিবার সুযোগ না থাকায় তাহাকে ধরিবার জন্য একটি বাগানের

নিকট পুষ্করিণীর পাড়ে একটি খাঁচা পাতিয়া রাখা হইল ; খাঁচার ভিতর একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে নধর দেহ একটি ছাগ সংরক্ষিত হইল। সকলেরই আশা হইল, ছাগলের লোভে বাঘ খাঁচায় পরবেশ করিবে। কিন্তু ধূর্ত্ত বাঘ দুই দিনের মধ্যে খাঁচার নিকট ঘেঁসিল না। ছাগশিশুর আর্ত্তনাদে স্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরদিন মুনু চরণদাস বাবাজীর আস্তানায় উপস্থিত। চরণদাস উকীলবাবুর পুত্রকে আদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার অগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনু অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "এটা কি ভাল হচ্ছে, বাবাজী ?"

চরণদাস তাহার প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি ভাল হচ্ছে না ?"

মুনু বলিল, "তোমার মত পরম বৈষ্ণব গ্রামে থাক্‌তে—এই জীবহত্যে ? বাঘের খাঁচায় অবোলা কৃষ্ণের জীবটিকে পুরে রাখা হয়েছে। বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করলেই ও ওটাকে সেবা করবে।"

চরণদাস বাবাজী বলিল, "হাঁ, কথাটা সত্যি বটে, নিরুপায় কৃষ্ণের জীবকে বাঘের মুখে তুলে দেওয়া—মহাপাপ বটে, কিন্তু গাঁয়ের সব লোক একদিকে, আর আমি একা কি করতে পারি ?"

মুনু বলিল, "তুমি একা কেন ? আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমরা গোস্বামীর শিষ্য, গুরুগিরী আমাদের পৈতৃক ব্যবসা ; তাই আমরা অধিকারী। বাবা উকীল হয়ে মুখুযো হয়েছেন, তবু গ্রামের সকলেই বাবাকে দ্বারী অধিকারী বলে ; হাকিম-টাকিমগুলো মুখুযো বলে বটে। আমি কি এই জীবহত্যের কথা শুনে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি ? এই কৃষ্ণের জীবটির উদ্ধারে তোমার সাহায্য পাব বুঝেই তোমার কাছে এসেছি, দাদা !"

বাবাজী বলিল, "তা হ'লে কি করা যায় ?"

মুনু গলা খাটো করিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার আগে তোমাতে আমাতে খাঁচার কাছে যাব। তারপর কৃষ্ণের জীবটিকে খাঁচা হ'তে বের ক'রে—মেহেরপুরে নিয়ে গিয়ে বিক্রমপুর পাঠানো যাবে।"

বাবাজী বলিল, "বিক্রমপুর ? সে আবার কোথায় ?"

মুনু বলিল, "আরে, বাগ্‌দীপাড়ায় নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে ফেল্‌বো। গাঁয়ে ঢুকতেই বাগ্‌দীপাড়া, নুটু সর্দ্দারের অনেক ছাগল, ঝাঁকে মিশলে, কেউ ধরতে পারবে না। আড়াই টাকা দাম বে-ওজর পাওয়া যাবে। সেই টাকায় মালসাভোগ ! টাকাটা সৎকাজে লেগে যাবে।"

চরণদাস পরম ভক্তিভরে বলিল, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছে। কিন্তু ধরা পড়বার ভয় নেই ত ?"

মুনু বলিল, "কি যে বল ! সকালে গাঁয়ের লোক দেখ্‌বে, বাঘ খাঁচা ভেঙ্গে পাঁটাটাকে মুখে ক'রে নিয়ে স'রে পড়েছে।—পাঁটা কি খাসী, ঠিক জানিনে ; খাসী হ'লে দাম আরও কিছু বেশী হবে।—জীবহত্যে বন্ধ ক'রে টাকাটা যদি প্রভুর ভোগে লাগে—তাতে তোমার আপত্তি কি ?"

লোভী চরণদাস আপত্তির কোন কারণ দেখিল না। সেই দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মুনু চরণদাসের মাথায় একখানি নামাবলী বাঁধিয়া ও গলার মালায় হরিনামের ঝুলীটি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া পুকুরের ধারে চলিল।

চরণদাস বলিল, "নামাবলী, কুড়োজালি—এ সকল সঙ্গে নেওয়ার 'প্রিয়জন' ?"

মুনু বলিল, "বুঝলে না ? হঠাৎ পথে দেখ্‌লে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না ; ভাববে,

শ্রীরাধা গোবিন্দ-দর্শনে যাচ্ছ।"

নির্জ্জন বাগান, পুষ্করিণীতীরে জনমানবের সমাগম নাই। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, তাহার উপর বাঘের ভয়।

খাঁচার নিকট উপস্থিত হইয়া মুনু বাবাজীকে বলিল, "খাঁচায় ঢুকে পর,—আরে ওটা যে খাসী! দশ বারো সের ভারী, তিন টাকা দর আর দেখতে হবে না। খাসীটাকে দড়ি বেঁধে আমার হাতে দাও।"

চরণদাস কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি ত কখন বাঘের খাঁচায় ঢুকিনি, কোন্ দিক দিয়ে কৃষ্ণের জীবটাকে বের ক'রে দিতে হবে, তাও জানিনি, তুমিই ভিতরে যাও, আমি বাইরে থাকি।"

মুনু বলিল, "বোকামী ক'রো না। তুমি বাইরে থেকে খাসীটার গলার দড়ি ধ'রে নিয়ে যাবে, হঠাৎ যদি কারও নজরে পড় ?"

চরণদাস বলিল, "হাঁ, সে একটা কথা বটে ; কিন্তু কোন্ পথে খাঁচায় ঢুকে ছাগলটাকে বের করতে হবে, তাত জানি নে।"

মুনু বলিল, "জানাজানি আর কি ? ঐ ত কাঠের দরজা উপরে তোলা আছে, ঐ ফাঁকে ঢুকে পড়। দেখ্‌ছো না, ঐ কোণে খাসী ?"

চরণদাস মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া খাঁচায় প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে 'ধপাস্' শব্দে কাঠের দরজা পড়িয়া গেল। চরণদাস খাঁচায় বন্দী হইল।

খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া ভয়ে বাবাজীর শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সে খাঁচার দরজা তুলিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বাঘের খাঁচার দরজা এ ভাবে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে, তাহা টানিয়া তোলা তাহার অসাধ্য হইল।

মুনু তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া,—"খাঁচায় বাঘ পড়েছে, কে কোথায় আছ—এসে দেখ।" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহার ষড়যন্ত্রে গ্রামের পাঁচ সাত জন লোক বাগানে লুকইয়া ছিল, তাহারা খাঁচার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা সেই খাঁচা গরুর গাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের সকল লোককে 'মানুষ বাঘ' দেখাইবে বলিয়া বাবাজীকে ভয় প্রদর্শন করিল। অবশেষে বাবাজী যখন নাকে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, গ্রামের যে সকল দরিদ্র কৃষককে অসঙ্গত সুদের লোভে সে টাকা ধার দিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে সুদ আদায় করিবে না, তখন বাবাজীকে খাঁচা হইতে মুক্তিদান করা হইল।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মফঃস্বলের পল্লীতে এই সকল কাণ্ড ঘটিত, একালে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় না। এই জন্য ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। গল্পটা মুনুর কাছেই শুনিয়াছিলাম।

(৫)

সে কালের কত কথাই মনে পড়িতেছে, কিন্তু কোন্‌টা আগের ঘটনা—কোন্‌টা পরের ঘটনা, তাহা স্মরণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে লেখা কঠিন। আমাদের বাল্যকালে পল্লী অঞ্চলে কেরোসিন তৈলের আমদানী ছিল না, গৃহস্থ-গৃহে সর্ষপ-তৈলের প্রদীপ ব্যবহৃত হইত। আমাদের বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের জন্য এক একটি প্রদীপ ; প্রদীপগুলির রং কালো, তাহা শূন্যগর্ভ দোয়াকি। প্রত্যেক প্রদীপের গর্ভে প্রায় এক ছটাক জল ধরিত। প্রদীপগুলি মাটীর একটি খোরায় একখোরা জলে ভিজাইয়া, কোন ঘরের তক্তপোষের নীচে সেই খোরাটি

সরাইয়া রাখা হইত। মা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই খোরাটি বাহির করিয়া আনিতেন এবং ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রদীপগুলি জল হইতে তুলিয়া জল ঝরাইয়া শুক্‌নো ন্যাক্‌ড়া দিয়া মুছিতেন ; তাহার পর প্রত্যেক প্রদীপের ছিদ্রপথে জল ঢালিয়া তাহার শূন্য গর্ভ জলে পূর্ণ করিতেন, এবং ন্যাকড়ার এক একটি ছিপি দিয়া সেই ছিদ্রমুখ বন্ধ করিতেন। ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার টুকরা দিয়া উরু ও দুই করতলের সাহায্যে কতকগুলি শলিতা পাকাইয়া রাখা হইত। শলিতাগুলি তিনি ন্যাক্‌ড়া দ্বারা জড়াইয়া রাখিতেন। প্রদীপগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখিয়া মা শলিতাগুলি ঘরের কুলুঙ্গী বা তাক হইতে লইয়া আসিতেন, এবং প্রত্যেক প্রদীপের মুখে একটি ও পাশে তিন চারিটি শলিতা রাখিয়া, মাটীর ভাঁড় হইতে দুই পলা তেল তুলিয়া লইয়া তাহাতে প্রদীপের শলিতাগুলি ডুবাইয়া দিতেন।

সেকালে ম্যাচ-বাক্সের তেমন প্রচলন ছিল না ; কোন কোন দোকানে ব্রায়েন্টের দেশলাই পাওয়া যাইত। বাক্সগুলি একালের ম্যাচ-বাক্সের আকারের প্রায় দ্বিগুণ, এক একটা বাক্স তিন পয়সা দিয়া কিনিতে হইত। পল্লীবধূরা ব্যয়সাধ্য ম্যাচ-বাক্স কিনিতেন না, তাঁহারা গন্ধক আগুনে গলাইয়া পাকাটীর অনতিদীর্ঘ পাতলা খণ্ডগুলির এক প্রান্ত সেই গন্ধকে ডুবাইয়া শুকাইয়া লইতেন। সন্ধ্যাকালে এক হাতা কাঠের আগুনে সেই কাঠীর গন্ধক-লিপ্ত প্রান্তটি স্পর্শ করিলেই তাহা দেশলাইয়ের কাঠীর মত জ্বলিয়া উঠিত ; সেই জ্বলন্ত পাকাটী প্রদীপের মুখে সংরক্ষিত তৈলসিক্ত শলিতার অগ্রভাগে স্পর্শ করিলে শলিতাও জ্বলিয়া উঠিত। তখন সেই প্রদীপ বিভিন্ন ঘরে লইয়া যাওয়া হইত। প্রদীপগুলি একস্থানে জ্বালিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘরে লইয়া যাইবার প্রথা ছিল। সেই সময় যদি সান্ধ্যবায়ু একটু বেগে প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে গৃহস্থ-বধূরা দীপগুলি আঁচল দিয়া ঢাকিয়া লইয়া যাইতেন, এজন্য বায়ুপ্রবাহে তাহা নিবিত না। প্রত্যেক ঘরে এক একটি কাঠের দীপগাছা থাকিত, প্রদীপগুলি সেই দীপগাছার মাথায় স্থাপিত করা হইত। কিন্তু প্রতি গৃহে দীপ জ্বালিবার পূর্ব্বে এক একটি মাটীর ডেল্‌কো তেল-শলিতা দিয়া জ্বালিয়া, তাহা তুলসী-মঞ্চের নীচে রাখিয়া আসিতে হইত, বধূরা, গৃহিণীরা সেই সময় তুলসীতলায় প্রণাম করিতেন, প্রণামের সময় তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা কণ্ঠ পরিবেষ্টিত হইত। সন্ধ্যা-সমাগমে প্রত্যেক বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি হইত। দেবালয়-প্রাঙ্গণে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, গ্রাম্য বাজারের দোকানদাররা সমবেত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিত, "কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ ক'রে হরি হরি বলো।"—সেই হরিধ্বনি বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইত। প্রত্যেক গৃহস্থ-গৃহে ধুনুচিতে ধূপ জ্বলিয়া যে সৌরভ উঠিত, তাহা বায়ুতরঙ্গে দূরে ভাসিয়া যাইত। ছেলে-মেয়েরা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সুর করিয়া সমস্বরে বলিত, 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে!' 'কেন বোন পারুল ডাকো রে!'—প্রাচীনা গৃহকর্ত্রীরা দাওয়ার অন্য পাশে নাম-জপ করিতে বসিতেন। নির্ম্মল সন্ধ্যাকাশে একটি দুইটি করিয়া শুভ্রজ্যোতি অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিত। শৃগালের দল বেড়বাতাড়ের মধ্যে বা বাঁশঝাড়ের আড়ালে দলবদ্ধ হইয়া 'হুয়া-হুয়া' শব্দে সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত করিত, এবং সন্ধ্যা-সমাগমে গোপপল্লীর সাঁজালের ধূমে যেন ধূসর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইত।

সে কালে সন্ধ্যার পর পল্লীগ্রামের বাজারে অধিক ক্রেতার সমাগম হইত না। বড় বড় দোকানে দোকানের কর্ত্তারা দীর্ঘপায়া-সংযুক্ত চতুষ্কোণ কাচের লণ্ঠনে যে দীপ জ্বালিতেন, তাহার আকার কাচের গ্লাসের অনুরূপ। তাহার ভিতর খানিক জল ঢালিয়া যে তেল দিতেন, তাহা জলের উপর ভাসিত, তুলার পলিতা গ্লাসের মধ্যস্থলে জ্বলিয়া দোকানঘর আলোকিত করিত। লণ্ঠনটি ফরাসের উপর রক্ষিত হইত, দোকানের গোমস্তা তাহার অদূরে বসিয়া দৈনন্দিন হিসাব শেষ করিতেন। ছোট ছোট দোকানে মাটীর প্রদীপ জ্বলিত, দোকানদার

সেই আলোকে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিত, দুই এক জন শ্রোতা সারাদিনের পরিশ্রমের পর সেই দোকানে আসিয়া এক পাশে বসিত এবং রামায়ণ-মহাভারতের মধুর কাহিনী শ্রবণ করিত। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে পথে বাহির হইতে হইতে সকলেই এক একটি ছোট কাচের লণ্ঠন হাতে ঝুলাইয়া লইত। তখন হরিকেন ল্যাম্পের আমদানী হয় নাই। এখন পল্লীগ্রামের সাধারণ কৃষকের হাতেও হরিকেন লণ্ঠন দেখিতে পাই। মাটীর প্রদীপ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, গৃহস্থের গৃহে গৃহে এখন হরিকেন লণ্ঠন সুপ্রতিষ্ঠিত। পল্লীবধূরা শলিতা পাকাইবার ও মৃৎপ্রদীপ সজ্জিত করিবার ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। বাজারের যে সকল দোকানে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিত, সেই সকল দোকানে এখনও পূর্ব্ববৎ ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে, কিন্তু রাত্রিকালে অনেকেই এখন 'পেট্রোম্যাক্সে'র উজ্জ্বল আলোকে দোকান উদ্ভাসিত করিতেছে।

আজকাল পল্লীগ্রাম হইতে সিগারেট উঠিয়া গিয়াছে, সুলভ বিড়ি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে ; এজন্য সকলের 'করচেই' এক এক বাক্স দেশলাই। গাড়োয়ান গরুর গাড়ীতে আরোহী লইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছে, তাহাদের অনেকের নিকট বিড়ি দেশলাই দেখিতে পাই ; কিন্তু সেকালে গাড়োয়ানরা গেঁজের ভিতর তামাক, চকমকির পাথর, ইস্পাতের ঠুক্‌নি, শোলা ও টিকে রাখিত। ধূমপানের ইচ্ছা হইলে চকমকির পাথরে ঠুকনি ঠুকিয়া শোলা ধরাইত, এবং সেই শোলার আগুনে টিকে ধরাইয়া লইত।

আমার ঠাকুরদাদার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। এজন্য তাঁহার শয়ন-কক্ষে হুঁকা, কলকে, পোড়ানো মাটীর 'খঞ্জে' থাকিত। সেই খঞ্জের ভিতর কয়েকটি খোপ থাকিত। একটি খোপে কয়লা, একটি খোপে চকমকির পাথর, ঠুক্‌নি এবং শোলা থাকিত, মধ্যস্থলে একটি গোলাকার খোপ, তাহার ভিতর তামাক সংরক্ষিত হইত, এবং একটি খোপ খালি থাকিত ; ধূমপানের পর তাহার ভিতর ছাই, ভস্মীভূত তামাকের গুল ঢালিয়া রাখা হইত। একালে পল্লী অঞ্চলে টিকের প্রচলন অধিক হইয়াছে ; দূরবর্ত্তী পল্লী হইতে টিকেওয়ালীরা ঝাকা-বোঝাই টিকে লইয়া প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিক্রয় করিতে আসে, এজন্য সকলেই টিকে ব্যবহার করে ; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহস্থরা টিকে ব্যবহার বিলাসিতার নিদর্শন বলিয়াই মনে করিত, অধিকাংশ গৃহস্থ ধূমপানের জন্য কয়লা ব্যবহার করিত ; এজন্য টিকের আমদানী তেমন অধিক ছিল না। মাসান্তে বা দুই মাস অন্তর দূরবর্ত্তী নারায়ণপুর, ঢোড়াদহ প্রভৃতি গ্রাম হইতে টিকেওয়ালীরা টিকে বিক্রয় করিতে আসিত, তাহাই কেহ কেহ সখ করিয়া কিনিয়া রাখিত। সে সময় দুই তিন পয়সায় এক হাজার টিকে মিলিত। যাহারা টিকে বিক্রয় করিতে আসিত, তাহাদের সঙ্গে এক একটি ছোট বাটি থাকিত, তাহা আড়াইশো টিকের বাটি। কেহ এক হাজার টিকে কিনিতে চাহিলে টিকেওয়ালী চারি বাটি টিকে দিত ; গণিয়া দেখিলে দেখা যাইত, এক বাটিতে আড়াইশো টিকেই ধরিত, দুই দশখানি কম-বেশী হইত। কিন্তু কম হইলে যে ফাউ আদায় করা হইত, তাহাতেই পোষাইয়া যাইত। সেকালে দুই পয়সা, বর্ষাকালে তিন পয়সা দিয়া এক হাজার টিকে পাইলেও সকলে তাহা কিনিতে চাহিত না, কয়লার কাঠ পুড়াইয়া লইত, কারণ, তাহাতে খরচ নাই বলিলেও চলে ; অথচ টিকে অপেক্ষা তাহা সহজে ধরে। কিন্তু একালে দেখিয়াছি, সেই টিকে দুর্ম্মূল্যের বাজারে দশ বারো পয়সা হাজার বিক্রয় হইতেছে, অথচ ক্রেতার অভাব নাই ; কয়লা পুড়াইয়া লইবার কথা বলিলে প্রায় সকলেই বলে, কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করায় হাঙ্গামা কত ? কে অত ফ্যাসাদের মধ্যে যায় ?—এই প্রকার সুবিধাবাদের খাতিরে গৃহস্থরা চকমকি, ঠুক্‌নী ও শোলাকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেশলাইয়ের বাক্স দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতেছে, এবং বিড়ি

তামাকের স্থান অধিকার করিয়াছে। এক পয়সার তামাকে সে কালে ন্যূনপক্ষে আটবার ধূমপান করা চলিত, কিন্তু এক পয়সার বিড়ি এক ঘণ্টার মধ্যে ভস্মীভূত হয়। আমরা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছি, তাহার মূল এইখানে।

আমার ঠাকুরদাদা এবং পল্লীর অন্যান্য বৃদ্ধরা কাঠ পুড়াইয়া ধূমপানের জন্য কয়লা প্রস্তুত করিতেন। আমাদের বাড়ীর অদূরবর্ত্তী বেড়ের চারি ধারে অনেকগুলি মাদারের গাছ ছিল। ঠাকুরদাদার কয়লার অভাবে ঠাকুরদাদার জ্যেষ্ঠ সহোদরের দৌহিত্র হরিদাস সেই বেড় হইতে মাদারের গাছ কাটিয়া আনিত। সে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ও পাতলা করিয়া ফাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিত ; দুই তিন দিন অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিলে তাহা শুকাইয়া যাইত। তাহার পর ঠাকুরদাদা বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় এক হাত গভীর ও প্রায় তিন হাত পরিধির একটি গর্ত্ত খনন করিতেন। সেই গর্ত্তে শুষ্ক কাঠগুলি আলগাভাবে সাজাইয়া রাখিয়া খড়ের আগুনের সাহায্যে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেন। শুষ্ক মাদারের কাঠ সহজ-দাহ্য ; শীঘ্রই কাঠগুলি জ্বলিয়া উঠিত। সেই সকল কাঠ ভস্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বে যখন দেখা যাইত, সেগুলি পুড়িয়া কালো কয়লায় পরিণত হইয়াছে, তখন তাহার উপর কলাপাতা চাপাইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইত। কয়লার আগুন নিবাইবার জন্য জল ব্যবহার করা হইত না, কারণ, জল ঢালিলে সে কয়লা সহজে ধরে না। দুই তিনখানি কলাপাতা দিয়া তাহা ঢাকিয়া তাহার উপর মাটী চাপাইয়া দেওয়া হইত, কয়লাগুলি এইভাবে পূর্ণ এক দিন সেই গর্ত্তে বাখিয়া তুলিয়া লওয়া হইত। ঠাকুরদাদা সেগুলি একটি কলসীতে পূরিয়া গোশালার মাচার উপর রাখিয়া দিতেন ; দৈনিক ব্যবহারের জন্য কতকগুলি তাঁহার খঞ্জের ভিতর সংরক্ষিত হইত। এই কয়লা চকমকি-নিঃসৃত শোলার আগুনে যত সহজে ধবিত, টিকে তত সহজে ধরিত না ; টিকের পরিবর্ত্তে কয়লা ব্যবহারের ইহাও একটি কারণ, অথচ ইহাতে প্রায় কিছুই খরচ নাই।

প্রত্যহ প্রভাতে হুঁকার সংস্কারও পল্লীর গৃহস্থগণের নিত্যকর্ম্ম ছিল। ঠাকুরদাদা প্রভাতে হুঁকা শিক করিয়া তাহাতে জল বদলাইয়া রাখিতেন। তাঁহার হুঁকার পাশে আর দুইটি হুঁকা থাকিত, একটির গলায় কড়ি বাঁধা, তাহা ব্রাহ্মণের হুঁকা, অন্যটি বৈদ্যের হুঁকা।

ঠাকুরদাদা প্রত্যহ বহুবার ধূমপান করিলেও বাজার হইতে 'মাখা' তামাক কদাচিৎ কিনিতেন, ভাল অম্বুরী তামাক কখন কখন সখ করিয়া কিনিয়া আনিতেন। উহা আমাদের পাঠশালার পোড়ো মধুসূদনের পিতা রাজু দত্তর দোকান হইতে সংগ্রহ করিতেন। উহা গ্রামের মধ্যে প্রধান দোকান ছিল এবং সকলে ঐ দোকানকে শ্রীহরি দত্তের দোকান বলিত। রাজকৃষ্ণ দত্তের পিতাই শ্রীহরি দত্ত। এই দোকানখানি গ্রামস্থ বৃদ্ধগণের সন্ধ্যাযাপনের আড্ডা ছিল। ঠাকুরদাদা সায়ংকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া এই দোকানে বসিতেন এবং পল্লীর অন্যান্য বৃদ্ধগণের সহিত নানা কথার আলোচনা করিতেন। সে সময় 'সুলভ সমাচার' খানি পল্লী অঞ্চলে সমাদৃত হইতে দেখা যাইত।

ঠাকুরদাদার তামাক ফুরাইলে তিনি রাজু দত্তের দোকান হইতে দুই তিন সের শুষ্ক তামাকপাতা ও 'চিটেগুড়' কিনাইয়া আনিতেন, হরিদাস সেই তামাক রৌদ্রে শুকাইয়া কাটনী দ্বারা চুরাইয়া লইত, তাহার পর তাহা ঢেঁকিতে ফেলিয়া চিটেগুড় সংযোগে কুটিয়া লইত। গুড়ের সহিত তামাক মিশ্রিত হইলে ঢেঁকির নোট হইতে তাহা তুলিয়া লওয়া হইত, এবং তাহা একখানি চটের উপর ফেলিয়া নানাপ্রকার গুঁড়া মশলার সংযোগে হাত দিয়া ডলিয়া মাখিয়া লওয়া হইত। এই তামাক বাজারের অসংখ্য ভেজাল-মিশ্রিত ছয় আনা বা আট আনা সেরের তামাক অপেক্ষা অনেক অধিক উৎকৃষ্ট, অথচ হিসাব করিয়া দেখা যাইত, প্রতি

সেরের মূল্য ছয় সাত পয়সার অধিক পড়িত না। ঠাকুরদাদা এই দা-কাটা তামাক একটু মোলায়েম করিবার জন্য তাহার সঙ্গে খাম্বিরা মিশাইয়া লইতেন। বাবাও ধূমপানের নিপুণতায় 'বাপ্‌কো বেটা' এই উক্তির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার প্রস্তুত তামাক তিনি অধিকতর মোলায়েম করিবার জন্য তাহার সঙ্গে কখন পাকা কলা, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কাঁটালের রস মিশাইয়া তাহা একটি ছোট কলসীতে পূরিতেন, এবং সেই কলসীটি একটি বৃহৎ গর্ত্তের ভিতর রাখিয়া মাটী চাপাইয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিতেন। কলসীটা তিন চারি মাস সেই ভাবে মাটীর নীচে থাকিবার পর, তাহা গর্ত্ত হইতে তুলিয়া কলসীর মুখাবরণ অপসারিত করিতেন। দীর্ঘকাল তামাক মাটীর ভিতর থাকায় তাহা মজিয়া যাইত, তখন বাবা তাহাতে আতর, মৃগনাভি প্রভৃতি কত জিনিস মিশাইতেন, যাহা কোন দিন লক্ষ্য করি নাই ; কিন্তু তিনি যখন ধূমপান করিতেন, তখন তাহার সৌরভে ঘর আমোদিত হইত। তাঁহার কোন কোন বন্ধু সেই তামাক খাইয়া বলিতেন, "তোমার এ তামাকের কাছে দুই টাকা সেরের অম্বুরী তামাক কল্‌কে পায় না।"—কিন্তু একালের তাম্রকূট-বিলাসীরা হয়ত বলিবেন—"ধূমপানের সখ মিটাইবার জন্য কে অত পরিশ্রম করে ?"

মেহেরপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়টি বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। বিগত সিপাহী-যুদ্ধের সময় উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমাদের বাল্যকালে উহা মাটীর ঘর ছিল, এখন তাহা সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের বাল্যকালে এক জন নেটিভ ডাক্তার (সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন) এই ডিসপেন্‌সারীর ভার পাইতেন, পরে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদ উঠিয়া গিয়াছে এবং ক্যাম্বেলের পরীক্ষোত্তীর্ণ সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এই ডিস্‌পেন্সারী ও হাসপাতাল পরিচালিত করিতেছেন। সেকালে এই ডিস্‌পেন্সারীতে বহুসংখ্যক নেটিভ ডাক্তার কাজ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক জনের নাম জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার নাম ছিল ডাক্তার মুকুন্দচন্দ্র সেন! তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, স্মরণ নাই ; কিন্তু তাঁহার চেহারা এখনও মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, সহৃদয় চিকিৎসক জীবনে প্রায় এক জনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি নববিধান সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং মনে হয়, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি গ্রামের সকল শ্রেণীর লোককেই আপনার জন মনে করিতেন, বিপন্ন দরিদ্রের বাড়ীতে কাহারও রোগ হইলে সংবাদ পাইলেই সেখানে গিয়া তাহার চিকিৎসা করিতেন, প্রয়োজন হইলে প্রত্যহ একাধিকবার যাইতেন, ভিজিট ত লইতেনই না, অধিকন্তু ঔষধ-পথ্য দিয়া সাহায্য করিতেন। অন্যান্য সরকারী ডাক্তার 'ম্যালেরিয়ার ডিপো' মেহেরপুরে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু মুকুন্দবাবু যে কয়টি টাকা বেতন পাইতেন, তাহার অতিরিক্ত এক পয়সাও তাঁহার আয় না থাকায় বাসা-খরচের জন্য তাঁহাকে বাড়ী হইতে টাকা আনাইতে হইত। মনে হইত, তিনি মানুষের রোগ-যন্ত্রণা নিবারণের জন্যই চিকিৎসাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অর্থোপার্জ্জন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যায়ামে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল ; লাঠীখেলায় তাঁহার মত ওস্তাদ আমাদের ও অঞ্চলে আর একজনও ছিল না। একখানি লাঠীর সাহায্যে তিনি অনেক সুদক্ষ লেঠেলের গতিরোধ করিতে পারিতেন।

সেই সময় রথ উপলক্ষে মুখুয্যে বাবুদের বাহিরের আঙ্গিনায় কুস্তির আখড়া হইত। মেহেরপুর অঞ্চলের সকল কুস্তিগীর সেই আখড়ায় রথের দিন 'মালামো' করিতে আসিত। একবার রথের দিন অপরাহ্নে সেই আখড়ায় মালামো হইতেছিল, আখড়ার চতুর্দ্দিকে ঘেরের বাহিরে পাঁচ সাত হাজার লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই আখড়ার দক্ষিণস্থিত স্বর্গীয়

নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোতলার বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া আমরা ছেলের দল স্পন্দিত-বক্ষে কুস্তি দেখিতেছিলাম। দীর্ঘকাল কুস্তি চলিল, অনেকেরই জয়-পরাজয় হইল। অবশেষে মেহেরপুরের অদূরবর্ত্তী কোন গ্রামের এক জন 'মাল' আখড়ায় প্রবেশ করিল, তাহার নাম তুষ্টু সেখ। তুষ্টু প্রকাণ্ড জোয়ান, এক হাত তাহার বুকের ছাতি। উভয় বাহুর পেশীগুলি লোহার মত শক্ত। সে আখড়ায় প্রবেশ করিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইল, এবং যদি কেহ তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করে, তাহা হইলে সে স্পর্দ্ধাভরে তাহাকে আহ্বান করিল, এবং দুই একবার মুঠা ভরিয়া ধূলা তুলিয়া লইয়া তাহা উভয় বাহুমূলে মর্দ্দন করিল। চতুর্দ্দিকে একটা অস্ফুট কোলাহল উত্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল, ঐ ধুলোপড়ার জোরেই ও সকলকে কাত করে। কেহ বলিল, মালামোর সময় উহার ঘাড়ে আর দুটো মাথা গজায়, কার সাধ্যি তুষ্টু মালের সঙ্গে লড়ে? এই রকম মন্তব্য চলিতেছিল, সেই সময় ভিন্ন গ্রামবাসী তুষ্টুর এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের কোন কোন মুসলমানের সহিত তুষ্টুর ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল। যে যুবক তুষ্টুর সহিত লড়িতে আসিল, সে তুষ্টুর দেহের তুলনায় একটা ফড়িং; কিন্তু প্রতিবেশীদের উত্তেজনায় এই ফড়িং সেই হাতীর সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তুষ্টু চক্ষুর নিমেষে তাহাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া এক আছাড় মারিল। যুবক এইভাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অল্প আহত হইয়াছিল। সে পড়িয়া রহিল। তুষ্টু অদূরে দাঁড়াইয়া মসলা চিবাইতে চিবাইতে বীরদর্পে তাল ঠুকিতে লাগিল।

"তুষ্টু মিঞা আমাদের কিয়াতুল্লাকে মেরে ফেল্লে!" বলিয়া তুষ্টুর প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের লোক দলবদ্ধভাবে আখড়ায় প্রবেশ কবিয়া তুষ্টুর উপর লাঠী চালাইতে লাগিল। তখন তুষ্টুর গ্রামের লোক তুষ্টুর বিপদে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া লাঠী লইয়া সেই দলকে আক্রমণ করিল। অতঃপর উভয় দলে প্রবল যুদ্ধ চলিল; অনেকের মাথা ফাটিল। শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে বুঝিয়া ডাক্তার মুকুন্দবাবু লাঠী হস্তে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি উভয় দলকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ক্ষিপ্তপ্রায় মুসলমানদের কেহই তাহার অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। তুষ্টুর দলের লোক-সংখ্যা অল্প; এ জন্য অপর দলের আক্রমণে তুষ্টুর জীবন-সংশয়ের উপক্রম দেখিয়া মুকুন্দবাবু পঁচিশ ত্রিশখানি উদ্যত লাঠীর আঘাত নিজের লাঠীর সাহায্যে প্রতিহত করিয়া লাঠী-বৃষ্টির ভিতর দিয়া তুষ্টুকে আখড়ার বাহিরে আনিলেন। ডাক্তারবাবুর সাহস ও লাঠী চালাইবার কেরামতি দেখিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে ধন্যবাদ বর্ষিত হইল। ডাক্তারবাবু অক্ষতদেহে বাহির হইতে পারেন নাই; একখানি লাঠীর অগ্রভাগ তাঁহার নাসিকা স্পর্শ করায় নাক ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কাতর দেখিল না, তাঁহার স্বাভাবিক প্রসন্নতার বিন্দুমাত্র অভাব হয় নাই। সকলেই বুঝিতে পারিল—তিনি ওভাবে তুষ্টুকে উদ্ধার না করিলে সেদিন তুষ্টুর মাথা বাঁচিত না। মুকুন্দবাবু রুমালে নাক মুছিয়া সহজ সুরে বলিলেন, "দাঙ্গা থামাতে গেলে ওরকম হয়েই থাকে।"—গ্রামে রাষ্ট্র হইল, ডাক্তারবাবুর মাথা ফাটিয়াছে, মুসলমানরা তাঁহাকে খুন করিয়াছে।—হাজার হাজার লোক মুকুন্দবাবুকে দেখিতে আসিল, তিনি একটা কাঠের গুঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভয় নেই, এই দেখ আমি বেঁচে আছি।"

কিন্তু মেহেরপুরবাসীরা মুকুন্দবাবুকে দীর্ঘকাল প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সে অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের কাহিনী।

স্বর্গীয় রামগোপাল সান্যাল মহাশয়ের একখানি ইংরাজী কেতাবে পড়িয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন, নদীয়া, মেহেরপুর অনভিজ্ঞ ছোকরা সিভিলিয়ানদের শিক্ষা-নবিশীর স্থান।

কথাটা সত্য ; বিলাত হইতে ইংরাজ সিভিলিয়ানগুলি এ দেশে আসিয়া দিনকতক এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে শিক্ষা-নবিশী করিয়াই জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে মেহেরপুর মহকুমার ভার পাইতেন। তাঁহাদের সকলেই যে উষ্ণমস্তিষ্ক, চঞ্চলপ্রকৃতি ও তরলমতি, খামখেয়াল হাকিম, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, মিঃ জে, ডি এণ্ডারসন, এফ্, এ, ষ্ল্যাক, পি, জি, মেলিটস্ প্রভৃতি সিভিলিয়ানরা মেহেরপুরে প্রশংসার সহিত হাকিমী করিয়াছিলেন। অনেকেই হয়ত জানেন না—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেহেরপুরে হাকিমী করিতে করিতে তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণের' রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সে বোধ হয় ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কথা। মেহেরপুর অঞ্চলে সেকালে বিস্তর নীলকর সাহেব বাস করিতেন, মেহেরপুরের ফৌজদারী আদালতে তাঁহাদের মামলা-মকর্দ্দমার বিরাম ছিল না। অধিকাংশ মামলাই নীলসংক্রান্ত, সুতরাং নীলকর সাহেবদের স্বার্থ সেই সকল মামলার সহিত বিজড়িত ছিল। এই জন্যই মনে হয়, নীলকর সাহেবদের অনুরোধে বা আবদারে মেহেরপুরে সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। সে কালে বাঙ্গালাদেশে দেশী সিভিলিয়ানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল, এজন্য অধিকাংশ সময় ইংরাজ সিভিলিয়ানরাই মেহেরপুরে হাকিমী করিতেন। তাঁহারা মেহেরপুরে চাকরী করিতে আসিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা কষ্টকর মনে করিতেন, সুতরাং নীলকর সাহেবদের সহিত তাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের পরস্পরের এই প্রকার আনুগত্যের ফলে বিচার-বিভ্রাট হইত না, একথা বলা যায় না। মুকুন্দবাবু যখন মেহেরপুরের সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, সেই সময় মহকুমার কোন পল্লীর একজন প্রজা নিহত হইলে কোন নীলকর সাহেবকে আসামী-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। মুকুন্দবাবু শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা আসামীর প্রতিকূল। মুকুন্দবাবু রিপোর্ট পাঠাইবার পূর্ব্বে, রিপোর্টটা পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করা হইয়াছিল, প্রলোভনও যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মুকুন্দবাবু ভয়ে বা প্রলোভনে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। সেই মামলার বিচারে 'মাকড়' মরিয়া 'ধোকড়' হইয়াছিল কি না, আমার স্মরণ নাই ; সে প্রায় ৫২ বৎসরের কথা ; কিন্তু এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মুকুন্দবাবুকে বিহারের এক প্রান্তে বদলী হইতে হইল। তাঁহার বদলীর সংবাদে গ্রামের সকল লোক দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, যেন তাহারা পরমাত্মীয়কে চিরবিদায় দান করিল। মুকুন্দবাবুর পর মেহেরপুরের সরকারী ডাক্তারখানায় অনেক ডাক্তার আসিয়াছিলেন, কিন্তু জন-সাধারণের হৃদয়ে কেহই মুকুন্দবাবুর স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। যাহারা তাঁহাকে লাঠী মারিয়াছিল, তাহারাও তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছিল।

(৬)

প্রায় আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতৃদেবের বিবাহের অব্যবহিত পরে আমার পিতামহী ঠাকুরদাদার চরণধূলি মাথায় লইয়া, পাকা চুলে সিঁদুর পরিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুরদাদা অশ্রুত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ত চললে, একা আমি এ সংসার কি ক'রে বজায় রাখ্‌বো ?" সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে ঠাকুরদাদার বিধবা ভগিনী এবং আমার মা—বালিকা মাত্র। সংসার অচল দেখিয়া ঠাকুরদাদা গ্রামেই আমার বড় কাকার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যে পত্নীবিয়োগে ঠাকুরদাদা সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। মাসের মধ্যে দশ বারো দিন অনাহারে থাকিতেন ; অন্ধকারাচ্ছন্ন শয়নকক্ষে শয্যায় পড়িয়া অশ্রুত্যাগ করিতেন। শুনিয়াছি, আমার জন্মের পর আমাকে কোলে পাইয়া

তিনি পুনর্ব্বার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; তাঁহার সংসারাসক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আমার পিতামহী মৃত্যুর পূর্ব্বে অল্পদিনের মধ্যে দুই পুত্র হারাইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অশান্তি ও শোকের অনলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সোনার সংসার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু ঠাকুরদাদা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুই পুত্রের মৃত্যুশোক ভুলিতে পারেন নাই।

শুনিয়াছি, ইতিহাসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ; মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ইহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। আমি আমার স্ত্রীকে বলিতাম, প্রায় সত্তর বৎসরের মধ্যে আমাদের পরিবারে কোন রমণী সধবা অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই। আমার মা ও তিন কাকী, সকলকেই বৈধব্য-যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে ; এই নিয়মে আমাকেও আগে যাইতে হইবে। তিনি হাসিয়া বলিতেন, "আমাকে দিয়া এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুরদাদার সংসারের যে অবস্থা হইয়াছিল, তোমার সংসারের সেই অবস্থা হইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে রোগে কে তোমার সেবা করিবে, ইহা ভাবিয়া আমি শান্তিতে মরিতে পারিব না।"—অল্পদিন পরেই সাধ্বীর এ কথা ফলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরমার মত তাঁহাকেও অল্পদিনের মধ্যে দুই পুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করিতে হইয়াছিল। ঠাকুরদাদার সংসারের মত আমার সংসারে এক বিধবা ভগিনী, দুইটি বালিকা বধূ এবং একটি শিশু পৌত্র। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ! এই সামঞ্জস্যটা দেখাইবার জন্যই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে এই তুচ্ছ কথার অবতারণা করিলাম। ঠাকুরদাদা দীর্ঘজীবী ছিলেন, ঠাকুরমার মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ভাঙ্গা সংসার আবার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু পত্নীবিয়োগের পর শোকের উপর শোকের কঠিন আঘাতে আমার মন অবসন্ন, বার্দ্ধক্যভারপ্রপীড়িত দেহ জীর্ণ। জীবন-সন্ধ্যায় ভবনদীর কূলে বসিয়া অকূলের কাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিতেছি, "পার-পণ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই, প্রভু ! অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, দৃষ্টি অবরুদ্ধ ; জীবন-ধারণের কোন প্রলোভন বর্ত্তমান নাই, ভাঙ্গা সংসার আবার গড়িয়া তুলিব, সে শক্তিও নাই। আমার সকল সন্তাপ হরণ করিয়া এই রিক্তহস্ত নিরবলম্বন পথিককে পরপারে লইয়া যাও। যাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, তাহারা একে একে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, এ ব্যর্থ জীবনে কোন আশা, কোন কামনা নাই। এখনও বিপদের মেঘ চারিদিক হইতে মাথার উপর পুঞ্জীভূত হইয়া আসিতেছে, ঝঞ্ঝার অশ্রান্ত গর্জ্জনের সহিত সুগম্ভীর বজ্রনিনাদ শুনিতে পাইতেছি ; আমাকে তোমার অভয়চরণে স্থানদান কর।" কোন্ বিয়োগান্ত নাটকের অন্তিম দৃশ্য আমার জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মভেদী, অধিকতর শোচনীয় ? এই অন্তিম মুহূর্ত্তে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান নতশিরে গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কোন সম্বল নাই ; কিন্তু এখনও ত তাঁহাকে ডাকার মত করিয়া ডাকিতে পারিলাম না। মনে হয়, কোন তীর্থে গিয়া তীর্থস্বামীর চরণচিন্তা করিয়া এই দুঃখময় জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব। কিন্তু পিতৃহীন শিশু পৌত্রের মুখ মনে পড়িলে তাহার মায়ার বন্ধন কাটাইতে পারি না। তথাপি আর বিলম্ব নাই, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ-মুক্ত আত্মার সহিত আবার কি মিলন হইবে ? কেহই ত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সম্মুখে অনন্ত অন্ধকার।

সেকালের প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অনেক শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলিয়া ফেলিলাম। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের কাহিনী হইলেও ইহা ব্যর্থতাপূর্ণ মানব-হৃদয়ের ইতিহাস। লেখকরা গল্পে, উপন্যাসে এই চিত্রই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কত লোকের কত ব্যর্থ-কাহিনী

অলিখিত রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু কল্পিত গল্প অপেক্ষা তাহা হৃদয়স্পর্শী নহে, এ কথা কে বলিবে ?

কিন্তু সে কালের কথা বলিতে গিয়া খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি ; কোথায় তাহা আরম্ভ করিব ? মনে পড়িতেছে, বাল্যকালের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র একখান হাস্যপূর্ণ নাটিকা পাঠ করিয়াছিলাম ; সেই নাটকিখানিরই নাম "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"—কি না, ঠিক স্মরণ নাই ; উহা পাঠ করিয়া মনে হইয়াছিল, ঘটনাটা আগাগোড়া অতিরঞ্জিত ; কিন্তু কিছু দিন পরে আমাদের বাড়ীতেই ঠিক ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক যে, সেই সময়ের সমাজের একটি চিত্র হিসাবে তাহার বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের সংসারে ঠাকুরদাদার জ্যেষ্ঠ সহোদরের দুইটি দৌহিত্র প্রতিপালিত হইত। হরি ও গোষ্ঠ দুই ভাই। হরি বড়, বর্ণজ্ঞানহীন, দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল ; কিন্তু অত্যন্ত সরল ও তাহা অপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ। তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে একালের পাঠক-পাঠিকাগণের তাহা উপভোগ্য হইতে পারে। আমাদের বাড়ীতে যখন খড়ের ঘর ছিল, অর্থাৎ ৫০/৫২ বৎসর পূর্ব্বে, পৌষ-মাঘ মাসে ঠাকুরদাদা প্রতি বৎসর প্রত্যেক ঘরের জানালাগুলি 'মাটীঝাঁপা' দিয়া বন্ধ করিতেন। ঝাঁপে মাটী লেপিয়া তাহা দ্বার-জানালার বাহিরে বসাইয়া দেওয়া হইত ; তাহার পর গৃহপ্রাচীরের সহিত এভাবে সংযোজিত হইত যে, মাটী-ঝাঁপা দেওয়ালেরই অংশ বলিয়া মনে হইত। গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হইলে দ্বার-জানালায় আগুন লাগিবার আশঙ্কা থাকিত না। পল্লীগ্রামে শীতকালেই সাধারণতঃ অগ্নিভয় প্রবল হয়। ইহার একাধিক কারণ আছে। একে ত শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালে বৃষ্টির অভাবে প্রখর রৌদ্রে খড়ের ঘরের চাল বারুদের মত সহজদাহ্য হইয়া থাকে, তাহার উপর শীতের প্রারম্ভে গোপ-পল্লীতে বা চাষী কৃষকদের বাসপল্লীতে 'সাঁজাল' দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠে ; একটু অসতর্ক হইলে সাঁজালের আগুন গোশালার বেড়ায় বা ঘরের টাটিতে ধরিয়া যায়, তাহার পর সেই আগুন সমগ্র পল্লীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং খড়ের ঘরগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে সকল গৃহস্থ মাটী-কোঠায় বাস করিতেন—তাঁহারা ঘরের দ্বার-জানালা মাটীঝাঁপা দ্বারা আবৃত করিলে আগুনে খড়ের চাল পুড়িয়া যাইত বটে, কিন্তু মাটীকোঠার ভিতর অগ্নি প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারিত না। এই জন্য অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুরদাদা হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস, মাটীঝাঁপাগুলা জানালায় বসিয়ে মাটী দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে লেপিয়া দে।"—হরিদাস ঠাকুরদাদার আদেশ শুনিয়া কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল ; তাহার পর বিরক্তিভরে বলিল, "বছর-বছরই ত ঐ রকম বাজে খাটুনী খাটিয়ে মারছ, একবারও ত মাটীঝাঁপা লাগানো সাথ্বক হ'লো না। যদি ঘরে দু'একবার আগুন লাগ্‌তো ত খাটা-খুটি করতে ইচ্ছে হ'তো। শুধু শুধু ভূতের ব্যাগার খাটা, ও আর পারিনে আজাই।" (ঠাকুরদাদাকে সে 'আজা' অর্থাৎ 'আজাই' বলিত)।

আর একদিন বাগানে কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া হরিদাসের পায়ে ফণাসেজের কাঁটা ফুটিয়াছিল। কাঁটার অগ্রভাগ পায়ের তলায় বিঁধিয়া মাংসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। হরিদাস বাড়ী আসিয়া দেখিল, মধু নাপিত কামাইতে আসিয়াছে। হরিদাস তাহার সম্মুখে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিল, বলিল, "মধুদা, পায়ের তলায় ফণাসেজের কাঁটা সেঁদিয়েছে, নরুণ দিয়ে কেটে বের ক'রে দাও ত।"

মধু বলিল, "কোথায় কাঁটা ফুটেছে, দেখিয়ে দে।"—হরিদাস ডান পায়ের তলার এক স্থান দেখাইয়া দিল। মধু সেই স্থানে নরুণ চালাইয়া কাঁটার সন্ধান পাইল না। হরিদাস বলিল, "উঁহু, আর একটু নীচে।"—নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবার নরুণ চলিল ; কিন্তু সেখানেও

কাঁটা নাই ! এইভাবে মধু তাহার ডান পায়ের তলা আগাগোড়া খুঁড়িয়া কাঁটা বাহির করিতে পারিল না। শেষে সে নরুণ ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "কৈ হরি, পায়ের তলায় কাঁটা কোথায় ?" হরিদাস বলিল, "পায়ের তলায় কাঁটার মাথা ফুটে আছে, চলতে গেলে খচ-খচ ক'রে বিধছে, আর তুমি বল্লে কাঁটা নেই ! দাঁড়াও, পরখ ক'রে দেখি।" হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই এক পা চলিল, তাহার পর মধুকে বলিল, "মধু দা, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে ! ডান পায়ে নয়, কাঁটাটা বাঁ পায়ে ফুটেছে ! পা ভুল ক'রে ফেলেছি।" মধু তাহার বাঁ পায়ের তলা হইতে কাঁটা বাহির করিয়া দিল বটে, কিন্তু নরুণের খোঁচায় পায়ের তলা ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় হরিদাস তিন দিন খোঁড়া হইয়া পড়িয়া রহিল এবং সকলকে বলিতে লাগিল, "মধুদা বুড়ো হয়েছে, চোখে দেখতে পায় না, আমার পা ভুল ক'রে এই কষ্টটা দিলে।"

এইরূপ বুদ্ধিমান্ হরিদাসকে লইয়া একটু মজা করিবার জন্য সকলেরই লোভ হইত। বাজারের অনেক দোকানদারের সঙ্গেই হরিদাসের ভাব ছিল। এক দিন হরি দত্ত তাহাকে বলিল, "মিতে, কত বড় লোকের ছেলে তুমি ! তোমার বাবা মাণিক সা'কে এ তল্লাটের কে না চিন্‌তো ? আমি ত জানি তাঁর তিনটে গোলাবাড়ী ছিল, পাঁচখানা লাঙ্গল, তিন খাদা আবাদ ; আর মহাজনী কারবারে তাঁর হাজার হাজার টাকা খাট্‌তো। তোমারা দুই ভাই যখন নাবালক, সেই সময় তিনি মারা যান, পাঁচ ভূতে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি লুটে-পুটে খেলে। আর তাঁর ছেলে হয়ে তোমার বিয়ে হবে না ? বাপ-দাদার জলগণ্ডুষের পিত্যেশা থাক্‌বে না, এ বড় অন্যায়। তুমি একটা বিয়ে ক'রে ফ্যালো।" কথাটা হরিদাসের মনে লাগিল, কিন্তু কে উদ্যোগী হইয়া তাহার বিবাহ দিবে ?—হরিদাস মাথা নাড়িয়া বিষণ্ণভাবে বলিল, "তুমিও যেমন ! আমার আবার বিয়ে হবে ! না, আজাইকে ও কথা বল্‌তে আমার সাহস হয় না। আজাই যেন আমাদের দু' ভাইকেই প্রতিপালন করছে, আমার পরিবার, ছেলে-মেয়ে, তাদের ভার কে নেবে ?"

হরি দত্ত বলিল, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তুমি অত বড় যোয়ান, হাত-পা ছরত আছে, বিয়ে ক'রে বৌকে খেতে পরতে দিতে পারবে না ? সংসারে বিয়ে না করেছে কে ? মাণিক সার পুত্তুরের আবার বিয়ের ভাবনা ? তা, তুমি আজাইকে ও কথা বলো না। মেয়ের খোঁজ কর, আমরা বিয়ে দিয়ে দেব।" —সেই সময় উমেশ পাল চিঠি বিলি করিতে হরি দত্তর দোকানে আসিয়াছিল। হরি দত্ত তাহাকে বলিল, "মিতে ত তোমাদেরই কুটুম্ব—নিজের লোক, মিতের জন্যে একটা পাত্রী খুঁজে দেও না, পাল মশায় ! চিরদিন কি বেচারা আইবুড়ো থাক্‌বে ?"

উমেশ পাল বলিল, "হরিদাস সত্যিই বিয়ে করবে না কি ? তা এত দিন আমাকে বল্লেই পারতো, মেয়ের আবার ভাবনা ?—হরিদাস, তোমার কোন চিন্তে নেই, আমি তোমার জন্যে কনে ঠিক করছি, তবে আমার গিন্নীর কাছে গিয়ে তোমাকে একটু উমেদারী করতে হবে। ও কাজে মেয়েরাই কত্তা।"

হরিদাস বুঝিল, উমেশ পাল ও তাহার স্ত্রী চেষ্টা করিলেই তাহার বিবাহ হইবে ; তবে কথাটা 'আজাই'য়ের নিকট প্রকাশ করা হইবে না। তিনি জানিতে পারিলে হয় ত শুভকার্য্যে বাধা দিবেন।

উমেশ পাল সে-কালের পল্লীবাসী গৃহস্থ ; তাহার ন্যায় সদানন্দ, রহস্যপ্রিয় রসিক পুরুষ একালের পল্লীগ্রামে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় উমেশ পালের বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। সে মেহেরপুর-ডাকঘরে পিয়নের কাজ করিত। তখন মেহেরপুর ডাকঘরে উমেশ পাল ভিন্ন অন্য কোন পিয়ন ছিল

না ; এখন সেই স্থানে তিন চারি জন পিয়ন। এখন হেডপিয়নের বেতন বোধ হয় পঞ্চাশ টাকারও অধিক, আশী টাকার গ্রেডে সে চাকরী করে : কিন্তু উমেশ পালের বেতন ছিল—মাসিক আট টাকা। পোষ্টমাষ্টার দত্ত মহাশয় তাঁহার পশ্চিমদ্বারী খড়ো ঘরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া পোষ্টমাষ্টারী করিতেন। তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইতেন ! চুয়াডাঙ্গায় তখন হেড্ আফিস ছিল, রেলে যে ডাক আসিত, তাহা চুয়াডাঙ্গার পথে আসিত, এক জন হরকরা তাহা লইয়া আসিত ; কৃষ্ণনগর হেড আফিস হইতে যে ডাক আসিত, তাহা আর একজন হরকরা মেহেরপুর ডাকঘরে পৌঁছাইয়া দিত। হরকরার মাসিক চারি পাঁচ টাকা বেতন পাইত। দুই দিক হইতে দুইটিমাত্র ডাকের ব্যাগ আসিত এখন সেই স্থানে "মোটর ব'স" বোঝাই হইয়া ডাকের ব্যাগ আসে, হরকরাদের বেতন মাসিক ১৬/১৭ টাকা, পোষ্টমাষ্টারের গ্রেড এক শত চল্লিশ টাকা, তাঁহার অধীন চারি জন কেরাণী, তাঁহারাও ঐ গ্রেডের কর্ম্মচারী ! এই অতি ব্যয়ভার বহন করিতে গিয়া সরকার বাহাদুর "হালে পানি" পাইতেছেন কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন ; কিন্তু এক পয়সার পোষ্ট কার্ড তিন পয়সায় ও দুই পয়সার টিকিট পাঁচ পয়সায় বিক্রয় করিতে হইতেছে। ইহার ফলে ডাকে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম ; চারি আনার কেতাব ভি পি-তে পাঠাইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নিকট এক আনা ডাকমাশুল, তিন আনা রেজিষ্ট্রী খরচ, এবং দুই আনার মনিঅর্ডারের কমিশন মোট পাঁচ আনা আদায় করা হইতেছে মফঃস্বলের ডাকঘরের কেরাণীরা মধ্যাহ্নকালে "সর্টিং টেবিলে" শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, লোকে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছে ; হাতে কাজ না থাকিলেই ঘুম পায়। কর্ত্তৃপক্ষ উভয়সঙ্কটে পড়িয়া একটা "লোয়ার গ্রেডে"র সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাতেই কি তাল সামলাইতে পারিবেন ? কেহ দায়ে না পড়িলে তিন পয়সা খরচ করিা পোষ্টকার্ড লিখিতে প্রস্তুত নহে। সেকালে পোষ্টকার্ডের প্রচলন না হইলেও দুই পয়সার লেফাপার চিঠি অনেক হইত, এবং ত্রিশ টাকার পোষ্টমাষ্টার ও আট টাকার পিয়ন উমেশ পালকে দিয়া ডাকের কাজ নির্ব্বিঘ্নে চলিত। উমেশ পাল ডাকঘরের কাজ শেষ করিয়া আমোদপ্রমোদের জন্য প্রচুর অবসর পাইত।

হরিদাস উমেশ পালের ইঙ্গিতে তাহার গৃহিণীর শরণাপন্ন হইল। পাল গৃহিণীও সুরসিকা ছিল। সংসারে স্বামী ও স্ত্রী, তাঁহাদের পুত্র-কন্যা ছিল না, কখন শোক-দুঃখের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই ; উমেশ পাল যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই তাহাদেব দুই জনের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। মনে যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি ছিল ; সুতরাং উভয়েই হরিদাসের বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন দেখিলাম, হরিদাসের হাতে হরিদ্রারঞ্জিত সূতা বাঁধা ! জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি হরিদাস ? তোমার হাতে সুতো ?"

হরিদাস আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "আমার বিয়ে কি না ; পাল মশাই কনে ঠিক করেছে। আজাই-এর কাছে ও কথা বলিস্ নে ভাই ! শুনতে পেলে লাঠির চোটে আমার বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। চুপে চাপে বিয়েটা হয়ে যাক্।"

আমার বয়স তখন বারো বৎসর। বুঝিলাম, কেহ পাগলকে নাচাইয়াছে ; এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য উৎসাহ হইল। মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "কোথায় সম্বন্ধ ঠিক হ'লো, মেয়ে কার ?"

হরিদাস বলিল, "জলঙ্গী, নন্দীদের মেয়ে। আমার শ্বশুর নেই, বড় শালা আছে ; তিনিই বিয়ে দেবেন।"

আমি বলিলাম, "বিয়ে করতে জলঙ্গী যাবে ত ? আমাকে বরযাত্রী নিয়ে যাবে না ?"

হরিদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, "বরযাত্রী কি ? তুমি আমার বড় মামার ছেলে, 'কোল বর' হয়ে তুমিই যাবে। গোষ্ঠ আমার ছোট ভাই হ'লে কি হয় ? তাকে এ খবর দেওয়া হবে না, সে শুনলেই আজাইকে সব কথা ব'লে দেবে।"

আমি বলিলাম, "কবে বিয়ে করতে যাচ্ছ ?"

হরিদাস বলিল, "জলঙ্গী যেতে হবে না ভাই, কনে এখেনে এসেছে—তার ভাইয়ের সঙ্গে তার দিদির শ্বশুরবাড়ী। মেজমামার শালার সঙ্গে তার দিদির বিয়ে হয়েছে কিনা। উমেশ পাল মশায় সেই মেয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতেই চুপে-চাপে বিয়েটা দিয়ে দেবে।"

প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিলাম ; যেটুকু জানিতে বাকী ছিল, তাহা উমেশ পালের স্ত্রীর নিকট জানিয়া লইলাম। ঠাকুরদাদাকে এই ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইলে উমেশ পালের স্ত্রী কোন কথা প্রকাশ করিতে আমাকে নিষেধ করিল, এবং আমি বিশ্বাসঘাতকতা না করি, এই উদ্দেশ্যে আমাকে তাহাদের দলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। আমি প্রফুল্লচিত্তে তাহাদের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলাম। হরিদাস আমার মনোরঞ্জনের জন্য বড় বড় পাকা নোনা, আতা, পাকা বেল, কাঁচামিঠে আম প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপহার দান করিল।

উমেশ পালের স্ত্রীর নিকট 'কনে'র পরিচয় পাইলাম—মেহেরপুরেই আমার বড়কাকার বিবাহ হইয়াছিল। মেহেরপুরের পালেরা বহু পুরাতন সম্মানিত বংশ। মেহেরপুরের জমীদার মুখোপাধ্যায় বাবুদের যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তখন মেহেরপুর অঞ্চলের ইংরাজ নীলকররাও তাঁহাদিগেকে ভয় করিয়া চলিত। কথিত আছে, চন্দ্রমোহনবাবুর আদেশে একই রাত্রিতে তাঁহার লাঠিয়ালরা ঐ অঞ্চলের বহুসংখ্যক নীলকুঠী আক্রমণ করিয়া কুঠিয়াল সাহেবদের বাঙ্গালীর লাঠীর মহিমা ও ইজ্জৎ বুঝাইয়া দিয়াছিল। এই সময় আমার পিসে মহাশয় মুখুয্যে বাবুদের নায়েব ছিলেন ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কন্যার সহিত আমার কাকার বিবাহ হইয়াছিল। যে সময় হরিদাসের বিবাহের আয়োজন, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে কাকার ছোট শ্যালকের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী গ্রামের নন্দী-বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি শ্যালক, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে অষ্টমঙ্গলায় লইয়া যাইবার জন্য মেহেরপুরে আনিয়াছিল। কাকার শ্যালকের এই শ্যালকটি তখন বারো তের বৎসরের বালক। উমেশ পাল এই বালকটিকে বালিকা সাজাইয়া হরিদাসের সহিত বিবাহের আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু সংবাদটি কেবল আমার ঠাকুরদাদার নহে, কাকার শ্বশুরমহাশয়েরও অগোচর ছিল।

উমেশ পাল হরিদাসকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—পাত্রী মেহেরপুরেই আসিয়াছে, সুতরাং খরচপত্র করিয়া আর জলঙ্গী যাইবার প্রয়োজন নাই ; শুভকার্য্য তাহার বাড়ীতেই সুসম্পন্ন হইবে।

৫২ বৎসর পূর্ব্বের কথা ; কিন্তু 'বিবাহের' দিনের সকল ঘটনার কথা এখনও আমার সুস্পষ্টরূপে মনে পড়িতেছে। সে দিন আমাদের কি উৎসাহ, আয়োজনের কি ঘটা !

হরিদাস সকাল হইতে সে দিন বাড়ীতে অনুপস্থিত, তাহার ছোট ভাই গোষ্ঠকে বলিয়া গেল—"আজাইকে বলিস্, আমি শ্যামপুর যাচ্ছি, কাল আসবো।"

শ্যামপুর পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানে ছোটকাকার শ্বশুরবাড়ী। হরিদাস মধ্যে মধ্যে শ্যামপুরে যাইত ; ছোটকাকার শাশুড়ী তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, হরিদাসের ও তাঁহার পিত্রালয় একই গ্রামে, উভয় বংশে কি একটা সম্বন্ধও ছিল।

হরিদাস শ্যামপুরের পরিবর্ত্তে উমেশ পালের বাড়ী হাজির। উমেশ পালের বাড়ীর পশ্চিম ধারে তাহার একটি ক্ষুদ্র কলাবাগান ছিল, হরিদাস ছোট ছোট চারটা কলার গাছ কাটিয়া আনিয়া উঠানে পুতিয়া দিল। উমেশ পালের স্ত্রী ছাদনাতলা গোময়লিপ্ত করিয়া সেখানে আলিপনা দিল; বরণডালা সাজাইয়া বিবাহের আয়োজন করিয়া রাখিল।

শেষে পুরোহিত লইয়া গোল বাধিল। উমেশ পাল বলিল, "হরিদাস, আমাদের পুরুত ঠাকুরকে খবর দিতে হবে যে!"

হরিদাস বলিল, "শ্রীকান্ত ভটচায? আজাই-এর সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব, ও পুরুত ডাকলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে, ঠাকুর আজাইকে সব কথা ব'লে দেবে। আর এক জন পুরুত ঠিক কর।"

এ সকল ব্যাপারে পুরোহিতের অভাব হয় না, পাড়ার একটি ব্রাহ্মণ-বালক পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইল।

আমরা দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার সময় উমেশ পালের বাড়ীতে উপস্থিত। কাকার শ্যালকটিকে পূর্ব্বেই শিখাইয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেখিলাম, সে কনে সাজিয়া উমেশ পালের ঘরের ভিতর বসিয়া আছে। মাথায় পরচুলার খোঁপা, হাতে বালা, চুড়ি, তাগা; গলায় হার, পায়ে মল; আল্‌তা পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। পরিধানে লাল চেলি।

বরযাত্রীরা কনে দেখিয়া বলিল, "খাসা কনে।"

হরিদাস আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছিল। আমাকে বলিল, "ভাই, কনেকে জিজ্ঞাসা কর ত আমাকে পছন্দ হয়েছে কি না? তুমি হচ্ছ দেওর, তোমাকে মনের কথা ঠিক বল্‌বে।"

হরিদাস দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গভীর তৃপ্তির সহিত কনের মুখ দেখিতে লাগিল, কিন্তু "নয়ন না তিরপতি ভেল!"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বর পছন্দ হয়েছে ত?

কনে ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া মুখ নামাইল।

হরিদাস সগর্ব্বে বলিল, "পছন্দ হবে না। আমার চেহারা কি অমন্দ?"

সন্ধ্যার পর বিবাহ। উমেশ পাল কন্যাকর্ত্তা হইয়া কন্যাসম্প্রদান করিল, পাড়ার অনেক ঝি-বৌ বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল। ঘন ঘন হুলুধ্বনি হইতে লাগিল, শঙ্খধ্বনিতে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইল। দুই তিনটি ছেলে ক্যানেস্তারা বাজাইতে আরম্ভ করিল।

উঠানের এক প্রান্তে দরমার বেড়া দিয়া স্ত্রী-আচারের স্থান হইয়াছিল। সেখানে সাত পাক হইবে। হরিদাস লাল চেলি পরিয়া টোপর মাথায় দিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইল, পাড়ার পাঁচটি যুবক কনেকে পিঁড়িতে তুলিয়া সাতপাক দিতে লইয়া গেল। কিন্তু সাত পাক আর হইল না, তিন চারি পাকের পর এক বিভ্রাট উপস্থিত!

ঠাকুরদাদা সন্ধ্যার সময় কাঁধে একখান চাদর ফেলিয়া তাঁহার লাঠী লইয়া ধীরে ধীরে বৈবাহিক-গৃহে উপস্থিত। এক এক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে কাকার শ্বশুরবাড়ী যাইতেন, এবং বৈবাহিকের সঙ্গে কিছু কাল গল্প করিয়া বাড়ী ফিরিতেন; হরিদাসের বিবাহের দিন সন্ধ্যাকালে তিনি বৈবাহিকগৃহে পদার্পণ করিয়াই অদূরে ঘনঘন হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

তাঁতি-পাড়ায় যাইবার রাস্তার উত্তর ধারে কাকার শ্বশুরবাড়ী, দক্ষিণ ধারে পঞ্চাশ ষাট গজ তফাতে উমেশ পালের বাড়ী। সুতরাং উৎসবের কলরোল ঠাকুরদাদার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না।

ঠাকুরদাদা তাঁহার বৈবাহিকের বারান্দায় মাদুরের উপর বসিয়া বলিলেন, "বেয়াই, তোমাদের পাড়ায় কি এমন সমারোহ ব্যাপার যে, ক্রমাগত উলু পড়ছে, শাঁখ বাজ্‌ছে?"

কাকার শ্বশুর বলিলেন, "ও আর কি ? কতকগুলো উতো ছোঁড়া তোমারই নাতি হরিদাসকে নিয়ে মজা মারছে ! উমেশ শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেছে।—মণির শালা এসেছে জলঙ্গী থেকে, তাকে কনে সাজিয়ে হরিদাসের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে। বেহায়া ছোঁড়াগুলার কথা আর কেন বল ?"

ঠাকুরদাদার জন্য তামাক সাজা হইয়াছিল ; তিনি হুঁকা হাতে না লইয়াই উঠিয়া পড়িলেন। বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সেকি ? হরিদাস যে বাড়ীতে ব'লে গিয়েছে—শ্যামপুরে যাচ্ছে। আমি ত জানি, সকালে সে শ্যামপুরে গিয়েছে।"

তাঁহার বেয়াই বলিলেন, "ওটা তার ধাপ্পাবাজি, শ্যামপুরে যাওয়া মিছে কথা, তাকে সকালেই এ পাড়ায় ঘুরতে দেখেছি, বিয়ের চেষ্টায় সকাল থেকে উমেশের বাড়ী ধন্না দিয়েছে। বোধ হয়, বিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তাই উলুর ঘটা।"

তাঁহার নির্ব্বোধ নাতির প্রতি এই অত্যাচার—এই নিষ্ঠুর পরিহাস ঠাকুরদাদা তাঁহার সম্ভ্রমের হানিকর বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া উমেশ পাল ও তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া লাঠী হাতে উমেশ পালের বাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন।

বিবাহের বাড়ী, বাহিরের দরজা খোলা ছিল, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ দেখিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভেড়ার পালে বাঘ পড়িবে,—এ আশঙ্কা কাহারও মনে স্থান পায় নাই। পল্লীনারীগণেব হুলাহুলির মধ্যে সাত পাক হইতেছে, চারি পাক শেষ হইয়াছে, তখনও তিন পাক বাকী, সেই সময় ঠাকুরদাদা উমেশ পালের উঠানে প্রবেশ করিয়া উমেশকে গামছা কাঁধে ব্যস্তভাবে উঠানে ঘুরিতে দেখিলেন। ঠাকুরদাদা লাঠীতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "উমেশ, এ তোমার কি রকম আক্কেল ? ঐ বোকা বানরটাকে নিয়ে মজা মারতে তোমাদের একটু লজ্জা হ'লো না ? জানো, এখনও আমি বেঁচে আছি। তোমার এই গোস্তাকির জন্যে নাকে খত দেওয়া উচিত।"

উমেশ লজ্জার মাথা হেঁট করিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার মুখে কথা সরিল না। যাহারা কনের পিঁড়ে ধরিয়া সাতপাক দিতেছিল, তাহারা পিঁড়ে মাটীতে ফেলিয়া—"রায় মশায় রে, পালা, পালা !" বলিয়া সঙ্গীদের সতর্ক করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। কেহ প্রাচীরের আড়ালে লুকাইল, কেহ কলাবাগানে প্রবেশ কবিল, কেহ কেহ বেড়া ডিঙ্গাইয়া উমেশ পালের বাড়ীর পূর্ব্বদিকের গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। উমেশের স্ত্রী কয়েক জন সঙ্গিনীসহ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজায় খিল দিল।

ঠাকুরদাদা 'কনে'কে মিষ্ট র্ভৎসনা করিলে সে লজ্জিত হইয়া পরচুলা ও সাড়ী খুলিয়া ফেলিয়া লজ্জায় মুখ গুঁজিয়া পলায়ন করিল, সাড়ীর নীচে তাহার কাছা-কোঁচা আঁটা ধুতি ছিল। কিন্তু পায়ের মল খুলিবার জন্য সে আর সেখানে দাঁড়াইল না।

ঠাকুরদাদাকে দেখিয়া হরিদাস টোপর মাথায় পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কনে হঠাৎ পুরুষ হইয়া পলায়ন করিল দেখিয়া সে বোধ হয় প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিল। সে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি রান্নাঘরের আড়ালে দাঁড়াইয়া হরিদাসের দুর্গতি ও ঠাকুরদাদার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইবে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

ঠাকুরদাদা হরিদাসের পাঁজরে লাঠীর খোঁচা দিয়া বলিলেন, "বোঁচা, এই বুঝি তোর শ্যামপুরে যাওয়া ? বেটাছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে ঐ বাঁদরগুলো তোকে নিয়ে মজা মারছিল—তা বুঝতে পারিস নি ! আমি আর তোর মত বর্ব্বরের মুখ দেখতে চাইনে

বাড়ীমুখো হবি কি লাঠী খাবি।"

হরিদাস ঠাকুরদাদার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ঘাট হয়েছে আজাই, আমি বুঝতে পারি নি। এমন কম্ম আর কখন হবে না, এই আমি নাকে খত দিচ্ছি!"—সে ঠাকুরদাদার পায়ের কাছে মাটীতে নাক ঘষিল।

এই ঘটনার পর উমেশ পাল এক মাস ঠাকুরদাদার সম্মুখে আসিতে সাহস করে নাই। এ কালেও পল্লীগ্রামে এরূপ ঘটনা দুই একটি ঘটিতে দেখা যায়; কিন্তু অন্নচিন্তায় স্ফূর্ত্তি কমিয়া গিয়াছে।

(৭)

আমি যখন মেহেরপুর এনট্রান্স স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ি, সে সময় আমাদের গ্রামে বারো মাসে তের পার্ব্বণের ধূম লাগিয়াই থাকিত। সাধারণ গৃহস্থদের অনেকে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রীপূজা করিত; কালীপূজা, কার্ত্তিকপূজা ত প্রায় ঘরে ঘরেই হইত। সরস্বতীপূজা উপলক্ষে কালীবাজারে সপ্তাহব্যাপী উৎসব, যাত্রা, গান, ঢপ, কবির লড়াই—জনসাধারণ দিবারাত্রি সেই উৎসবে মত্ত! জন্মাষ্টমীতে বৌবাজারে কত আমোদ; গ্রাম্য শ্রমজীবীরা ময়ূরপঙ্খীতে উঠিয়া সারিগানে গ্রামের পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। কোন কোন উৎসবে গ্রামস্থ জমীদার যুবকরা সাধারণ ভদ্রলোকদের দলে মিশিয়া, বাউল সাজিয়া সন্ধ্যার পর পথে পথে গান করিয়া ফিরিতেন। সেই বহু দিন পূর্ব্বে—যখন হেলীর ধূমকেতু উঠিয়াছিল—সেই সময় তাঁহারা বাউল সাজিয়া কালী-মন্দিরের সম্মুখে নাচিতে নাচিতে যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহা এত কাল পরেও যেন আমার কানে বাজিতেছে! সেই গানটি এইরূপ—

"নিশিদিন মরি ভেবে, ও মা শিবে!
উঠ্‌লো পূবে লম্বা তারা।
*　　　*　　　*
তারার ল্যাজ লম্বা ভারী, সন্দো করি,
'হরি হরি' বল্ গো তোরা।"

সে সময় লোকের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, জিনিসপত্র যথেষ্ট সুলভ ছিল; কিন্তু এ কালের মত 'নাই নাই, খাই খাই' ছিল না। পল্লীতে পল্লীতে এ কালের মত বেকার-সমস্যাও জটিল হয় নাই। সকলেই পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিত। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য সমাজের সকল স্তরে এ কালের মত প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষিত হইত না। কেহই পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া ছেলেদের কলিকাতার কলেজে পড়িবার খরচ যোগাইত না বা কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হাহাকার করিত না। এখন গ্রামের বাজারে সাত আটখানি বিলাসদ্রব্যের দোকান চলিতেছে; সে সময় বাজারে যদু পালের ও বেণীবাবুর দোকান ভিন্ন ঐরূপ দোকান আর একখানিও ছিল না। বেণীবাবু গ্রামস্থ জমীদারের জামাই হইয়াও 'দোকান করিয়া খাওয়া' লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের দোকানে মনোহারী জিনিস বিক্রয় হইলেও, এ কালের মত অসংখ্য জাপানী ও জর্ম্মান বিলাসদ্রব্যে, রকম রকম খেলেনায় তাঁহাদের দোকান পাকা মাকালের শোভা ধারণ করিত না, এবং সে কালে সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে কুড়ি রকম কেশ-তৈল, পঁচিশ রকম এসেন্স,

এবং ত্রিশ রকম সাবানেরও প্রচলন হয় নাই। গৃহস্থের ছেলেরা জামালকোটা বা আস্যাওড়ার ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন করিত; গৃহস্থ-পরিবারের ঝি-বৌরা উনান হইতে যে ঘুটের ছাই অর্থাৎ পোড়া ঘসি সংগ্রহ করিয়া রাখিত, তদ্দ্বারা দাঁত মাজিত; কেহ কোন রকম দাঁতের মাজন কিনিয়া দন্ত-পরিচর্য্যা করিত না, এবং জুতার বুরুষ ভিন্ন দাঁতেরও বুরুষ পাওয়া যায়, ইহা কেহ বিশ্বাস করিত না। সে কালে সহরে সাইক্রের আমদানী হইলেও চাকায় চড়িয়া কেহ পল্লীভ্রমণ করিতে পারে, সাধারণে ইহা ধারণা করিতে পারিত না। মোটর-কার এরোপ্লেনের নাম পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

পল্লীগ্রামের যে সকল বিলাসিনীর গন্ধতৈল ব্যবহারের সখ হইত, তাহারা নারিকেল-তেলে নানা প্রকার বেণে মশলা ভিজাইয়া রাখিত এবং সেই তেল ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া কেশের প্রসাধনে ব্যবহার করিত। উড়ে পাচকরা তখন সাধারণ গৃহস্থের পাকশালা দূরের কথা, ধনবান্ জমীদারদেরও অন্তঃপুর অধিকার করিতে পারে নাই। বাল্যকালে আমি আমাদের গ্রামে একজনও উড়ে পাচক দেখি নাই। যাঁহাদের বৃহৎ সংসারে পাচক রাখিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা দূর-সম্পর্কীয়া কোন বিধবা আত্মীয়াকে বা গ্রামস্থ কোন অসহায়া ব্রাহ্মণকন্যাকে পাকশালার ভার প্রদান করিতেন। গ্রাম্য বাজারে যে সকল মুদীখানা বা কাপড়ের দোকান ছিল এবং পাট, তিসি, ছোলা, গম প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য চালানের আড়ত ছিল, গ্রামের লোকরাই তাহাদের মালিক ছিল। এখন মাড়োয়ারীদের দল বাজার অধিকার করিয়াছে; যে দুই চারি জন স্থানীয় লোকের দোকান আছে—উপযুক্ত মূলধনের অভাবে তাহারা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া দোকান বন্ধ করিতেছে, এবং স্থানীয় দোকানদারের ছেলেরা দোকানের কাজকর্ম্ম শিখিবার চেষ্টা না করিয়া উকীল, মোক্তার, ডাক্তার বা সরকারী আফিস-আদালতের কেরাণী হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার কি ফল হইতেছে, তাহা শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া নিত্য দেখাইয়া দিতেছেন। সে সময় গ্রামে কাহারও বাড়ী কুটুম্ব আসিলে গরম মুড়ি, আকের গুড়, নারিকেল-লাড়ু, আদার কুচি, শসা, কাঁকুড়, তালের বড়া, পিঠা, আঁদোশা প্রভৃতি দ্বারা গৃহস্থ তাঁহাকে জলযোগ করাইতে কুণ্ঠিত হইত না; আর এ কালে?—সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন কুটুম্ববাড়ী পাঠাইবার জন্য পল্লীগ্রামেও তত্ত্বের আয়োজন দেখিলে দুই চক্ষু কপালে উঠে। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের সুস্থ সবলদেহ যুবার দল বৃদ্ধ পিতা, পিতৃব্য বা মাতুলের গলগ্রহ হইয়া দশ পনের টাকা বেতনের চাকরীর প্রত্যাশায় আদালতে বা জমীদারী সেরেস্তায় উমেদারী করিয়া জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবে, কিন্তু স্বাধীনভাবে দু'টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে না; অথচ রুচির পরিবর্ত্তনে তাহাদের ঘরে বাহিরে সাবান, সেন্ট, রুজ, পাউডার, স্নো, কুন্তলীন, কেশরঞ্জন, এসেন্স প্রভৃতি বিলাসিতার সহস্র উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন! এ কালে পল্লীগ্রাম হইতে চারি আনা মূল্যের কাষ্ঠপাদুকা—খড়মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং সাত শিকা, দুই টাকা মূল্যের "স্যাণ্ডেল" তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহারা দৈনিক আট আনা উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদের ঘরের মেয়েরা স্কুলে যাইবার সময় স্যাণ্ডেল না হইলে এক পাও চলিতে পারে না! এই নারী-প্রগতির যুগে—ইহাই সভ্যতার নিদর্শন! পেটের ভাত না জুটুক, মেয়েদেরও গেঞ্জি, সেমিজ, ফ্রক, সায়া, স্যাণ্ডেল চাই-ই। যে অর্থাভাবে তাহা না যোগাইতে পারিবে, সমাজে সে নিন্দনীয়; তাহার অন্তঃপুরে অশান্তির সীমা নাই! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারাণ্যং তথা গৃহম্॥"—পারিবারিক অশান্তিতে অনেকে অরণ্যবাসই

বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছে ; কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া গ্রামপ্রান্তস্থ বাগানে প্রবেশ করিতেছে, তাহার পর উচ্চ বৃক্ষশাখায় গলায় ফাঁস দিয়া মোক্ষলাভ ! অল্পদিন পূর্ব্বে রাণাঘাটে এইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে শুনিয়াছি। পূর্ব্বেও আমাদের অর্থের সচ্ছলতা ছিল না, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সুলভ ছিল, এখনও তাহাই ; সে দিন রাজসাহীতে বৈবাহিক-গৃহে আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন শিশু পৌত্রকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত এক সেরের (কাঁচি) মূল্য চৌদ্দ আনা, এক সের আকের গুড় তিন পয়সা, পটোল—সেরূপ উৎকৃষ্ট বৃহদাকার টাট্‌কা পটোল কলিকাতায় দেখিতে পাই না,—প্রতি সেরের মূল্য দেড় পয়সা।—এবার পাকা আম গত বৎসর অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য, তথাপি ছাব্বিশ গণ্ডায় 'এক শত' সাবড়া আমের মূল্য দশ পয়সার অধিক নহে। এক দিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে রুদ্ধদ্বার গৃহে বিশ্রাম করিতেছি—বৈবাহিকের পুত্র ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল, "তাউই মশায়, একবার শীঘ্র পুষ্করিণীর দিকে আসিয়া দেখুন !" তাহার আহ্বান-ধ্বনিতে আমার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল ; আমার অন্ধের নয়ন একমাত্র শিশু পৌত্র পুকুরের জলে পড়ে নাই ত ? অন্দরের আঙ্গিনার পাশেই পুষ্করিণী। অন্দর-মহলের ঘাট তিন দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ; পুরমহিলারা সেই ঘাটে স্নান করেন, উহা 'মহল-ঘাট' নামে পরিচিত। আমি 'মহল-ঘাটের' সোপানের উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে পুষ্করিণীর জলের দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব ! জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে পুষ্করিণীর জল অত্যন্ত গরম হওয়ায় মাছ ভাসিয়াছে। পাঁচ সাত শত ছোট বড় রুইমাছ পুষ্করিণীর জল আচ্ছন্ন করিয়া ভাসিতেছিল। এক সের হইতে পাঁচ সাত সের ওজনের নানা আকারের রুইমাছ পুনঃ পুনঃ মুখ নাড়িয়া খাবি খাইতেছিল ; পুচ্ছ নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বৈবাহিক ও বৈবাহিকা, গোরুর রাখাল থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে গাভীর পরিচর্য্যা করেন ; প্রভাতে ও অপরাহ্নে গো-দোহনের সময় 'গোয়ালে' উপস্থিত থাকেন। দুই বেলা দুই বালতি দুধ ! বৈবাহিক স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থ ; গৃহপ্রান্তে তাঁহার প্রকাণ্ড আমের বাগান, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ সুপারী গাছ ; তিনি স্বয়ং বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষমূলে উপস্থিত থাকিয়া ভৃত্যের সাহায্যে পাকা আম ও সুপক্ক সুলোহিত সুপারীর কাঁদি পাড়াইয়া শ্রেণী-বিভাগ করেন ; স্বহস্তে বৃক্ষের পরিচর্য্যা করেন। অন্দরে ফুলের বাগান ; গ্রীষ্মকালে টগর, গোলাপ, গন্ধরাজ, মল্লিকা, যুঁই প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রাখে। তাঁহারা প্রতি সন্ধ্যায় গৃহ-বিগ্রহের জন্য সেই ফুলের মালা গাঁথেন। সায়ংকালে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে দেবায়তন মুখরিত হইতে থাকে। বৈবাহিক সস্ত্রীক দেবারাধনায় রত থাকেন, এবং অদূরবর্ত্তী ধর্ম্মসভা-ভবনে সন্ধ্যার পর সুকণ্ঠ কথক ঠাকুরের কথকতা আরম্ভ হইলে তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী সংসারের সকল কায ছাড়িয়া সুমধুর পৌরাণিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া আসেন। বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন, শান্তিপূর্ণ, নিভৃত পল্লীবক্ষে তাঁহাদের জীবন যাপনের প্রণালী দেখিযা আমাদের কলিকাতায় কালক্ষেপণের প্রণালীর কথা মনে পড়িল। মনে হইল, আমরা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা কলিকাতায় বাঁচিয়া থাকি—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ! আমরা যাহা আহার করি—সত্যই তাহা আহারের অযোগ্য, বিষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ! আমাদের কলিকাতাবাস 'দিনগতপাপক্ষয়ঃ।' বৈবাহিক দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কোন রকম বিলাসিতার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই ; সে জন্য একটি পয়সাও বাজে খরচ করি না। সে কালের আদর্শে কাল কাটাইতেছি ; কিন্তু ছেলেরা এ-ভাবে চলিবে না, চালাইতেও পারিবে না। বিলাসের ব্যয় কুলাইবে না ; সকলই নষ্ট হইবে। সাধ্যাতিরিক্ত আড়ম্বর ও বিলাস আমাদের নব্য বাঙ্গালার অভিশাপ। পল্লী-জীবনের সুখশান্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

পূর্ব্বকালের মত সকল জিনিসই সস্তা, কিন্তু চতুর্দ্দিকে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসের বিরাম নাই ! জীবনযাপনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ।"

এক দিন দেখিলাম, মেথরাণী ময়লার হাঁড়িটা মাথায় লইয়া, পায়খানা খাটিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল । তাহার অঞ্চলে মুড়ি ছিল, তাহাই সে নির্ব্বিকারচিত্তে ফাঁকাইতেছিল ; হাত দুইখানি ধুইবারও অবকাশ পায় নাই ।

বৈবাহিকের অন্তঃপুরে এ কথার উল্লেখ করিলে বধূমাতা বলিলেন, "মহাত্মা গান্ধী দেবতা, তাঁর উচ্চ আদর্শে এখানেও হরিজনদের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে । ভদ্রমহিলারা সভা ক'রে বক্তৃতা করছেন, নেতারা হরিজনদের সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন ; অনেকে উৎসাহের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করছেন,—পায়খানা, নর্দ্দমার ময়লা পরিষ্কার করতেও তাঁদের কুণ্ঠা নেই ; কিন্তু ঐ মেথরাণীর হাতের জল কি ক'রে মুখে তুল্‌বো, বাবা ! ঐ রকম নোংরা ওদের আচার-ব্যবহার । ওদের সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে মিলা-মিশা করলে ওরা উচ্চে উঠবে কি না, জানি না, কিন্তু আমরা অনেক নীচে নামব । আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, ঐ মেথরাণী সে দিন আমাদের পায়খানা সাফ করতে এসে কথায় কথায় বললে, 'তোমাদের হিঁদু ভদ্দোর লোকদের ত আর চাক্‌রী-বাক্‌রী জুটছে না, ধ'রে ধ'রে তাদের জেলে পূরছে ; তাই এখোন্‌ তোমরা আমাদের দলে ভিড়েছ, আমাদেব সঙ্গে ঠ্যাসে কোলাকুলি করছো ; আমাদের ছোঁয়া জল খেয়ে দেখাচ্চো, আমরা তোমাদের সমান । চাকরী জুটছে না দেখে শেষে আমাদের চাকরীগুলো কাড়্যে নিবা না কি ? নৈলে কি সখ কয়র‍্যা ময়লা ঘাঁটতি নেগেচস্‌ ? ও-সব তোমাদের লোক-দেখানো দরদ ! তবে যদি তোমাদের মেয়্যার সঙ্গি আমাদের বিটা-ছাবালের বিয়া দিতে পার, তবে বুঝি হাঁ, তোমরা আমাদের সমান মনে কর । তোমরা কলম বাজিয়ে যা রোজগার কর, আমরা পায়খানা ঘেঁটে তার সিকির সিকিও পাইনে, তবে আর আমরা তোমাদের সমান হোলাম ক্যামোন কোর‍্যা ? ছেঁদো কথায় ভুলুতে চাও ?'

"অনেক হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর আস্কারা পেয়ে এই ভাবে এখনই আমাদের মাথায় চড়্‌তে চাইছে ; এর ফল কি ভাল হবে বাবা ! এই রকম মাখামাখির শেষ কোথায় ?"

আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই । অপরিণতবুদ্ধি বালিকার প্রশ্ন কি উপেক্ষার অযোগ্য নহে ?

সে কালের স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিয়া এ কালের অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম ; এখন খেই ধরিতে হইবে ।

আমাদের গ্রামের এন্‌ট্রান্স স্কুল হইতে অনেক দিন কোন ছেলে এন্‌ট্রান্স পাশ করিতে না পারায় সরকারী সাহায্য কমাইয়া দেওয়া হইল । স্কুলের ছাত্রসংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল ; অনেক অভিভাবক ছেলেদের সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতেছিলেন ; তাহারা দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিল । আমাদের স্কুল 'মাইনর' অর্থাৎ মধ্যইংরাজী স্কুলে পরিণত হইল । আমার কাকা এন্‌ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, তিনিই মাইনর স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার হইলেন : মাসিক বেতন সাতাশ টাকা হইতে ত্রিশ টাকা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা এ কালের এক শত টাকার সমান ।

বাবা কৃষ্ণনগরে চাকরী করিতেন, তিনি আমাকে মাইনর স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিলেন । আমি আমাদের আমিন-বাজারের বাসা হইতে নেদেরপাড়ার ভিতর দিয়া কলেজে যাতায়াত করিতাম । বিলের মাছ যেন সাগরে পড়িল ।

এই সময় কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত 'ষ্টুডেণ্টস কেশ' আরম্ভ হইয়াছিল । এই পঞ্চাশ বৎসর

পরে সকল ঘটনার কথা ঠিক স্মরণ নাই ; কেবল এইমাত্র স্মরণ হইতেছে যে, গোয়াড়ীর বাজারে মহা-সমারোহে যে বারোয়ারী পূজা হইত, সেবার সেই বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে যখন যাত্রাগান হইতেছিল, সেই সময় কলেজের কতকগুলি ছাত্রের সহিত বারোয়ারীর পাণ্ডাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। ছাত্রদের আব্দার একটু বেশী ;—আমরা দল বাঁধিয়া সহরের ভদ্র লোকদের জন্য সংরক্ষিত চেয়ার-বেঞ্চিগুলি দখল করিয়া বসিয়াছিলাম। বারোয়ারীর পাণ্ডারা আমাদিগকে উঠিয়া যাইতে বলে ; আমরা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া তাহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করি। তখন তাহারা বলপ্রয়োগ করে ; ইহাতেই হাতাহাতি আরম্ভ হয়। পুলিস চিরদিনই ছাত্রদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও তেজস্বিতার বিরোধী। পাণ্ডাদের অনুরোধে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করে ; তাহার পর পুলিসের সঙ্গে ছাত্রদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুলিসের দল তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আমাদের দলপতি, (পুলিসের ভাষায় রিংলীডার) নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও পঁচিশ ত্রিশ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিল ; পুলিসের ইংরাজ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট স্বয়ং সেনাপতির ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তখন আমরা অনেকেই "যঃ পলায়তি স জীবতি।"

পলাতক অপরাধিগণকে সনাক্ত করিবার জন্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সদলে কলেজে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু সেকালে ও একালে অনেক তফাৎ! তখন ম্যান্ সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ইংরাজ হইয়াও ইংরাজ পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কলেজে প্রবেশ করিতে দিলেন না। পুলিস-সাহেবের জিদ বাড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মামলা চলিতে লাগিল। ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস-সাহেবের শাসননীতির সমর্থন করিলেন। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে বিচার-বিভ্রাট ঘটিল। তখন কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ছাত্রগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া মহা উৎসাহে মামলা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তি, কৌশল, অব্যর্থ জেরা ও বাগ্মিতায় জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মিঃ ঘোষের চেষ্টার ফলে সুবিখ্যাত দায়রা জজ এফ. এফ্ হ্যাগুলীর এজলাসে ছাত্রগণ জয়লাভ করিল। পুলিস-সাহেব 'ডিগ্রেড' হইয়া স্থানান্তরিত হইলেন ; জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকেও বদলী হইতে হইল! সে বোধ হয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের আমোলে। এই জন্যই ঐরূপ অঘটন ঘটিয়াছিল। ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলার ফলে পুলিসের বড় সাহেব ডিগ্রেড, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী। এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড এ কালের ভারতে স্বপ্নাতীত ব্যাপার নহে কি ? কিন্তু সে কালের সেই উনিশ শতাব্দীর পুলিস প্রজাসাধারণের মা-বাপের স্থান অধিকার করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের কি পরিমাণ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইয়াছে, এবং শাসক ও বিচারকগণের মনস্তত্ত্বের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—এত কাল পরে কৃষ্ণনগর-ষ্টুডেন্টস কেসের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া তাহার কতকটা ধারণা করিতে পারি না কি ? আর যাহাই হউক, আমাদিগকে তখন এ কালের মত আইনের দুর্ভেদ্য ব্যূহে সুরক্ষিত হইয়া অসহায় হইতে হয় নাই। স্কুল-কলেজের ছেলেরা তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে সন্দেহ ও বিভীষিকার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। অভিযুক্ত ছাত্ররা সকল অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বুক ফুলাইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু এই মামলার কথা দীর্ঘকাল সমাজের সকল স্তরে আলোচিত হইয়াছিল। এই মামলার পর কৃষ্ণনগরের ছাত্ররা ও জনসাধারণ ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির অর্ঘ্যে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল! মিঃ ঘোষ সে সময় কলিকাতায় তাঁহার ৪ নং থিয়েটার রোডের ভবনে বাস করিতেন। এই মামলা

উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বহুবার কৃষ্ণনগরে আসিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি নিঃস্বার্থভাবে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এই ভাবে তিনি বহু দিন বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তাঁহার সাহায্যে অনেক ফাঁসীর আসামীর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

'কৃষ্ণনগর-ষ্টুডেণ্টস্ কেস' লইয়া নগরে যে বিপুল আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, সমাজের সকল স্তরে, এমন কি, ধনী ও দরিদ্রের অন্তঃপুরেও যে উৎসাহ ও উত্তেজনার আতিশয্য লক্ষিত হইতেছিল, তাহা প্রশমিত হইতে না হইতেই নদীয়ার সেসন-আদালতে একটি খুনী মামলার বিচার আরম্ভ হইল ; নগরের অধিবাসীরা সেই মামলার বিচার দেখিবার জন্য প্রত্যহ জজ-আদালত পূর্ণ করিতে লাগিল। আদালতের বাহিরের আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সুদূর-প্রসারিত শাখার ছায়ায় সমবেত হইয়া দূর-দূরান্তের গ্রামবাসীরা সেই মামলার বিচারফলের প্রতীক্ষা করিত ; তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত, সেখানে রথের মেলা বসিয়া গিয়াছে ! বস্তুতঃ তারকেশ্বরের ধর্ম্মজ্ঞানহীন, কপট ও দুশ্চরিত্র মোহান্ত মাধবগিরি কর্ত্তৃক একটি ভদ্র পরিবারের এলোকেশী নাম্নী নবীনা সুন্দরী যুবতী ধর্ষিতা হইলে মোহান্তের বিচারকালে আদালতে যেরূপ জনসমাবেশ হইয়াছিল, কৃষ্ণনগরের দায়রা-আদালতে উক্ত কুৎসিত মামলার বিচারকালেও সেইরূপ বিপুল জনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের আড়ংঘাটা ষ্টেশনের অদূরে মামজোয়ান নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে হারাধনবাবুর বাস। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং রূপবান পুরুষ ছিলেন ; তাঁহার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। যে সময়ের ঘটনা, তখন তাঁহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবীর বয়স কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নহে। বেহারী জাতিতে কৈবর্ত্ত-যুবক, হারাধনের প্রতিবেশী ও কর্ম্মচারী। এক দিন রাত্রিকালে মাতঙ্গিনী নিদ্রিত হারাধনের পদদ্বয় তাহার মৃণাল ভুজবন্ধনে আবদ্ধ করিলে, বেহারী সুশাণিত খড়্গ দ্বারা তাহার হতভাগ্য স্বামীর মুণ্ডচ্ছেদন ক'রে ! শুনিয়াছিলাম, মাতঙ্গিনী যখন হারাধনের পদদ্বয় উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার আত্মরক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সময় তিনি হঠাৎ জাগিয়া প্রাণভয়ে তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মাতঙ্গিনী তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত করিয়াছিল। সেই অবস্থায় বেহারী খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে। আমরা সেসন-আদালতে এই মামলার বিচারের সময় সেই শোণিতাপ্লুত খড়্গ, এবং মাতঙ্গিনী ও বেহারীকে দেখিয়াছিলাম। পতিহত্যায় বেহারীর সহযোগিতা করিয়া মাতঙ্গিনী অনুতপ্ত হইয়াছিল কি না, জানি না ; কিন্তু সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল, এবং জুরীর বিচারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইলে সে আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিল। বেহারীর ফাঁসী হইয়াছিল। সে সময় মাতঙ্গিনী ও বেহারীর অবৈধ প্রণয় ও হারাধনের হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বহুসংখ্যক গান রচিত হইয়াছিল। নেড়ানেড়ীরা গোপীযন্ত্র (গাবগুবাগুব) ও ডুগীমন্দিরা সহযোগে সেই সকল গান গাহিয়া নগর ও পল্লীবাসী গৃহস্থগণের নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। একটা গানের একটি কলি এখনও আমার স্মরণ আছে,—

"ভালো কীর্ত্তি রাখ্‌লো ব্রাহ্মণী,—

হারু বাবুর রমণী সেই মাতঙ্গিনী !"

'কৃষ্ণনগর ষ্টুডেণ্টস্' কেসের পর, যে কারণেই হউক, অনেক অভিভাবক তাঁহাদের ছেলেদের কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ; সেই সময় আমি মেহেরপুরে প্রেরিত হইয়া গ্রাম্য স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। এনট্রান্স স্কুল তখন মাইনর স্কুল ; দুই বৎসর পরে সেই স্কুল হইতে আমি মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।

এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে কুমারখালীতে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল ভিন্ন সমাজে পৌত্রীর বিবাহ দেওয়ায় আমাদের সমাজের মোড়লরা দলবদ্ধ হইয়া আমার ঠাকুরদাদাকে 'একঘরে' করিয়াছিল ; কিন্তু আমরা একঘরে না হইয়া 'পাঁচঘরে' হইয়াছিলাম ; কারণ, গ্রামে যে চারিঘর গৃহস্থ আমাদের নিকট-আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারা মোড়লদের অনুরোধেও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই।

মাইনর পাশ করিয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য আমি পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইলাম। কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া আমাকে দীর্ঘকাল সেখানে অধ্যয়ন করিতে হয় নাই : মেহেরপুর মহকুমার অধিবাসিগণের চেষ্টাযত্নে মেহেরপুরের মাইনর স্কুল এনট্রান্স স্কুলে উন্নীত হইলে আমি পুনর্ব্বার মেহেরপুর স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, কিন্তু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলী'র বৎসরে আমরা ছয় জন সহপাঠী পরীক্ষার্থী মেহেরপুর স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ছয় জনেই ইংরাজী সাহিত্যে 'কুঁপোকাৎ !' এক জনও ইংরাজী সাহিত্যে পাশের নম্বর রাখিতে পারি নাই।

ব্যাপার কি, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। জুবিলীর বৎসর বলিয়াই কি সেবার যত পরীক্ষার্থী এনট্রান্সে পাশ করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর সেরূপ পাশ কখন দেখিতে পাওয়া যায় নাই ? কোন কোন স্কুল হইতে শতকরা এক শত ছাত্র পাশ করিয়াছিল ; প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগেই প্রায় সকলে, তৃতীয় বিভাগে পাশের সংখ্যা অতি অল্প। কোন কোন রসিক লোক রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—'অমুক স্কুলে চেয়ার-বেঞ্চিগুলা পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছে, আর তোমরা ফেল ? আবার সকলেই ইংরাজীতে ফেল !' আমাদের সহপাঠী সুরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাচনের (টেষ্ট) পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ১২০ সংখ্যার মধ্যে ৯৮ নং পাইয়াছিল—সেই সুরেনও ফেল !—কেহ কেহ বলিল, "তোমাদের ইংরাজীর কাগজগুলা মাঠে মারা গিয়াছে !" কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলাম না ! সেবার বিভিন্ন পল্লীর স্কুল হইতে যত ছাত্র এনট্রান্স পাশ করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তত অধিকসংখ্যক ছাত্র উক্ত শ্রেণীতে আর কখনও ভর্ত্তি হয় নাই ; তাহাদের অনেকের শিষ্টাচারবর্জ্জিত, অমার্জিত ব্যবহার ও রূঢ় প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের সুরসিক অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (খ্যাতনামা—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেঠা) তাহাদিগকে 'জুবিলি-বারবেরিয়ান্' বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু এই 'বর্ব্বর'গণের মধ্যে এরূপ রত্নও ছিলেন—যাঁহারা উত্তরকালে সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে প্রচুর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। নদীয়ার স্বনামধন্য পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (এখন অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, অবসর-প্রাপ্ত সহকারী ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনজজ লালবিহারী চট্টোপাধ্যায় এবং অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এই 'বর্ব্বর'দিগেরই দলভুক্ত ছিলেন !

যাহা হউক, জুবিলির বৎসরে এনট্রান্স ফেল হওয়ায়, বিশেষতঃ, ইংরাজী সাহিত্যে

অকৃতকার্য্য হইয়াছি শুনিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলাম। মেহেরপুর স্কুলের প্রতি বিরাগ জন্মিল। যে স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া ছয় জনের মধ্যে ছয় জনেই ইংরাজী সাহিত্যে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করে—সেই স্কুলে পুনঃপ্রবেশ করিয়া মা সরস্বতীর বন্দনা করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

আমার কাকা তখন মহিষাদল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার। মহিষাদলের প্রধান ম্যানেজার উমেশচন্দ্র মিত্র (স্বর্গীয় বিচারপতি সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দাদা) মহাশয়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে আমার কাকা এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মহিষাদল-রাজের এনট্রান্স স্কুলের প্রধান মুরুব্বী ও স্কুল-কমিটির 'প্রেসিডেন্ট' ছিলেন। কাকা আমাকে মহিষাদলে লইয়া গিয়া সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এই সময় ২৪ বৎসরের যে যুবক শিক্ষক মহিষাদল-স্কুলের হেড্ মাষ্টার-পদে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার প্রতিভার আকর্ষণ, চরিত্রের প্রভাব, শিক্ষাদানের প্রণালী আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না। তাঁহার নাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়; তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের এম্. এ, সুবিখ্যাত টনি সাহেবের প্রিয় ছাত্র; পাকা ইংরাজীওয়ালা। আমার কাকা তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "মাষ্টার মশায়, এই বাঁদরটা গতবার জুবিলির বছরেও ইংরেজীতে ফেল হয়েছে; এবার যাতে পাশ করতে পারে, আপনাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।"—অমৃতবাবু আমাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন, "ছোকরা intelligent আছে—কিন্তু ইংরাজীটা ভারী neglected হয়েছে: দেখা যাক্ চেষ্টা ক'রে!"

তাহার পর তাঁহার চেষ্টা আরম্ভ হইল; ওরে বাপ্ রে! সে কি ভীষণ চেষ্টা। যাহাকে বলে, 'বেঁধে মার!'—তাহাই।

মহিষাদলের রাজবাড়ীর পশ্চিম দেউড়ীর উপর দোতলায় চারিটি কক্ষ ছিল; তাহারই একটি কক্ষে অমৃতবাবুর ও আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি অমৃতবাবুর সহবাসী হইলাম। দিবারাত্রি মাষ্টার মহাশয়ের সহিত একত্র বাস; আর তাঁহার কি কঠোর শাসন! আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার স্নেহমধুর ব্যবহার জীবনে ভুলিতে পারিব না। অমৃতবাবুকে দীর্ঘকাল এই স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতে হয় নাই। অল্পদিন পরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যখন রাণাঘাটের সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার হইলেন, তখন আমার আশা হইল, তিনি নদীয়ায় আসিয়াছেন, হয় ত তাঁহাকে মেহেরপুরে বদলী হইতে দেখিব; কোন দিন তিনি মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইতেও পারেন; কিন্তু আমার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি আমাকে না ভুলিলেও গুরুশিষ্যে আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি যোগ্যতাবলে অল্পদিনেই উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বাঁকুড়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় জীবন-মধ্যাহ্নে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহের কথা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষু অশ্রুভারে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠে আর মনে হয়, সেকালের আর একালের শিক্ষক ও ছাত্রে কি বিশাল ব্যবধান!—জানি না, এ কালে অমৃতবাবুর ন্যায় এ দেশে কয়জন আছেন।

(৮)

সে আজ ৪৫ বৎসরের কথা, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর পরবৎসর আমরা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার গোষ্পদ পার হইলাম। কাকা হেড মাষ্টার অমৃতবাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে অমৃতবাবু বলিলেন, "না মশায়, আমি খুসী হ'তে পারি নি, যদি

একটা স্কলারসিপ আদায় ক'রে দিতে পারতাম, তা হ'লে আমার পরিশ্রমটা সার্থক হ'তো। কিন্তু গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার কথা শোনা যায় মানুষ করা যায়—এ কথা শুনি নি।"—অযোগ্য ছাত্র হইলেও আমি কোন দিন তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হই নাই—যদিও কোন দিন তাঁহার মৌখিক স্নেহের কোন পরিচয় পাই নাই। তাঁহার সহাস্য প্রসন্ন মুখ, তাঁহার কোমল দৃষ্টি, তাঁহার উদার হৃদয়ের গভীর স্নেহ পরিব্যক্ত করিত। তিনি বলিতেন, "মুখের কথায় নয়, কার্য্যে তোমার সামর্থ্যের পরিচয় দাও।"—তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আজীবন এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সে সময় বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই; বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনেরও তখন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে সকালে সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেশনে নামিতাম, তাহার পর সেখানে ষ্টীমারে চাপিয়া বেলা বারোটার সময় গেঁওখালী ষ্টেশনের জেটিতে নামিতে হইত। তাহার পর কিছু দূর ঘুরিয়া গেওঁখালীর খালের ভিতর বোটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এই খালটি 'হিজলী খাল' নামে অভিহিত; সে কালে যাহারা তীর্থভ্রমণে উড়িষ্যা যাইত, তাহাদিগকে এই খাল দিয়াই ষ্টীমারযোগে গমনাগমন করিতে হইত। এই খাল মহিষাদলকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে, এক অংশে রাজবাড়ী, অন্য অংশে বাজার, স্কুল, বোর্ডিং, থানা, পোষ্ট আফিস, সবরেজিষ্ট্রি আফিস প্রভৃতি অবস্থিত। একটি সুপ্রশস্ত ও সমুন্নত সেতু দ্বারা এই উভয় অংশ সংযুক্ত। সেতুর পার্শ্বস্থিত খিলানের তলা দিয়া পথিকদের যাতায়াতের পথ আছে।

গেঁওখালীতে যে স্থানে খাল আরম্ভ হইয়াছে—সেই স্থানে লোহার দেউড়ি আছে, উহা বন্ধ থাকে। উহা খুলিয়া খালে জোয়ারের জল লওয়া হয; ভাটার সময় দেউড়ির বাহিরে জল অল্প থাকে, ডবল দেউড়ির সাহায্যে জল সমতল করিয়া লইয়া নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতি খালে প্রবিষ্ট হয়, এবং খাল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। খালের মুখেই টোল কালেক্টরের আফিস, তিনি নৌকাদি কুত করিয়া শুল্ক আদায় করেন। রাজবাড়ীর নৌকা খালের ভিতর থাকিত, এ জন্য আমাদিগকে ষ্টীমার হইতে নামিয়া খালের ধারে ধারে কিছু দূর হাঁটিয়া গিয়া রাজবাড়ীর বোটে উঠিতে হইত। প্রতিদিন সেই বোটে রাজবাড়ীর বাজার মহিষাদলে প্রেরিত হইত। এক জন আরদলী প্রত্যহ কলিকাতা হইতে বাজারের জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়া সেই বোটের সাহায্যে রাজবাড়ীতে পৌঁছিয়া দিত। এই বোটে আমরা বেলা একটা দেড়টার সময় মহিষাদল পৌঁছিতাম; বোটে চারি পাঁচ মাইল যাইতে হইত। সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ মহিষাদল হইতে পাল্কীযোগে গেঁওখালী আসিয়া ষ্টীমার ধরিতেন, রাজা বা রাজপরিবারস্থ মহিলাগণ কলিকাতায় আসিবার সময় মহিষাদলে রাজার নিজের ষ্টীমারে চাপিয়া নদীপথে আসিতেন। মহিষাদলের সেতুর নিকটেই বাজার; ষ্টীমার ও ভাউলিয়া নঙ্গরে আবদ্ধ থাকিত। মহিষাদলের রাজগণ পূর্ব্বে সরকার কর্ত্তৃক 'বাবু' নামে অভিহিত হইতেন; কলিকাতার ইডেন হষ্টেলের গৃহনির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা দান করায়, এবং নানা সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া তাঁহারা সরকারের নিকট 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। কলিকাতার ইডেন হষ্টেলের দোতলা নির্ম্মাণে তাঁহারা যে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন তাহা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপদেশেই প্রদত্ত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় মহিষাদল রাজপরিবারের হিতৈষী সুহৃদ্ ছিলেন, তাঁহার দাদা মাধবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় মহিষাদলেই বাস করিতেন, এবং রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ন্যায় উদারচেতা, অমায়িক, সরল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ কালে আর এক জনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া নবদ্বীপের সুবিখ্যাত 'বুনো রামনাথ'কে মনে পড়িত। তিনি

অপুত্রক ছিলেন, এ জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মহিমানাথকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিমানাথ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া সরকারের অহিফেন বিভাগে চাকরী লইয়াছিলেন এবং পরে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় ইডেন হিন্দু হষ্টেলের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু ; তিনি পূর্ব্বে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সহকারী ছিলেন।

এখন মহিষাদলে যাইতে হইলে বি এন রেলপথের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় ; শুনিয়াছি, এখন আর ডায়মণ্ডহারবারের পথে যাওয়া যায় না। বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও হয় না। মহিষাদলে উষায় ও সন্ধ্যায় প্রতি গৃহস্থ-গৃহে শঙ্খধ্বনি হইত। একসঙ্গে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিত। কথিত আছে, পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে আরতির সময় যে শঙ্খধ্বনি হইত, তাহা দূরবর্ত্তী গ্রামের মহিলাবর্গের কর্ণগোচর হইত, তাঁহারা তখন একযোগে শঙ্খ বাজাইতেন, সেই ধ্বনি দূর হইতে দূরান্তরে ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে মহিষাদলের গৃহস্থ মহিলাবর্গের কর্ণগোচর হইত, তাঁহারা তখন একযোগে শঙ্খধ্বনি করিতেন। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য, জানি না ; এবং এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে কি না, তাহাও আমার অজ্ঞাত ; কিন্তু মেদিনীপুরের কাঁথিপ্রান্তের সহিত উড়িষ্যার নিকট সম্বন্ধ। মহিষাদলের রথই এই সম্বন্ধের অন্যতর প্রমাণ ; মহিষাদলের রথযাত্রা ঐ অঞ্চলের একটি প্রধান উৎসব। কাঠের রথখানি যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ সুশোভন ইহা বহু মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহিষাদল-রাজের পারিবারিক বিগ্রহ গোপালজী রথে আরোহণ করিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী মাসী-বাড়ীতে গিয়া অষ্টাহকাল সেখানে বিশ্রাম করেন ; সেই সময় দেবগৃহ-প্রাঙ্গণে যাত্রা, গান প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইত। আমি যখন মহিষাদলে ছিলাম, সে সময় নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক স্বর্গীয় মতিলাল রায় কয়েক দিন সেই আসরে যাত্রাগান করিয়াছিলেন ; সাত দিন ধরিয়া সেখানে নানাপ্রকার আমোদের অনুষ্ঠান হইত।

আমাদের ন্যায় দরিদ্রের পরিবারে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্ময়ের কারণ নেই ; আমরা দু'বেলা উদর পূরিয়া খাইতে পাই না, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে বাধ্য হই, বৎসরের মধ্যে সাড়ে এগার মাস রোগে শয্যাগত থাকি, তাহার পর সুচিকিৎসার অভাবে নিরন্ন, অনাথ পরিজনবর্গকে শোকের ও দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিয়া কোটরগত দীপ্তিহীন চক্ষু চিরমুদিত করি। ইহাই আমাদের শোচনীয় দারিদ্র্যের ইতিহাস। গল্পে, গানে ইহারই এক এক টুকরা ভাসিয়া আসিয়া কিছুকালের জন্য সাহিত্যে স্থান লাভ করে। কিন্তু কমলার রত্নাঞ্চলের ছায়ায় প্রতিপালিত এই মহিষাদলে ছিলাম. তখন রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ সুস্থকায় বলবান্ যুবক। তাঁহার কোন পুত্র-কন্যা ছিল না ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গের দুই পুত্র ও কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন। সোনার সংসার ; বালক-বালিকাগণের কলহাস্যে রাজবাড়ী প্রতিধ্বনিত হইত ; রাণীজীদের জীবনযাত্রার আড়ম্বর কি বিলাসপূর্ণ ! শিশু রাজকুমারদ্বয় ও তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন স্বাস্থ্যে, রূপে, লাবণ্যে পূর্ণতা লাভ করিতেছিলেন। কুমার সতীপ্রসাদ ও কুমার গোপালপ্রসাদ রাজপরিবারের অলঙ্কার ছিলেন। সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাসে মহিষাদলের রাজপ্রাসাদ কানায় কানায় পূর্ণ ! আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম—কেহ নাই ; মহিষাদল রাজ-পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, শোকের তিমিরাবরণে সমগ্র প্রাসাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন ! কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছি—সেই সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতীত না হইতেই রাজমাতা, রাজকুমারী, সতীপ্রসাদ,

গোপালপ্রসাদ সকলেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ! জমীদারী এখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীন। বাঙ্গালার অধিকাংশ জমীদার-বংশেই কি বিধাতার অভিসম্পাত আছে ?—আমি যখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—সেই সময় মহাসমারোহে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের পিতার বিবাহ হইল ; ক্ষৌণীশচন্দ্রের জন্মোৎসবের কথা এখনও বেশ স্মরণ আছে। তাঁহার বিবাহের উৎসব-কোলাহল যেন এখনও কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; বাঙ্গালা গবর্মেন্টের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভের পূর্ব্বে ও পরে দুইবার তিনি মেহেরপুরে গিয়াছিলেন ; নদীয়ার মহারাজাকে দেখিবার জন্য বহু দূর হইতে বহু গ্রামবাসীর সমাগম হইয়াছিল, তাহাদের সেই ভক্তিপূর্ণ অভিবাদনের সমারোহ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, এত কাল বিদেশী আমলাতন্ত্রের শাসনাধীন থাকিয়াও তাহাদের হৃদয়-নিহিত রাজভক্তির ফল্গুপ্রবাহ বিলীন হয় নাই ! ইহা যেন আমাদের সহজাত সংস্কার। ভাবিয়া বিস্মিত হই—আমলাতন্ত্রের নায়কগণ কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে আমাদের হৃদয়-নিঃসৃত রাজভক্তির প্রবাহ অবরুদ্ধ করিতেছেন ! মহারাজ নদীয়াবাসীদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন ; এই জন্যে নদীয়ার জনসাধারণ তাঁহার অকালমৃত্যুর সংবাদে, নবযৌবনে লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহারাণীর বৈধব্যের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইয়াছিল। এ সকলই কয়েক বৎসরের মধ্যে চক্ষুর উপর দেখিলাম। এইরূপ শোকের দৃশ্য অবিরত দেখিতে পাইতেছি। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, আমরা এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, শোক-সন্তাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না ? ভগবান্ এক দিক্ ভাঙ্গিয়া অদৃশ্য হস্তে আর এক দিক্ গড়িয়া তুলিতেছেন, কিন্তু যাহাকে হারাইতেছি—তাহার মত আর কাহাকেও পাইতেছি কি ? তাই শোক-দুঃখে অসহ্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি—"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী ? রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা ?" হে মহাকাল, "কত চতুরানন মরি মরি যায়ত, নাহি তব আদি অবসানা !"

আমরা যে বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম, সে বৎসর জুবিলীর বৎসরের ন্যায় ছাত্রসংখ্যা অধিক না হইলেও অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। আমরা যেন ক্ষুদ্র সরোবর হইতে সমুদ্রে পড়িলাম। যখন এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিই—তখন আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের একখানিমাত্র কেতাব পাঠ্য ছিল, সেই একখানির স্থানে গদ্য পদ্য আটখানি গ্রন্থ ইংরাজী সাহিত্যে আমাদিগকে দিগ্‌গজ করিবার জন্য আমাদের বুদ্ধির উপর যেন দুরমুস্ ঠুকিতে লাগিল। কলেজের নবীন অধ্যক্ষ মিঃ এস সি হিল আমাদিগকে কবিতাগ্রন্থগুলি পড়াইতে লাগিলেন, এবং স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসু আমাদিগকে গদ্যপাঠ শিক্ষা দিতেন ; তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ; হিল সাহেব ও দেবেন্দ্র বাবু চমৎকার পড়াইতেন, এবং আমাদের সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি গম্ভীর ছিল, তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে এরূপ সরস রসিকতা করিতেন যে, আমরা সকলেই হাসির চোটে চক্ষু সজল করিতাম। আমাদের হাস্যোচ্ছ্বাসে কৌতুকপ্রিয় গম্ভীর অধ্যাপকের কালো গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত শুভ্র দন্তশ্রেণী দেখিতে পাইতাম। তিনি সময়ে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও আলোচনা করিতেন ; তখন হইতেই আমার বাঙ্গালা রচনার অভ্যাস ছিল এবং আমি সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষায় এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা তিনি জানিতেন। এই জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার সময় তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া সাধারণতঃ তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতেন। তিনি হেম বাবুর 'দশমহাবিদ্যা'র অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন এবং তাহার অধিকাংশ স্থল মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন। এক দিন 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামক একখানি সে

কালের কবিতা-পুস্তকের প্রসঙ্গ তুলিলেন। সে সময় স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী ও কামিনী সেন ভিন্ন অন্য কোন বঙ্গমহিলা কবিতা-রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, এবং পুরুষ ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও তখন নিতান্ত অল্প। বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যগৌরব শরৎচন্দ্রের তখন বোধ হয় পাঠ্যাবস্থা, সম্ভবতঃ তখন তিনি স্কুলের ছাত্র ; জলধরের ভ্রমণ-সাহিত্যও তখন বঙ্গসাহিত্য-তপোবন সুরচিত করিবার সুযোগলাভ করে নাই, তিনি তখন রাজবাড়ীর একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের নগণ্য শিক্ষক ও কুমারখালীর অলঙ্কারস্বরূপ কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার' লেখক। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' 'রাজর্ষি' প্রভৃতি দুই একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে ; বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় পূর্ণ গৌরবে বঙ্গ-সাহিত্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' তখন বন্ধ হইয়াছে এবং 'প্রচার' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' শিক্ষিতা বঙ্গনারীর প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হওয়ায় কাব্য-রসিকগণের মধ্যে একটু কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। আমাদের অধ্যাপক এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন আমাদিগকে বলিলেন, "বোধ হয়, কোন ভুবনমোহন ইহার লেখক।"—মনে হইতেছে, তাঁহার এইরূপ সন্দেহের কারণও তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

মিঃ লেন নামক একটি ফিরিঙ্গী অধ্যাপক আমাদিগকে অঙ্ক শিখাইতেন, এবং গোবিন্দ বাবু আমাদিগকে ত্রিকোণমিতি ও প্যারাবোলা হাইপরবোলা প্রভৃতি গণিতের জটিল বিষয় শিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যাকে আমি যমের মত ভয় করিতাম, এবং সুযোগ পাইলে গোবিন্দ বাবুর ক্লাস হইতে পলায়ন করিতাম। কিন্তু আমাদের সতীর্থ রাখালরাজ নানারকম উদ্ভট প্রশ্নে লেন সাহেব ও গোবিন্দ বাবুকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। রাখালরাজ আমাদেরই মেহেরপুর মহকুমার অধিবাসী, এবং আমাদের বাড়ীর কয়েক ক্রোশ দূরে তাঁহার বাড়ী বলিয়া তাঁহার সহিত অল্পদিনেই আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রাখালরাজকে অঙ্কশাস্ত্রে আমরা অসাধারণ পণ্ডিত মনে করিতাম ; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার তেমন অধিকার ছিল না। আমার মনে পড়িতেছে, বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে তিনি অধিক নম্বর না পাওয়ায় এক দিন দেবেন্দ্র বাবুকে বলেন, "আপনার, সার, কি রকম বিবেচনা ? হিল সাহেবের পোয়েট্রির পেপারে তিনি আমাকে ৩২ নম্বর দিলেন, আর আপনার 'প্রোজ' পেপারে পেলাম চার ?" দেবেন্দ্র বাবু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "তুমি যখন য়ুনিভারসিটির একজামিন দেবে—তখন পোয়েট্রির পেপারই লিখে দিও,—প্রোজটা বাদ দিও।"—কিন্তু এল এ পরীক্ষায় রাখালরাজকে অকৃতকার্য্য হইতে হয় নাই, গণিতশাস্ত্রে তিনি এরূপ অসাধারণ ছিলেন যে, কৃতিত্বের সহিত এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে তিনি অধ্যক্ষের পদও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এখন কৃষ্ণনগরের স্থায়ী অধিবাসী, এখন পেন্সনভোগ করিয়া কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ বিতাড়নরূপ পরোপকারসাধনে রত আছেন। শুনিয়াছি, অবসরকালে তিনি গো-সেবা করেন ; তাঁহার জীবনযাপনের প্রণালী সেকেলে অধ্যাপকের মতই অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বর-বর্জ্জিত। আমার এই সতীর্থের সহিত বহুকাল সাক্ষাৎ নাই। আমাদের অন্যান্য অধ্যাপকের মধ্যে বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি আমাদিগকে 'লজিক' শিখাইতেন ; আমরা অনেকে তাঁহার সহানুভূতিলাভের জন্য মধ্যে মধ্যে সায়ংকালে কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতাম, এবং চক্ষু মুদিত করিয়া ভক্তিপ্রকাশের অভিনয় করিতাম ; মধ্যে মধ্যে তিনি সংকীর্ত্তনের দলে যোগদান করিতেন, তখন আমরা তরুণ ভক্ত-(ভাক্ত ?) বৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া

উদ্দাম নৃত্য করিতাম, উভয় বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মুখব্যাদান করিয়া গাহিতাম—

"ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সজোরে বাজাও।"

এই সময় আমাদের বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমার পিতৃবন্ধু বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষিবৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করায় ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ লেবরেটারীতে আমাদিগকে বিজ্ঞান শিখাইতেন। এই সময় ফাগু সেখ নামক এক জন নিরক্ষর মুসলমান লেবরেটারীতে ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ফাগু এরূপ বহুদর্শী ছিল যে, ব্রজ বাবু কোন কোন রাসায়নিক 'এক্সপেরিমেণ্টে' অকৃতকার্য্য হইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলে ফাগু হাতে-কলমে তাহা দেখাইয়া দিত। সে সময় মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের পিতা যুবা পুরুষ; বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ থাকায় ব্রজলাল বাবু তাঁহার বিজ্ঞান-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'মহারাজ নন্দকুমার', 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় এই সময় কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ ছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি কামিনী সেন বি এ মহাশয়ার পিতা। কামিনী সেন মহাশয়া তখনও কুমারী; কিন্তু তখন তাঁহার 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ের অনেক দিন পরে ডিষ্ট্রিক্ট জজ কেদারনাথ রায় মহাশয় পত্নী-বিয়োগের পর দ্বিতীয়পক্ষে তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই সময় হইতে তিনি সাহিত্য-সমাজে শ্রীমতী কামিনী রায় নামেই পরিচিতা।

চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন; তিনি হিন্দু-সমাজকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, ইহার কোন প্রমাণ কেহ কোন দিন পাইয়াছিলেন কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল; এই সময় তিনি একটি দেওয়ানী মামলার রায়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে লিখিয়াছিলেন, হিন্দু বিধবাদের শতকরা নিরনব্বুই জন অসতী! তাঁহার এই 'রায়' পাঠ করিয়া হিন্দুগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; সাময়িক পত্রাদিতে তীব্র মন্তব্য সহ তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু তাঁহার এই অশ্রদ্ধেয় ও অসত্য বাণী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; কোন কোন অসহিষ্ণু হিন্দু যুবক দলবদ্ধভাবে প্রকাশ্যে তাঁহার কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়াছিল; এমন কি, গম্ভীরপ্রকৃতি ধীর স্থির বঙ্কিমচন্দ্রেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, সেই বিশাল সমুদ্রও আলোড়িত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময় 'প্রচার' প্রকাশিত হইতেছিল। 'প্রচারের' সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিম বাবুর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু বঙ্কিম বাবুই 'প্রচারের' প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং গীতার সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রচারেই প্রকাশিত হইতেছিল। বঙ্কিমবাবু হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহা ব্রাহ্মগণের মনঃপূত হয় নাই; এজন্য বঙ্কিম বাবু আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কোন কোন পরিচালক কর্ত্তৃক কঠোর ভাষায় তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, কবিবর রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা সকলের শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার পরম বন্ধু পূত-চরিত্র রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও সেই দলে ছিলেন; অবশেষে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকের আসনে বসিয়া তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু আত্মসমর্থনের জন্য 'প্রচারে' যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা যেন 'কামারের এক ঘা!' তাহাতেই তাঁহার প্রতিপক্ষকে নীরব হইতে হইয়াছিল। এই সকল কারণে নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 'প্রচারের' প্রচার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। 'প্রচারের' শেষ অংশে সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা থাকিত; তাহাতে লেখকের নাম না থাকিলেও বঙ্কিমবাবুর নিক্ষিপ্ত নির্ম্মম বজ্রের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিত না। মুন্সেফ চণ্ডীচরণবাবুর অসংযত

লেখনী হইতে হিন্দু-বিধবাগণের সম্মানহানিকর ও ঐরূপ লজ্জাজনক মর্ম্মান্তিক উক্তি প্রকাশিত হইলে, চারিদিক হইতে যখন তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারের' এক সংখ্যায় চণ্ডীচরণবাবুর প্রসঙ্গে একটি 'প্যারা' লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন লেখকের লেখনীমুখে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা তখন তরুণ যুবক, বিশেষতঃ বহুকালের কথা, ঠিক স্মরণ নাই, তবে তিনি চণ্ডীচরণ বাবুর উক্তি সম্বন্ধে কোনরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এতকাল পরেও ভুলিতে পারি নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দুবিধবাদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বই জন অসতী। চণ্ডীচরণ বাবুর উক্তি শুনিয়া একটি গল্প মনে পড়িল। একবার এক গুরুঠাকুর শিষ্যবাড়ী গিয়াছিলেন, শিষ্য গুরুদেবের সেবার জন্য বড় বড় পাঁচটি কৈ-মাছ আনিয়া দিল ; শিষ্যের আশা, গুরুদেব কিছু আহার করিয়া শিষ্যের জন্য প্রসাদস্বরূপ কয়েকটি রাখিয়া দিবেন ; কিন্তু সেই অমৃতোপম কৈ-মাছগুলি গুরুদেবের এতই মুখরোচক হইয়াছিল যে, তিনি প্রসাদ রাখিবার কথা ভুলিয়া একে একে চারিটি কৈ নিঃশেষিত করিলেন ; সেই সময় প্রসাদের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি অবশিষ্ট কৈ-মাছটি রাখিয়া দিলেন, সেটির আর মুণ্ডপাত করিলেন না। গুরুদেব চারিটি কৈ-মাছ ভক্ষণ করায় শিষ্যের গুরুভক্তি চটিয়া গিয়াছিল ; তাঁহাকে একটি রাখিতে দেখিয়া সে বলিল, 'আপনি যখন চারিটাই সেবা করিতে পারিলেন, তখন ওটা আর রাখিলেন কেন, ওটারও মুণ্ডপাত করুন।' আমরাও চণ্ডীচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি যখন নিরেনব্বুইটি হিন্দুবিধবার মুণ্ডপাত করিলেন, তখন অবশিষ্ট একটি বাকী রাখিলেন কেন ?—চণ্ডীচরণ বাবু সম্ভবতঃ এই প্যারাটি পাঠ করিয়াছিলেন ; কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হওয়া ভিন্ন তাঁহার উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল কিনা, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর।

আমাদের সঙ্গে যাঁহারা কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে কর্ম্মজীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সতীর্থ শ্রীযুক্ত রাখালরাজ বিশ্বাসের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরও দুই জনের নাম এখনও স্মরণ আছে, তাঁহাদের এক জন দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ পাশ করিয়া তিনি ভারত গবর্ণমেন্টের হিসাব বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং চির-অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে সেই বিভাগের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এন্ট্রেন্সে তিনি পনের টাকার বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তিনি স্বল্পভাষী গম্ভীরপ্রকৃতি এবং পাঠানুরাগী ছাত্র ছলেন, আমরা 'ব্যাড্ বয়ের' দল তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে সাহস করিতাম না, তিনিও আমাদের সঙ্গে সে ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতেন না ; এ জন্য মনে হইত, তিনি আমাদিগকে কৃপার-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, কিন্তু হয় ত আমাদের এ অনুমান সত্য নহে। এই সময় হইতে আমি মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী'তে কিছু কিছু লিখিতাম। ইহার কিছুদিন পরে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে 'সাধনা' প্রকাশিত হইলে আমার রচিত 'পল্লীচিত্র'গুলি তাহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আমার সতীর্থগণের মধ্যে রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তিনিও সেই সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। কলেজের ছুটীর পর আমরা উভয়ে একত্রে বাসায় ফিরিতাম। আমি নিজের পাড়ার ভিতর দিয়া আমীন-বাজারের বাসায় যাইতাম, তিনি আরও দূরে তাঁহার বাড়ী ফিরিতেন। তিনি বলিতেন, সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ থাকিলেও শক্তি নাই ; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গভাষায় তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের আত্মীয় ছিলেন এবং মহারাজা ক্ষৌণিশচন্দ্রের বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগদানন্দ বাবু কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বোলপুরের আশ্রমে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায়, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; তিনি আমাদের সমবয়স্ক ছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের বাহিরেও আমার দুই একটি বন্ধুলাভ হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয় অতুলচন্দ্র বসু আমার স্নেহাস্পদ সুহৃদ ছিলেন ; মিঃ ঘোষের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন হইত, আমরা মহানন্দে সেই কীর্ত্তন শুনিতাম।

"চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর!"

মৃদঙ্গধ্বনির সহিত কীর্ত্তনীয়ার সেই মধুর কণ্ঠধ্বনি এখনও যেন কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মিঃ ঘোষের একমাত্র পুত্র 'লিং' অর্থাৎ মিঃ মহীমোহন ঘোষ তখন লণ্ডনে ছিলেন, সিভিলসার্ব্বিসের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন ; পরে তিনি সিভিলসার্ব্বিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাদ্রাজে চাকরী পাইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার ইহজীবনের অবসান হয়। অতুলচন্দ্রও পরে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। মিঃ ঘোষের দুই ভাগিনেয়ী বিনয়কুমারী বসু ও প্রমীলা বসু চমৎকার কবিতা লিখিতেন ; তাঁহাদের দেখাদেখি আমিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি, আমার কোন কোন কবিতা সেকালের মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু আমি আমার কবিতায় ভাব ও কবিত্বের দৈন্য বুঝিতে পারিতাম, এজন্য কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিই। তথাপি কবি ভগিনীদ্বয় সে সময় কবিতা-রচনায় আমাকে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অল্পদিন পরেই প্রমীলার মৃত্যু হয় এবং ডাক্তার ভারতচন্দ্র ধরের সহিত বিনয়কুমারীর বিবাহ হয়, এই বিবাহের পর হইতে তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

অনেক বিলাত-ফেরতের পরিবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে, যাঁহারা সাহেবীয়ানার ভক্ত, বিলাতী প্রথায় জীবনযাপন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ তেমন দীর্ঘজীবী হইতে পারেন না এবং তামহাদের বংশও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণনগরে মিঃ মনোমোহন ঘোষের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আমাদের বাল্যকালেই নির্ম্মিত হইল, এই কয়েক বৎসরেই তাহা হইতে তাঁহার বংশের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত ; এখন তাহা ভাড়াটে বাড়ীতে পরিণত! তিনি ও তাঁহার সহোদর মিঃ লালমোহন ঘোষ উভয়েই উল্কার ন্যায় আবির্ভূত হইয়া তীব্র জ্যোতিতে তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণের নয়ন ধাঁধিয়া দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন ; অনাগত ভবিষ্যৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের গৌরবস্মৃতি বহন করিবে, কিন্তু তাঁহাদের বংশতরু অদৃশ্য। মাইকেল মধুসূদন, মহাপ্রাণ তারকনাথ পালিত, ডাক্তার আর এল দত্ত প্রভৃতি অনেকের সম্বন্ধেই এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয়, তবে ব্যতিক্রম না আছে, এমন কথা বলা যায় না।

দুই বৎসর কৃষ্ণনগরে বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল ; কিন্তু সাহিত্যালোচনার উৎসাহে কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি অনুরাগ শিথিল হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'ত্রিকোণমিতি' ও 'কনিকসেকসনের' সহিত আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ থাকায় অঙ্কশাস্ত্রে পাশের নম্বর রাখিতে পারিলাম না। কাকা রাগ করিয়া বলিলেন, "আঁকে তুই গোমুখ্‌খু, কল্‌কাতার জেনারেল

এসেম্লিজ ইনষ্টিটিউসনে গৌরীশঙ্কর বাবু খুব ভাল আঁক শেখান, সেখানে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনা কর। লেখা-লেখিগুলো বন্ধ কর।"—কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যালোচনা বাড়িয়া গেল, পড়াশুনার সুবিধা হইল না ; তখন মহিষাদলে গিয়া স্কুলের মাষ্টারী কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওযাই স্থির হইল। সুতরাং মহিষাদলে উপস্থিত হইয়া পুনর্মূষিক হইলাম। সেখানে একটু কৌশল করিয়া সাহিত্য-জীবনের এক জন হিতৈষী সঙ্গী সংগ্রহ করিলাম ; তিনি আমার 'মাষ্টার মশায়' এবং বহু যুবকের 'জলদা।'—ইনিই এখন সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, 'ভারতবর্ষ'—সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন। তাঁহার সহিত সাহিত্য-জীবনে আমার মিলনের কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অনেকেরই মনে হইবে, তাহা উপন্যাস!

(৯)

আমাদের নদীয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই সাহিত্যালোচনার জন্য বিখ্যাত। মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্র, এবং ভারতচন্দ্র হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত কত সাধক, কবি, প্রবন্ধ-লেখক, সাহিত্যসাধনায় নদীয়াকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কেবল সাহিত্য নহে, ধর্ম্মতত্ত্ব, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বের আলোচনায় নদীয়ার অনেক বিজ্ঞ লেখক জ্ঞানভাণ্ডারে বিপুল সম্পদ্ সঞ্চিত রাখিয়াছেন। নবদ্বীপ এক দিন বহু পণ্ডিতের লীলাক্ষেত্র ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য এক দিন কিরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, বৈষ্ণবসাহিত্য কিরূপ গৌরবান্বিত আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা সকলেরই সুবিদিত। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরে বঙ্গ-সাহিত্যের লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল না। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দেওয়ানশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী, উলার স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতির নাম বঙ্গ-সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজিত থাকিবে। লালন ফকিরের রচিত পদগুলি অপূর্ব্ব ভাবসম্পদে পূর্ণ। কুমারখালীর অলঙ্কার কাঙাল হরিনাথ বঙ্গভারতীর বরপুত্রগণের অন্যতম ছিলেন ; তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে, এবং তাহা ভক্তিপিপাসু নর-নারীবর্গের হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দরসে আপ্লুত করিতেছে। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র সি আই ই এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন বঙ্গ-সাহিত্যের যশস্বী বক্তা ও সুলেখক। স্বর্গীয় অক্ষয় বাবু চিরদিনই বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণের শীর্ষস্থানে বিরাজিত থাকিবেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকটেও বঙ্গ-সাহিত্য অল্প ঋণী নহে ; তাঁহার যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ বাবুর কবিত্ব-সৌরভে এখনও রাণাঘাট সৌরভাকুল। সুকবি করুণানিধানের বীণার মধুর ঝঙ্কারে শান্তিপুর এখনও মুখরিত। শ্রদ্ধেয় রাজেশেখর, গিরীন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর বাবুর যোগ্যপুত্র ; বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাদের দান অল্প নহে।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় 'রসসাগর' নামে পরিচিত ছিলেন ; তিনি নদীয়ার মহারাজা গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন। আমাদের মেহেরপুরের সন্নিহিত বাড়িবেঁকা (চলিত নাম বুড়িপোতা) গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; মুখে মুখে পদ-রচনার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর রসসাগরের রচিত কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, এজন্য আমরা নদীয়াবাসিগণ উদ্ভটসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। পুরাণ, ইতিহাস, প্রবাদবাক্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া

কেহ কোন কবিতার একটি চরণ বলিলেই 'রসসাগর' সুন্দর অর্থ ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ সুসঙ্গত কবিতা মুখে মুখে তখনই রচনা করিতেন। তাঁহার পাদ-পূরণের শক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল—এখানে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—
কৃষ্ণনগর রাজসভায় এক দিন সভাপণ্ডিত রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে!"

সভাসদগণ প্রশ্ন শুনিয়াই স্তম্ভিত। কিন্তু রসসাগর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা না করিয়া বলিলেন,—

"জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা পড়ে মনে।
তপনে ঢাকিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে ॥
আকাশে উদয় নিশি উভয়ে না জানে।
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে ॥"

প্রশ্ন হইল,— "অমাবস্যা গেল, আবার পৌর্ণমাসী এল।"

উত্তর— "হা রে নিদারুণ বিধি, কত খেলা খেল।
সংসারে যন্ত্রণা যত, হাভাতের ঘাড়ে ফেল ॥
বেতো রোগী কেঁদে বলে, কোন্ দিন বা ভাল ?
অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।"

প্রশ্ন— "শমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী ?"

উত্তর— "শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়েন রণভূমি।
কাঁদেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী ॥
শিক্ষা-দীক্ষা-বিবাহে সবার আগে আমি,
শমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী ?"

রসসাগরের রচিত কবিতাগুলিতে মাধুর্য্যের অভাব ছিল না।

এইরূপ পদ তিনি রচনা করিয়াছিলেন ; উদ্ভটসাগর যেগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংখ্যায় তেমন অধিক নহে। স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর বংশধররা বুড়িপোতায় বাস করিতেন ; আমার সহপাঠী স্বর্গীয় হেমন্তকুমার ভাদুড়ী তাঁহার প্রপ্রৌত্র বা ঐরূপ কেহ হইতেন। বাল্যকালে মেহেরপুরের মাইনর স্কুলে হেমন্ত আমার সতীর্থ ছিলেন। আমরা যখন মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় হেমন্ত আমাকে একখানি বৃহৎ খাতা দিয়াছিলেন ; খাতাখানিতে রসসাগরের রচিত প্রায় দুই শত কবিতা ছিল। শুনিয়াছিলাম, খাতাখানি রসসাগরের স্বহস্তলিখিত। সেই খাতাখানি আমার নিকট হইতে কে লইয়াছিল, স্মরণ নাই, কিন্তু আর তাহা ফেরত পাওয়া যায় নাই। খাতাখানি নষ্ট না হইলে রসসাগরের রচিত সকল কবিতাই এ কালে আমরা পাঠ করিতে পাইতাম। এই ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। সেই খাতায় অনেক উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর ছিল ; দুই একটি প্রশ্ন এই পঞ্চান্ন বৎসর পরেও স্মরণ আছে, যথা—

'গগনমণ্ডলে শিবা ডাকে হুয়া হুয়া।'
"জাঙ্গাল ব'য়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি।"
"ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মার্গে ক্ষুদের পোরো।"

এই প্রশ্নগুলি মনে আছে, কিন্তু রসসাগরের উত্তর স্মরণ নাই।

সেকালে বারোয়ারিতলায় যেমন যাত্রাগান হইত, তেমনই কবিও হইত। কবির দলের লড়াই সাহিত্য হিসাবেও উপভোগ্য ছিল। কবি বলিলে একালে যেমন অশ্লীল আদিরসের ছড়া বুঝায়, সেকালে কবির গানে সেরূপ কিছু থাকিলেও আমরা গ্রাম্য বারোয়ারিতলায় যে কবি শুনিয়াছি, তাহা বড় মধুর বোধ হইত। এণ্টনী সাহেব সে কালে এক জন বড় কবিওয়ালা ছিলেন। আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ; কিন্তু আমাদের বাল্যকালে কবির দলের এক জন গায়ক বারোয়ারিতলায় এণ্টনী সাহেবের রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন, তাহা এমন মিষ্ট লাগিয়াছিল যে, এত কাল পরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই ; গানটি একালে শুনিতে পাই না, এই জন্য এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সে কালের স্মৃতির হিসাবে ইহা সংরক্ষণযোগ্য,—

> "কহ সখি কিছু প্রেমের কথা।
> ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥
> করিলে শ্রবণ, হয় দিব্য জ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা,
> আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে, প্রীতিপ্রয়াগে মুড়াব মাথা।
> আমি রসিকের স্থানে, পেয়েছি সন্ধানে,
> তুমি না কি জান প্রেম-বারতা।
> কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা॥
> কোন্ প্রেম লাগি, নারদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে।
> কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে, ভাগীরথী আনে ভারত-ভূমে॥
> কোন্ প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী, গেল মধুপুরী, ক'রে অনাথা।
> কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা॥"

কেহ কেহ বলেন, ইহা রাসু নৃসিংহের রচনা ; কিন্তু বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ফিরিঙ্গী হইলেও এণ্টনী সাহেবই ইহা রচনা করিয়া কোন মজলিসে ইহা গাহিয়াছিলেন। এ কালে কোন কবির কণ্ঠে এরূপ মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইবে না, সে যুগ আর বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিবে না। তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কালের দিক ফিরিয়া চাহিতেছি। সে কালে দাশরথি রায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠের যাত্রা সকল শ্রেণীর শ্রোতার হৃদয়ে যেরূপ প্রভাবিস্তার করিত, এ কালের কোন যাত্রাওয়ালার সে শক্তি নাই। এ কালের যাত্রাওয়ালারা তাহাদের যাত্রাগঠনে থিয়েটারের ও অপেরার অনুসরণ করিতেছে। শ্রোতার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্রেকের চেষ্টা নাই, তাহার সে শক্তিও নাই। গোবিন্দ অধিকারী, মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যাত্রাদলের অধিকারীরা ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, সাধক বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি ছিল, এবং পালা গাহিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। কোন পালা শেষ করিয়া তাঁহারা শ্রোতৃবর্গকে আমোদিত করিবার জন্য যে সঙ দিতেন, তাহাতে স্থূল রসিকতা থাকিত এবং গানে ও বক্তৃতায় শ্লীলতার অভাবও লক্ষিত হইত ; কিন্তু সাময়িক কোন সামাজিক আন্দোলনের বিষয় অবলম্বন করিয়া সঙের অবতারণ হইত ; ব্যক্তিবিশেষের দুর্নীতি বা ভণ্ডামীকে তাঁহারা অতি কঠোরভাবে আক্রমণ করিতেন। আমাদের বয়স যখন দশ বারো বৎসর—সেই সময় মেহেরপুর মিউনিসিপালিটির আফিসের সম্মুখে এক দিন যাত্রাগান হইয়াছিল ; কাহার দল স্মরণ নাই। যাত্রা শেষ হইলে তাঁহারা

"মোহান্তের এই কি কাজ?" নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় করিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের দুশ্চরিত্র ভণ্ড মোহান্ত মাধবগিরির কঠোর কারাদণ্ড অবলম্বন করিয়া সেই প্রহসনখানি রচিত হইয়াছিল। মোহান্ত কারাপ্রাঙ্গণে ঘানি টানিয়া তেল বাহির করিতেছে—একটি গানে সেই ভাবের একটি বর্ণনা ছিল। সেই গানটি এখনও আমার স্মরণ আছে,—

"মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে, টাক ধরে না চুলে,
কানায় চোখে দেখ্‌তে পায় ॥
ও যে বিলাতী ঘানী, নূতন আমদানী,
শিবের ষাঁড় জুড়েছে, তেলে ভোলে কামিনী :—
হয়েছে ল্যাজে গোবরে ধর্ম্মের এঁড়ে,
কখন্ কি দায় ঘটায় ॥"

স্থূল রসিকতা বটে, এ কালের ডাক্তারদের হাতের বিস্ফোটক বিদীর্ণ করিবার তীক্ষ্ণধার ছুরী নয়, নারী-নির্যাতিকের মাথা ফাটাইবার উপযোগী পাকা বাঁশের নাদ্‌না। এ কালের নারীধর্ষণের যুগে এই সেকেলে নাদনার কথা আমাদের মত অনেক বৃদ্ধেরই মনে পড়িবে।

আমরা যখন নয় দশ বৎসরের বালক, সেই সময় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল একবার মেহেরপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স সতের আঠার বৎসর। সেইবার তিনি এফ এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার বড় দাদা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল রায় তখন মেহেরপুরের স্মলকজ কোর্টের হেড্ ক্লার্ক। ভৈরব-তীরে থানার দক্ষিণাংশে মুখুয্যে বাবুদের নিভৃত বাংলোর রাজেন্দ্র বাবু সপরিবার বাস করিতেন। তাঁহার বাংলো একটি বাগানের ভিতর অবস্থিত ছিল। বাগানে নারকেলী কুল, লীচু ও ডাবের গাছ ছিল ; অনেকগুলি পলাশ ও কাঞ্চন ফুলেরও গাছ ছিল। শীতকালে লাল কাঞ্চন ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিত। আমরা সরস্বতী-পূজার সময় সেই বাগান হইতে পলাশ ও কাঞ্চন ফুল সংগ্রহ করিতাম।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু সেই প্রথম যৌবন হইতেই কবি। মেহেরপুরে বেড়াইতে গিয়া তিনি এক দিন স্কুল-গৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল, "কবিতা।"—আমরা ছেলের দল তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দশ বৎসরের ছেলে, সেই বক্তৃতার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে মনে আছে, সুখেন্দ্রলালের পাশে বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ঘন ঘন করতালি দিয়াছিলাম। সুখেন্দ্র রাজেন্দ্র বাবুর বড় ছেলে, সুখেন্দ্রের ছোট ভাই ছিলেন নৃপেন্দ্র। সুখেন্দ্রের ছোট ভাই বলিয়া আমি নিপুকে ভাই-এর মত ভালবাসিতাম। সুখেন্দ্র আমার বন্ধু ছিলেন ; কিশোর-বয়সের সেই ভালবাসার তুলনা নাই। সুখেন্দ্র আমাদের বাড়ী আসিলে আমি স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম। সুখেন্দ্রের মত রূপবান বালক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি ; সুখেন্দ্র প্রথম-যৌবনেই আমাদের ত্যাগ করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফুল ফুটিল না, কোরকেই ঝরিয়া পড়িল। জীবনে বহু শোক পাইয়াছি ; কিন্তু বন্ধুবিয়োগ-শোক সেই প্রথম। নিপু মেহেরপুরে দীর্ঘকাল ছিলেন না। তিনি মেহেরপুর ত্যাগ করিবার পর আর কখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। রাজেন্দ্র বাবু কৃষ্ণনগরের রাজ-দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। দেওয়ানজী কিরূপ সুপুরুষ ছিলেন, তাহা হাস্যরসিক নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের দুই ছত্র কবিতাতেই প্রকাশ। দীনবন্ধু লিখিয়াছিলেন—

"যদবধি হাঁদা পেট হেরেছি নয়নে
কার্ত্তিকেয় পূর্ণচন্দ্র নাহি ধরে মনে।"

জলধরকে লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় মালতী এ কথা বলিয়াছিল। এ সেই হোঁদল-কুৎকুতের মালতী, যাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া জগদম্বার জলধর ভুঁড়ি দুলাইয়া বলিয়াছিল,—

"মালতী মালতী মালতী ফুল,
মজালে মজালে মজালে কুল!"

রাজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সকলেই সুপুরুষ ছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু মহৎপ্রকৃতির ভদ্রলোক ছিলেন, তবে তিনি সাধারণের সঙ্গে তেমন মিশামিশি করিতেন না। কিন্তু তাঁহার আর এক ভাই নরেন্দ্র বাবু আমাদের স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গেই মিশিতেন। ইঁহারা নদীয়ার আদর্শ পরিবারবর্গের অন্যতম ছিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর একটি কন্যাও মেহেরপুরে থাকিতেন; সুবিখ্যাত একাউন্টেন্ট জেনারেল উপেন্দ্রলাল মজুমদারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবু পেন্সন লইবার পর মেহেরপুর ত্যাগ করেন। তিনি মেহেরপুরে থাকিতে জ্ঞানেন্দ্র বাবু একবার মেহেরপুরে গিয়াছিলেন, তখন তিনি যুবাপুরুষ। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এই ঘটনার বহু দিন পরে 'পতাকা' নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন। 'পতাকা' উচ্চশ্রেণীর সাপ্তাহিক ছিল; পরে 'সুরভি' নামক সাপ্তাহিকের সহিত মিলিত হইলে উহার নাম হইয়াছি, "সুরভি ও পতাকা।"

দুই বৎসর কৃষ্ণনগরে বাস করিয়া কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কৃষ্ণনগরে জীবনের দিনগুলি কি সুখেই কাটিয়াছিল; সে কথা স্মরণ হইলে এখনও বুকের ভিতর টন্‌টন্ করে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে বসন্তকুমার দত্ত মোক্তারী পাশ করিয়া কৃষ্ণনগরে মোক্তার হইয়াছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমি অবসরকালে আমার বন্ধু জগদানন্দ রায়ের বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম; সেখানে আমাদের সাহিত্যালোচনা হইত। জগদানন্দ সেদিন বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বোলপুরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, বন্ধুর সহিত এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইল না। কৃষ্ণনগরের (সেই সময়ের) ডিষ্ট্রিক্ট এন্‌জিনিয়ার রায় দ্বারিকনাথ সরকার বাহাদুর কাঁটাল-পোঁতার বাসায় বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র যোগীন্দ্রনাথ আমার সতীর্থ ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মনের মিল হওয়ায় উভয়েই বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। ছুটীর দিন আমি তাঁহাদের কাঁটালপোঁতার বাসায় গিয়া নানা গল্পে দীর্ঘকাল কাটাইয়া আসিতাম। যোগীন্দ্র পরে এম এ বি এল পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি বেহারে চাকরী করিতেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ডেপুটি হইয়া তিনি দুই একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণনগরে আমার সতীর্থগণের মধ্যে আর এক জনের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহার নাম অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; তিনিও নদীয়াবাসী ছিলেন। তিনি এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় দশ টাকার বৃত্তি পাইয়া আমাদের সঙ্গে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল; তাঁহার ন্যায় বিনয়ী ছাত্র আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি পাঠ্যাবস্থায় স্বর্গীয় বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জয়পত্রালাভের পর শিক্ষা-বিভাগে

প্রবেশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কলেজের বাহিরে স্বর্গীয় মিঃ মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয় অতুল বসুকে প্রীতিভাজন বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলাম ; সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতুলের ছোট ভাই অরুণ তখন বালক ; এ জন্য তাঁহার সহিত আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। অরুণ পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরের সহিত আমার দুই পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত। আমার পিতৃদেব একখানি খাতায় 'অকিঞ্চনের মনের কথা' নাম দিয়া সে-কালের অনেক ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন—যখন তাঁহার যৌবনকাল, সেই সময় কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল উইলিয়ম (কি উইলসন, ঠিক স্মরণ নাই) সাহেবের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণনগরেই তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছিল। কলেজের বহু ছাত্র সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত শবের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই পিতৃদেবের বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে শবের অনুসরণ করেন। সেই সময় তাঁহার প্রিয় বন্ধু কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে সময়োপযোগী একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতে অনুরোধ করেন ; পিতৃদেব নিজের শক্তির অভাবের কথা জানিতেন, তথাপি বন্ধুবর্গের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া যে করুণ সঙ্গীতটি রচনা করিয়া শ্মশানবন্ধুগণের সহিত মিলিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেই খাতায় সন্নিবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। সেই গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

১

"আজ সাঙ্গ তব বিদ্যাদান !
আসিছে আঁধার রাতি, নিবেছে প্রাণের বাতি,
এখন তোমার উঠবে কথা নানা জাতি, সে সব মাত্র অনুমান ॥

২

হ'ল জীবনের অবসান।
আর না ফিরিবে তুমি, তব প্রিয় জন্মভূমি,
কে তব সমাধি চুমি গাহিবে খেদের গান ॥

৩

এই ত জীবনের অভিমান !
যাব জান্‌ছি তোমার পিছে পিছে,
তবু মনের ভ্রম ঘোচে না ;
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ভুলে আছি ভগবান ॥"

জানি না, সে কত কালের কথা। কিন্তু এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে মিঃ ই লেথব্রীজ কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। ইনিই স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ সরকার মহাশয়ের 'ফার্ষ্ট বুক' 'সেকেণ্ড বুক' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির পরিবর্ত্তিত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এবং পরে স্বদেশীয় কোন আত্মীয়ের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সার

রোপার লেথব্রীজ হইয়াছিলেন। আমি যেমন শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার কাকাও সেইরূপ লেথব্রীজ সাহেবকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। লেথব্রীজ সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি বড় মজার কথা শুনিয়াছিলাম ; সত্য কি না, বলিতে পারি না। শুনিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষা হইতে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদের একটি প্রশ্ন ছিল—"রাজা বিক্রমাদিত্যের দুই মহিষী ছিল।" সাহেব অনুবাদে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ,—"রাজা বিক্রমাদিত্যের দুইটি 'মাদী মহিষ' ছিল !" ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, কোন বাঙ্গালানবীশ সাহেব 'that remarkable lady'র অনুবাদে লিখিয়াছিলেন, "ঐ মন্তব্যা মহিলা।" এমন কি, যে বিদুষী ইংরাজ-মহিলা বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের অনুবাদ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন, এবং বহু ইংরাজী পত্রিকায় যাঁহার অনুবাদের অজস্র প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি 'গোপলা উড়ের যাত্রা'র অনুবাদ করিয়াছিলেন 'journey of flying Gopal !' অথচ রো সাহেব যখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ, সেই সময় তিনি কলেজের ছেলেদের 'বাবু ইংলিসের' ভুল ধরিয়া কতই ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করিয়াছেন! তথাপি প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ হইতে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষায় যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন, অধ্যাপক রো'র ন্যায় কয় জন ইংরাজ তাঁহাদের সমকক্ষ ?

লেথব্রীজ সাহেব শিক্ষক ছিলেন ; তাঁহার নীতির আদর্শ কিরূপ উচ্চ ছিল, সে সম্বন্ধে কাকার কাছে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, এ কালের ইংরাজদের আবহাওয়ায় বাস করিয়া গল্পটি বলিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন।

কাকা বলিতেছিলেন, এক দিন তিনি লেথব্রীজ সাহেবের ঘরে তাঁহাকে পড়াইতে গিয়াছেন, দেখিলেন, সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর ; সাহেবের আট নয় বৎসরের পুত্র সেই কক্ষের এক কোণে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কাকার মনে হইল, 'বাবা লোক' সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নাকে খত দিতেছিল! ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া কাকা কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে সাহেবকে বলিলেন, "এই অস্বাভাবিক দৃশ্যের কারণ কি ? তোমার সদা প্রফুল্ল মুখ অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছেলেটা ঘরের কোণে মুখ গুঁজিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে ; তুমিই বোধ হয় উহার ঐরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ, উহার অপরাধ কি ?"—সাহেব মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "হাঁ, উহার প্রথম অপরাধ বলিয়া এবার লঘু দণ্ড দিয়াছি ; উহাকে এক ঘণ্টা ঐ কোণে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আমার আরদালীর নিকট ও 'শালা' বলিয়া গালি দিতে শিখিয়াছে।"

গল্পটা শুনিয়া সে কালের নীলকর সাহেবদের কথা মনে পড়িয়াছিল। এ দেশের নীলকরদের যে সকল ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে না পারিত, তাহারা বিলাত হইতে বাঙ্গালা মুলুকে আসিয়া এক একটা কুঠীতে সহকারীর পদে নিযুক্ত হইত। চাকরীতে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে তাহাদিগকে ঘোড়ায় চড়িতে ও চাবুক চালাইতে শিখিতে হইত, এবং এ দেশের নিরন্ন নিরুপায় কৃষকগণকে ও কুঠীর দেশীয় কর্ম্মচারীগণকে মা মাসী তুলিয়া গালি দিতে না পারিলে তাহারা কাজের লোক বলিয়া পরিগণিত হইত না। এই শ্রেণীর ইংরাজের নিকট লেথব্রীজ সাহেব যে নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ হইতেছে, বহুদিন পূর্ব্বে যখন লর্ড ডাফরিন ভারতের রাজপ্রতিনিধি—সেই সময় তিনি কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কুঠীয়ালের নিমন্ত্রণে আমাদের মেহেরপুর উপবিভাগে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। ব্যাপার কি, তাহা আমরা

তখন বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু দেখিতাম, সাহেবদের হাতীর মত 'ওয়েলার' ঘোড়াগুলা দল বাঁধিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। মেহেরপুরের পশ্চিম সীমায় ভৈরব নদ ; ভৈরব পার হইয়া সাহেবরা বেতাইয়ের জঙ্গলে এবং আরও পশ্চিমে পাট্‌কেবাড়ীর এলাকা পর্য্যন্ত বন্যবরাহ শিকার করিতে যাইতেন। হয় ত বড়দিনের মরসুমে কুঠীয়াল সাহেবরা শিকারে যাইবেন, তাহারই আয়োজন—ইহাতে নূতনত্ব ছিল না ; কিন্তু সেবার ঘটা কিছু বেশী বলিয়াই মনে হইল। ইতিমধ্যে এক দিন হাতীর মত কয়েকটা ঘোড়া থানার ঘাটে নামিয়া খেয়া-নৌকায় নদীপার হইল। ভাবিলাম, হয় ত এনড্র ইউল বা ঐ রকম কোন বড় সাহেবের ঘোড়া। শেষে ঘোড়ার সহিসদের সর্দ্দার—মনে হইল, কোন শিখ হাবিলদার-টাবিলদার, ধড়াচূড়াবাঁধা এক দুর্দ্ধাবিষ মূর্ত্তি—মেহেরপুরে আসিয়া আর ঘোড়ার সন্ধান পায় না ; তাহার জিম্বার ঘোড়াগুলি ঘাট পার হইয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল ; হাবিলদার বাবাজী ঘোড়া না দেখিয়া একদম মুন্সেফ্ কোর্টে হাজির ! মুন্সেফ বাবু এজলাসে বসিয়া সুবোধ গোপালের মত কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অর্থাৎ দেওয়ানী মামলার ডিক্রী-ডিস্‌মিসাদি কার্য্যে রত ছিলেন, ইউনিফর্ম্মধারী হাবিলদার সাহেব এজলাসে প্রবেশ করিয়া খাতির-নদারতভাবে বাজখাঁই আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল, "হামারা ঘোড়া কাঁহা ?"—মুন্সেফ বাবুকে বোধ হয় কস্মিনকালে এ রকম জেরায় পড়িতে হয় নাই। কোন ডিক্রীদারের ক্রোকী ঘোড়া ভাবিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঘোড়া! কার ঘোড়া ?"—হাবিলদার বা আরদালী বলিল, "লাট সাহেবকা।"—মুন্সেফ বাবুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল ; তাঁহার কোর্টের উকীল ও আমলাবার্গ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থির, নিস্পন্দ ! মুন্সেফ বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কার ঘোড়া ? ছোটলাট্ বাহাদুরের ?"—শিখজী অধীর স্বরে বলিল, "নেহি, নেহি, হিজ এক্‌সেলেন্সী লর্ড ডফ্‌রীন !"—আরে বাপ রে ! আব্রহ্ম ভারতের বড়লাট মেহেরপুরে ! মুন্সেফ বাবু আরদালী সাহেবকে ঠাণ্ডা করিয়া, খবর সংগ্রহ করিয়া ঘোড়ার সন্ধান দিলেন। গ্রামের সকল লোক জানিতে পারিল, ভারতের রাজপ্রতিনিধি মেহেরপুরের উপর দিয়া বরাহ শিকার করিতে যাইবেন। তিনি সাহেব-জমীদারের অতিথি।

পরদিন লাট সাহেব ভৈরব পার হইলেন ; তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য সাহেবদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল। নদীতীরে একটি টাট্‌কা বৃষকাষ্ঠ প্রোথিত ছিল। একটি দারুমূর্ত্তির মস্তকে বৃষ, তাহার পিঠে ক্ষুদ্র মন্দির, তাহার ভিতর শিবলিঙ্গ ; সমস্তই একখণ্ড স্থূল বিল্বকাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইংরাজ-বালকটি লাট সাহেবের পুত্র বলিয়াই মনে হইল ; সে সেই বৃষকাষ্ঠ দেখিয়া কৌতূহল ভরে তাহাতে লাঠীর খোঁচা দিতে উদ্যত হইলে লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "উহা কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূর্ত্তি, সাবধান ; আমাদের উহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই।" পাছে হিন্দু প্রজার মনে আঘাত লাগিতে পারে, ভাবিয়া বড় লাট সাহেব বৃষকাষ্ঠটি তাঁহার পুত্রকে লাঠি দিয়া স্পর্শ করিতে দিলেন না ; আর তাঁহারই স্বদেশের লোক এ দেশের দরিদ্র প্রজাকে তাহার জমীতে নীল বুনিতে অসম্মত দেখিলে এক দিন তাহার মাথায় ভিজে মাটী চাপাইয়া সেই মাটীতে নীলের বীজ বপন করিত, এরূপ কিংবদন্তীও আমরা অনেকের মুখে শুনিয়াছি, অথচ উভয়েই ইংরাজ ! সে-কালে যাহারা ভারতে রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ও সংস্কারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহাদের রুচি-প্রবৃত্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। হায় রে সে কাল !

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন ফিরিতে হইবে। গত মাসের বসুমতীতে বলিয়া রাখিয়াছি, মহিষাদল স্কুলে মাষ্টারী করিয়া এল এ পরীক্ষা দিব বলিয়া মহিষাদলের কাকার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এবার আর রাজবাড়ীর পশ্চিম

দেউড়িতে বাসা ছিল না ; খালের অপর পারে রাজা বাহাদুরের একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ম্যানেজারের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাসার এক দিকে হিজলী খাল ; অন্য দিকে হাটতলা, সোম-শুক্রবারে সেখানে হাট বসিত।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়া রায় বাহাদুর হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। এই পরিচয়সূত্রেই যে তাঁহার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এ কথা আজ রায় বাহাদুরের অগণ্য ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণের অজ্ঞাত থাকিলেও, সম্ভবতঃ তিনি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কুমারখালীতে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। বাবা এক সময় কুমারখালীতে স্বর্গীয় কাঙ্গাল হরিনাথের অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সংসারে নির্লিপ্ত এবং ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, অল্পদিনেই কাঙ্গালের সহিত বাবার বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। আমার ভগিনীপতির অভিভাবকরা কাঙ্গালকে গুরুর ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন ; কাঙ্গালের চেষ্টাতেই জলধর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুর সহিত আমার ভগিনীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে কাঙ্গাল কুমারখালীর অধিকাংশ ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহে পদধূলি দিয়াছিলেন। মহা সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। আমার বয়স তখন তের চৌদ্দ বৎসর। সে সময় চূয়াডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে মেহেরপুরে যাইতে গরুর গাড়ীতে বরযাত্রীরা মেহেরপুরে গিয়াছিলেন। এই সময় কাঙ্গাল তাঁহার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় তাঁহার আঠার ক্রোশ গো-শকটে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বর ও পুরোহিত পাল্কীতে আসিয়াছিলেন ; পুরোহিত ছিলেন—বাগ্মিপ্রবর স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পিতৃদেব।

এই বিবাহের পর আমি অনেকবার কুমারখালী গিয়াছি জলধর বাবু আমার ভগিনীপতির বন্ধুর দাদা, এ জন্য তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি তখন বাঙ্গালা রচনায় কাঙ্গালের সাক্‌রেদী করিতেন ; আমারও একটু আধটু বাঙ্গালা লিখিবার অভ্যাস ছিল, তিনি এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। জলধর বাবু এ সময় ফরিদপুর রাজবাড়ীর একটি ইংরাজী স্কুলে মাষ্টারী করিতেন ; মফঃস্বলের দুইটি স্কুলের শিক্ষক কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যসমাজে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। তাঁহারা উভয়েই ভাগ্যবান্। এক জন সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ; দ্বিতীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন। দীনেশ বাবুর ভাগ্যলক্ষ্মী বহু পূর্ব্বেই সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন ; তিনি ফুটিয়াছিলেন—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া ; কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েব বঙ্গভারতীর বাহন ছিলেন। জলধরবাবু ফুটিয়াছিলেন—হিমালয়ে। তিনি এখন বিশাল 'ভারতবর্ষে'র কর্ণধার।

আমি তখন কুমারখালীতে, জলধর বাবু তাঁহার চাকরীস্থলে, তাঁহার সাধ্বী পত্নী কুমারখালীতেই ছিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁহার কলেরা হইল, অতি ভীষণ ব্যাধি। জলধর বাবুকে বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইল। সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি যখন বাড়ী আসিলেন, তখন সব শেষ। সাধ্বী তখন পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহ গৌরী নদীর তটবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। জলধর বাবুকে ষ্টেশন হইতেই শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইল।

পত্নীবিয়োগে জলধর বাবু হৃদয়ে কিরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু প্রথমযৌবনে পত্নীবিয়োগের আঘাত বোধ হয় অধিকতর দুঃসহ বলিয়াই

মনে হয় ; নতুবা তিনি সে শোক সহ্য করিতে পারিলেন না কেন ? নদীয়া জেলায় পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের সে কালের কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনের অদূরে জলধর বাবু বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার একটি কন্যা ছিল, কিন্তু ভগবান্ কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে কোলে লইয়াছিলেন, এবার তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীও এক দিনের রোগে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। সংসারে ছোট ভাই, দিদি জ্যেঠতুতো দাদারা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীশোকাতুর জলধর বাবুকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, কৈশোর হইতে যৌবনে প্রমোসন পাইলাম, এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া এল এ পড়ি, কোন কোন মাসিকে কবিতা লিখি ; গোলাপী রঙ্গের কাগজে ছাপা অতিকায় 'হিতবাদী'তে দুই একটি গল্প লিখি, তখন "গুরুদেব" কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিতবাদীতেও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন ; তাঁহার সুবিখ্যাত 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি হিতবাদীতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সে সময় হিতবাদীর কর্ণধার হইয়াছিলেন। আমাদের মত স্কুলের ছেলের গল্প হিতবাদীতে ছাপা হওয়ায় মনে বোধ হয় একটু অহমিকার সঞ্চার হইয়াছিল ; কিন্তু প্রায়ই জলধর বাবুর কথা মনে পড়িত, তিনি আমার রচনার পক্ষপাতী ছিলেন, আমার লেখা তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না ভাবিয়া দুঃখ হইত। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে আমার ভগিনীপতি লিখিলেন, "জলদা"র সন্ধান হইয়াছে, তিনি হিমালয়-ভ্রমণ শেষ করিয়া দেরাদুনে আশ্রয় লইয়াছেন, বোধ হয়, শীঘ্র দেশে ফিরিবেন।"

তাঁহার মত সুহৃদের সকল সংবাদ জানিবার জন্য কৌতূহল হউল, শুনিলাম, দেরাদুনে 'দি গ্রেট্ ট্রিকোন্ মেট্রিকান্ সর্ভে' নামক ভারত সরকারের জরিপী আপিসের অন্যতম 'কমপিউটার' কালীমোহন বাবুর তিনি অতিথি, কালীমোহন বাবু ছিলেন অতি সদাশয় ব্রাহ্ম ; জলধর বাবুকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। জানিতাম, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি জলধর বাবুর কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল। কুমারখালী 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমীদারী। মহর্ষি কুমারখালীতে বহুকাল পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজ-ভবন স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ব্রাহ্ম প্রচারকগণ কুমারখালী আসিতেন, কুমারখালীর অনেক প্রধান লোক ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেন, বক্তৃতা শুনিতেন ; আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হইলেও অনেকে উপাসনায় যোগদান করিতেন। বিশেষতঃ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং তাঁহার দাদা স্বর্গীয় তারকগোবিন্দ মৈত্রের সহিত কুমারখালীর সকল ভদ্রলোকেরই আনুগত্য ছিল। কুমারখালীতে ইঁহাদের বাড়ী ছিল ; তারক বাবু সুদীর্ঘকাল কুমারখালীর সবরেজিষ্ট্রার ছিলেন, তারক বাবুর ন্যায় সদাশয়, সদানন্দ, নির্ম্মলচরিত্র পুরুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি ; কুমারখালীর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তারক বাবুর সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন ; কেহ তাঁহাকে কাকা, কেহ মামা, কেহ জ্যেঠা, কেহ দাদা বলিতেন। হেরম্ব বাবু কখন কখন কুমারখালী আসিতেন। কিন্তু কুমারখালীর শিক্ষিত সমাজে তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাব অল্প ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মভাবাপন্ন (আমি সে কালের কথা বলিতেছি) সংসারত্যাগী যুবক জলধর কালীমোহন বাবুর পরিবারে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না ; বিশেষতঃ সে কালে এই পার্ব্বত্য নগরীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি—এই কালীমোহন বাবুর কন্যাকেই হেরম্ব বাবু বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কুমারখালী ফিরিলে

শুনিতে পাইলাম, তিনি লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিবার জন্য হিমাচলের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনেক দুর্গম তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রয়েও কাল যাপন করিয়াছিলেন ; অবশেষে তিনি কোন মহাজ্ঞানী সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সেই সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সময় হয় নাই ; তাঁহার ভাগ্যে আছে—তাঁহাকে দীর্ঘকাল সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে, তিনি পূরা সংসারী হইবেন, তাঁহার সংসারধর্ম্মের সকলই বাকি ; তিনি কিরূপে সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন ? সাধু তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া হইল না, তাঁহাকে লোটা-কম্বল ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে হইল। তাহার পর ?—সে সকল কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় কাঙ্গালের সাহচর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু সংসারী হইবার জন্য আর তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তিনি কষ্টকর মনে করিলেন। তিনি সংসারত্যাগের পূর্ব্বে মাষ্টারী করিতেন ; কোথাও মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন—বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই সময় আমি মহিষাদলে আসিয়া স্কুলের শিক্ষকের খাতায় নাম লিখাইয়া শিক্ষকরূপে এল এ পরীক্ষা দিব—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। এ কালের মত সে কালেও কেহ 'প্রাইভেট ষ্টুডেন্ট'-রূপে এল এ বি এ পরীক্ষা দিতে পারিত না। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োজন হইত।

মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। শিক্ষকের জন্য কোন কোন ইংরাজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কাকাই স্কুলের কর্ত্তা ; আমি তাঁহাকে বলিলাম, তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন ; জলধর বাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁহাকে জানি, আপনারা ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না ; একভিন্ন, আমি মাষ্টারী করিয়া এল এ দিব, অথচ আমি গণিতে এত কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জলধর বাবু যদি দয়া করিয়া আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি ; তিনি চেষ্টা করিলে হয় ত গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবেন।

কাকা শুনিলেন, জলধর বাবু তাঁহার বন্ধু—বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের সহকারী (অধুনা স্বর্গীয়) বাবু কুঞ্জবিহারী বসুর জামাতার দাদা। কাকা জলধর বাবুকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়া চাকরীর জন্য তাঁহাকে আবেদন করিতে বলিলে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আমার চেষ্টা সফল হইল। জলধর বাবু মহিষাদল স্কুলে চাকরী করিতে আসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অট্টালিকার কয়েক গজ পশ্চিমে মৃৎ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল ; সেই ঘরে আমি ও জলধর বাবু একত্র বাস করিতাম। আমি তাঁহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি আমার 'মাষ্টার মশায়।' আমি তাঁহার নিকট গণিতবিদ্যা শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না। এই সময় স্বর্গীয় ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহিষাদলের রাজবাড়ীর ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ললিত বাবু সুচিকিৎসক ছিলেন ; তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের নীরব সাধক ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই জলধর বাবুর সহিত

তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ললিত বাবু মহিষাদলেই বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে বাস করিয়াছিনে। তিনি পরদুঃখকাতর, সহৃদয়, স্পষ্টবাদী ও তেজস্বী লোক ছিলেন। মহিষাদলের সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি আমাকে সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিতেন।

'বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি কাকার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী চন্দ্রশেখর কর এই সময় তমলুকের সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন; মহিষাদল তমলুক সবডিভিসনের এলাকাভুক্ত বলিয়া চন্দ্রশেখর বাবু পরিদর্শন উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে মহিষাদলে আসিতেন। চন্দ্রশেখর বাবু কৃষ্ণনগরের অধিবাসী, আমরাও নদীয়াবাসী। এ জন্য চন্দ্রশেখর বাবুর সহিত আমাদের আত্মীয়তা হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবু কাকার বৈঠকখানায় আসিলে যেন আনন্দের বাজার বসিত। জলধর বাবুও সেই মজলিশে যোগদান করিতেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সে সময় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; তিনি তখন 'সেটেল্‌মেন্ট' বিভাগে কাজ করিতেন, এবং মেদিনীপুরের কিয়দংশের জরীপসংক্রান্ত কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। একবার তিনি তাঁহার কার্য্যস্থানে সুজামুটা পরগনায় যাইতেছিলেন; সেই সময় আমার কাকা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বজরা হইতে আমাদের বাসায় ধরিয়া আনিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে কাকার বৈঠকখানায় যে মজলিস হইয়াছিল, সেই মজলিসে দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বরচিত অনেকগুলি হাসির গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ হাসির গান, 'পারো ত' জোন্মো না ভাই বিষ্যুৎবারে বারবেলায়' তাঁহারই মধুর কণ্ঠে সেই প্রথম শুনি। এতদ্ভিন্ন—সেই গানটি—"তার রং যে বড্ড ফরসা, তারে পাবো হয় না ভরসা।—" তিনি হাত ও চোখ মুখের এরূপ ভঙ্গীর সঙ্গে গাহিয়াছিলেন যে, শ্রোতার দল হাসির চোটে বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন।—সেই মজলিসে জলধর বাবুও অনুরুদ্ধ হইয়া দুই তিনটি গান গাহিয়াছিলেন; কাঙ্গালের রচিত দেহতত্ত্বের গন ভিন্ন তিনি দাশরথির রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন, তাহা বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল,—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥"

জলধর বাবু সুকণ্ঠ গায়ক নহেন; কিন্তু তিনি প্রাণের সকল আগ্রহ ঢালিয়া এরূপ আন্তরিকতার সহিত গানটি গহিয়াছিলেন যে, তাঁহার গান শুনিয়া ডি এল রায়ের সেই হাসির গানের শ্রোতার দল বিপুল হাস্যোচ্ছ্বাসের পর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। অনেকেরই চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল! কিছুদিনের মধ্যেই সংসারনির্লিপ্ত উদাসী জলধর বাবু আমাদের পরিবারেরই এক জন হইয়াছিলেন। কাকার দশ বছরের ছেলে সুরেনকে তিনি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কাকার তিনটি মেয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হইত না।

এই সময় পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদিকা। আমি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতীতে কিছু কিছু লিখিতাম। ভারতীতে 'হেঁয়ালী নাট্য' নামক এক সংখ্যায় সমাপ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক প্রকাশিত হইত। মনে করুন, বাঙ্গালায় প্রবচন প্রচলিত আছে—'দশের লাঠি, একের বোঝা' বা 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি।' 'যত হাসি, তত কান্না'—ক্ষুদ্র নাটকখানিতে প্রত্যেক প্রবচনের এক একটি কথা বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত হইত; তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিয়া প্রবচনটি কি, তাহাই বাহির করিয়া দিতে হইত। সেই সময় 'বঙ্গবাসী' হিন্দু সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার হাজার হাজার

গ্রাহক, বঙ্গবাসী হিন্দু সমাজের মুখপাত্র। 'বিজয়া বটিকা' হইতে 'ধর্ম্মভবন' পর্য্যন্ত তখন বঙ্গবাসীর বিজয় ঘোষণা করিতেছিল। আমার দুর্ব্বুদ্ধি! এই সময় আমি ভারতীতে একটা 'হেঁয়ালী নাট্য' লিখি, তাহাতে এরূপ কতকগুলি কথা বিদ্রূপচ্ছলে লেখা হইয়াছিল, যাহা বঙ্গবাসী তাহার প্রতি কঠোর আক্রমণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এবং ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ভারতী-সম্পাদিকা পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীকে যেরূপ অশোভন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহাতে যেরূপ অশ্লীল রুচির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা কেহই মার্জ্জনীয় মনে করিতে পারেন নাই; শিক্ষিত সমাজ বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। সংবাদপত্রেও এই ব্যাপার লইয়া কিরূপ আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরেও সেকালের অনেক বৃদ্ধের বোধ হয় স্মরণ আছে। সে সময় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' ছিল, ঠাকুরবাড়ী হইতে 'সাধনা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ না হইলেও দেবীপ্রসন্ন বাবুর 'নব্যভারত' এবং 'নবজীবন' প্রভৃতি বাঙ্গালা মাসিক ছিল। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর প্রবাসী তখনও প্রকাশিত হয় নাই, কলিকাতা হইতে তাঁহার সম্পাদিত প্রদীপ বৈকুণ্ঠ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেস ইহার কিছু দিন পরে য়ুরোপ হইতে চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন; এবং 'প্রদীপে'র এক সংখ্যায় তাঁহার অঙ্কিত 'কর্ণ ও কুন্তী'র একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা চিত্রকরের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। পরে তিনি ফরাসী স্ত্রী লইয়া বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, 'ভারতী'র সহিত পূর্ব্ব হইতে আমার সম্বন্ধ থাকায় সে সময় আমি প্রকাশযোগ্য যাহা কিছু লিখিতাম, তাহা ভারতীতেই প্রকাশিত হইত। এই সময়ে পূজনীয়া 'ভারতী' সম্পাদিকার চেষ্টায় 'সখী-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমি জলধর বাবুকে ও ডাক্তার ললিত বাবুকে সঙ্গে লইয়া 'সখী-সমিতির' চাঁদার জন্য মহিষাদলের পল্লী-অঞ্চলে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলাম। চাঁদা কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। 'ভারতী'তে নূতন কি লেখা যায়—এ বিষয় লইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের আলোচনাও চলিত। কিছু দিন পরে জলধর বাবুর দপ্তর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এক অপূর্ব্ব দ্রব্য আবিষ্কার করিলাম। একখানি বাঁধানো খাতা,—তাহার এক দিকে ফিকিরচাঁদ ফকিরের কয়েকখণ্ড গীতাবলী,—'কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্র' হইতে প্রকাশিত; অন্য দিকে তাঁহার স্বলিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,—জলধর বাবুর হিমালয়-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পেন্সিলে লেখা—মোটা মোটা অক্ষর। জলধর বাবুর হস্তাক্ষর বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সূক্ষ্ম নহে, বোধ হয়, ডবলক্রাউন ষোলপেজি আকারের ৭০/৭৫ পৃষ্ঠায় (ঠিক স্মরণ নাই; কারণ, সে ১৮৯১ কি ৯২ খৃষ্টাব্দের কথা— তাহার পর সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে) সম্পূর্ণ। সেই ভ্রমণ-কাহিনী আগাগোড়া পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, জলধর বাবু হিমালয়-পর্যটন উপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; কতকটা ডায়েরীর ধাঁজে লেখা। বর্ণনার পারিপাট্য বা কৌশল আদৌ কোথাও ছিল না। তথাপি তাঁহার সেই 'ভ্রমণ-কাহিনীতে' নূতনত্ব থাকায় আমার বড়ই ভাল লাগিল; কিন্তু তাহা এতই সংক্ষিপ্ত ও বাঁধুনি-বর্জ্জিত যে পাঠ করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আগ্রহও মেটে না। এক দিন ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "মাষ্টার মহাশয়, আপনার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কোনও মাসিকে প্রকাশ করিলে হয় না?"—মাষ্টার মহাশয় চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন; বলিলেন, "ও কি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত? অশান্ত হৃদয় লইয়া যেদিকে দুই চোখ গিয়াছে, সেই দিকে গিয়াছি; যা চোখের সম্মুখে পড়িয়াছে, তাই, যেমন খেয়াল হইয়াছে, সেই ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছি।

কখনও দেশে ফিরিব, উহা ছাপার হরফে প্রকাশ করিব—এরূপ আকাঙ্ক্ষা কোন দিন ছিল না, সে ভাবে লিখিও নাই। কেন উহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া আমাকে সাহিত্য-সমাজে হাস্যাস্পদ করিবেন ?"—জলধর বাবু আমাকে 'আপনি' ভিন্ন কখন 'তুমি' বলেন নাই, যদিও আমি ছাত্র।

আমার জিদ বাড়িয়া গেল ; আমি বলিলাম, উহা ভারতীতে প্রকাশ করিব।—তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। আমিও বুঝিয়াছিলাম, ভ্রমণ-কাহিনীটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, তাহা অবিকল নকল করিয়া পাঠাইলে কোন মাসিক-সম্পাদকই সে লেখা পত্রস্থ করিবেন না। আমি বলিলাম, 'নলচে ও খোল' বদ্‌লাইয়া উহা কথ্য ভাষায় লিখিয়া একটা কিস্তী শ্রীমতী সরলাদেবীকে পাঠাই—দেখি, তিনি কি বলেন।—তাহাই হইল ; আমি তাঁহার সেই খাতার লিখিত তিন পৃষ্ঠা অবলম্বনে নিজের কল্পনায় রং চড়াইয়া চল্‌তি 'ভাষায়' পাক্কা এক ফর্ম্মার 'আদি ও অকৃত্রিম' সচল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলিলাম। শ্রীমতী সরলা দেবী তখন ভারতীর প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচিত করিতেন ; সম্পাদন-ভার প্রধানতঃ তিনিই তখন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি কাপি প্রস্তুত করিয়া জলধর বাবুকে দেখিতে দিলাম ; তিনি তাহা না দেখিয়াই ফেরত দিয়া বলিলেন, "কি ছেলেখেলা আরম্ভ করিলেন ? হিমালয় কখন দেখেন নাই ; আমার তিন পৃষ্ঠার লেখাটুকু ফেনাইয়া-ফুলাইয়া ষোল পৃষ্ঠা করিলেন ; আপনি আশা করিতেছেন, উহা ভারতীতে প্রকাশিত হইবে ?"—কিন্তু আমার আশা অপূর্ণ রহিল না ; সরলাদেবী আমার হাতের লেখা কাপি পাইয়া অজ্ঞাত লেখক জলধর বাবুর অস্তিত্বে একটু সন্দিহান হইলেন বটে, কিন্তু আমাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি সেই কাপিতে আমার ভাষার প্রকাশভঙ্গি, বিশেষত্ব পরিস্ফুট দেখিলেন ; তথাপি আমার কথায় নির্ভর করিয়া জলধর বাবুর নাম দিয়াই তাহা ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর এ সকল কথা এখনও স্মরণ থাকিতে পারে। হয় ত এত দিন পরে আমার এই কবুল জবাব পাঠ করিয়া তিনিও মনে মনে হাসিবেন।

তাহার পর ?—তাহার পর আর কি। আমার যে কি রকম ভূতোনন্দী খাটুনী আরম্ভ হইল, তাহার পরিচয় আর কি দিব ? আমার তখন প্রথম যৌবন, মাতৃভাষার সেবার জন্য অসাধারণ আগ্রহ ; লেখাটা প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দ ও উৎসাহ, শক্তির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল ; সঙ্কল্প হইল—এই উপলক্ষে জলধর বাবুকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব, তিনি আমাকে এত স্নেহ করেন, আমাকে আঁক শিখাইবার জন্য পরিশ্রমও যথেষ্ট করেন ; গুরুদক্ষিণটা এই ভাবেই দিব। তাহার পর ক্রমশঃ সেই ৭০/৭৫ পৃষ্ঠা কাপি হইতে হিমালয়ের মত অতবড় কেতাব, কেবল তাঁহার ডায়েরীর অস্থি-কঙ্কালের উপর, আমার ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে আসমানের কেল্লার মত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। তাঁহার নামের জন্য, তাঁহার কেতাবখানি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, সাহিত্য-সমাজে পুস্তকখানি যাহাতে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে আমি দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। অনেক স্থানেই আমার খেই হারাইয়া যাইত ; কখন হিমালয়ে যাই নাই, হিমালয় দেখি নাই ; কি লিখিতে কি লিখিব ভাবিয়া পাইতাম না ; মূল কাপিতে যেটুকু বর্ণনা পাইতাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ, সামঞ্জস্যবিহীন। কি করি ? কি করি ? মাথা ঘুরিয়া যাইত ; জলধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতাম—তিনি বলিতেন, "যা মনে আসে, লিখে যান, আমার কি তখন মাথার স্থিরতা ছিল যে, খুঁটিনাটি আপনার সকল কথার জবাব দিব ?"—তাঁহার নিকট কোনও সাহায্য না পাইয়া আমি এক এক সময় হতাশ হইয়া পড়িতাম ; আমার আরও অধিক দুঃখ এই জন্য হইত যে, আমি অত কষ্ট করিয়া যে কাপি

লিখিতাম, তাহা তিনি একবার পড়িয়াও দেখিতেন না ; কোন দিন আমার রচনার একটি লেখাও কাটেন নাই ; এই অজ্ঞের বর্ণিত কোনও বর্ণনায় কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ভ্রম সংশোধন করেন নাই। তথাপি স্বীকার করিব—পুস্তকখানির যদি কিছু গুণ থাকে—তবে তাহা তাঁহারই প্রাপ্য, এবং যত কিছু দোষ, ত্রুটি—সমস্তই এই অধম, একুশ বৎসর বয়সের অপরিণামদর্শী অক্ষম বালক লেখকের। যাহা হউক, জলধর বাবুর হিমালয়-ভ্রমণের শুভ্র অস্থি-কঙ্কালের উপর এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। ভারতীতে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল ; আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। পাঠক-সমাজ 'হিমালয়' পাঠ করিয়া জলধর বাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, সাহিত্য-সমাজে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন ; আমার গুরুদক্ষিণা কিন্তু তখনও শেষ হইল না। এক দিন সাহিত্য-সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশ বাবু বলিলেন, "জলধর বাবুর হিমালয় ত লিখিয়া দিলেন, আপনার নাম কেহ জানিল না ; আপনি কি পরিশ্রম করিলেন, তাহা কেহ বুঝিল না ; কিন্তু আপনার রচনা-ভঙ্গী, লেখার বিশেষত্ব, এবং ভাবপ্রকাশের মধ্যে আপনার যে individuality জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, জলধর বাবু কি করিয়া তাহা নিজস্ব বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন ?"—সুরেশ বাবু এ কথা বলিতেন না ; কিন্তু জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি যখন 'নিবেদনে' সবিনয়-নিবেদন করিলেন, "দীনবন্ধু ডাক্তার, সুহৃদ্বর ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উৎসাহে (!) এই পুস্তক প্রকাশিত হইল"—তখন আমার প্রতি জলধর বাবু কিরূপ সুবিচার করিয়াছেন—গ্রন্থকারের 'নিবেদনে' তাহার পরিচয় পাইয়া সেই স্পষ্টবাদী, নির্ভীক, অন্যায়-অসহিষ্ণু, তেজস্বী ব্রাহ্মণ একবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবায় এই রকম 'কারচুপি' তিনি অমার্জনীয় মনে করিতেন। ইহার পর জলধর বাবু মাসিকের কর্ণধারগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বয়ং কলম ধরিয়া কোন কোন মাসিকে হিমালয়-ভ্রমণ সম্বন্ধে 'ভেজাল-বর্জ্জিত' প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার খাতা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ কয়িা ভারতীতে তাঁহার যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরে ১৩০৮ সালের ভাদ্রমাসের 'প্রদীপে' তিনি 'হিমাচল-বক্ষে' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; তাহার পরের মাসের অর্থাৎ আশ্বিনের 'সাহিত্যে' (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০৮—৩৮৫ পৃষ্ঠা) 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' সুরেশ বাবু সেই প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছিলেন, "যাহা হউক, করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় জলধর বাবুর কথঞ্চিৎ ক্ষুধাশান্তি হইলেও, তাঁহার বুভুক্ষু পাঠকগণের ক্ষুধার সময় উদরে কিছু পড়িল না ; সুতরাং পিত্তে গলা তিক্ত হইয়া উঠিল,"—এই ইঙ্গিত নিরর্থক নহে। জলধর বাবুর হিমালয়ের এ পর্য্যন্ত আটদশটি সংস্করণ হইয়াছে ; পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা, সুতরাং এ পর্য্যন্ত ন্যূনকল্পে পনের হাজার টাকার হিমালয় বিক্রয় হইয়াছে। তবে প্রকাশের ব্যয়, বিজ্ঞাপন খরচা, প্রকাশকের কমিশন আছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, এই মূল্যবান্ বৃহৎ গ্রন্থের কোন স্থানে (কেবল 'নিবেদন' ব্যতীত) একটি ছত্রও জলধর বাবুকে স্বয়ং লিখিতে না হইলেও তাহা তিনি কোথাও স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই ; কিন্তু লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাঁহার হিমালয়ে বৈরাগ্যসাধন করিতে যাওয়া যে সার্থক হইয়াছিল, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে ? কৃতজ্ঞতার অনুরোধে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য, আমি যখন কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম, তখন তিনি আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার গৃহে সযত্নে আশ্রয় দিতেন, আমাকে বাহিরে আহার করিতে দিতেন না, এবং অন্য ভাবেও আমার উপকার করিয়াছিলেন। সে সকল কথা পরে বলিব।

কেবল হিমালয়েই শেষ নহে ; তাঁহার 'রচিত' 'প্রবাস-চিত্র' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তখানির বিবিধ প্রবন্ধ সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল ; হিমালয়ের পর সেই ভারও আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু—এবং জলধর বাবুরও সুহৃদ সুকবি স্বর্গীয় রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর (ভারতীয় ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল) আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "প্রবাসচিত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতেছি জলধর সেন। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, ভাষা, প্রত্যেক লাইন আপনার, হিমালয় যেমন জলধর বাবুর রচনা, এখানিও তাই ?"—এই প্রবাস-চিত্রের কতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু বিক্রয়াধিক্য বশতঃ এই দুইখানি গ্রন্থ 'জলধর গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বিক্রয় হয়। তবে যাঁহারা জলধর বাবুর রচনার সহিত পরিচিত, তাঁহারা 'হিমালয়ে' ও 'প্রবাসচিত্রে' জলধর বাবুর নিজস্ব রসমাধুর্য্যের ও রচনাচাতুর্য্যের, এমন কি, তাঁহার ভাষার অননুকরণীয় সরলতার পরিচয় না পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। চন্দননগরের সুবিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠকে এক দিন এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। এক জনের কণ্ঠ হইতে অন্যের বেসুরো কণ্ঠস্বর নিঃসারিত হইলে বিস্মিত হইবারই কথা বটে। 'হিমালয়ে' ও প্রবাসচিত্রে' জলধর বাবু যে বহু টাকা পাইয়াছেন, আশা করি তাহাতে আমকে অঙ্ক শিখাইবার দক্ষিণা পরিশোধ হইয়াছে। আমার একটি রসিক বন্ধু এক দিন আমাকে বলিতেছিলেন, "তোমরা কি ছাই লেখ, জলধর বাবুর হাত তোমাদের চেয়ে অনেক মিঠে, 'হিমালয়' ও 'প্রবাসচিত্র' তিনি নিজে লিখিলে এত দিন ঐ দুইখানি কেতাবের বিশ পঁচিশটা 'এডিসন বিক্রয় হইয়া যাইত, তুমি তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহার সেই সুবিধা নষ্ট করিয়াছ ; এ জন্য তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। বই কাটিয়াছে—তাঁর নামের জোরে। ফুলের সঙ্গে অদৃশ্য কীট দেবতার মাথায় উঠিয়াছে—এ জন্য তোমার অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দাও।"

হয় ত এ কথা সত্য ; কিন্তু 'ডেভিল্'কে তাহার প্রাপ্য গণ্ডা শোধ করিয়া দিলে কাহারও কোন কথা বলিবার পথ থাকে না। আমার অনভিজ্ঞতা বশতঃ এবং জলধর বাবুর ঔদাসীন্যে, হিমালয়ের বর্ণনায় যে সকল ত্রুটি, ভ্রম, এবং স্থানীয় চিত্রে যে সকল বিরাট অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, তাহা যখন ধরা পড়িল ও আলোচনার বিষয়ীভূত হইল, তখন গ্রন্থকার ত অনায়াসেই বলিতে পারিতেন—ও পুঁথি ত আমি লিখি নাই ; একটা অর্ব্বাচীন বালক আমার খাতাপত্র হাঁটকাইয়া নিজের ইচ্ছায় যা তা লিখিয়া ও আমার নামে ছাপিয়া আমাকে অপদস্থ করিয়াছে।—কিন্তু সে কথা বলিতে কোনও দিন কি তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল ? যে পুস্তকের আট দশটা সংস্করণ ছাপা হইল, কোন সংস্করণে তাহার ত্রুটি কি তিনি সংশোধন করিতে পারিতেন না ?—আমি ভূতের ব্যাগার না খাটিলে উহা আদৌ ছাপা হইত কি না, তাহা তিনি ভালই জানেন।

যাহা হউক, সে কালের স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিয়া আজ সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বের যে সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম—তাহা পাঠ করিয়া রাজদ্বারে এবং সাহিত্যের দরবারে সম্মানিত 'রায় বাহাদুর' এবং তাঁহার আধুনিক হিতৈষী বন্ধুগণ সম্ভবতঃ অত্যন্ত উষ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং কাজটা ইতরোচিত হইয়াছে বলিয়া হয় ত অভিমত প্রকাশ করিবেন ; কিন্তু আর কয়েক দিন পরে জীবনের যুদ্ধে পরাভূত, স্ত্রী-পুত্র-বিয়োগে শোকাভিভূত, ইহলোকের প্রান্তোপনীত, কণ্ঠাগতপ্রাণ বৃদ্ধের কণ্ঠ চির-নীরব হইবে ; তখন এ সকল তথ্য যবনিকার অন্তরালে চিরকালের জন্য প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে—ভাবিয়াই কোন কথা গোপন না করিয়া, স্বল্পাবশিষ্ট জীবনকালের মধ্যে, আমার

অভিজ্ঞতা-লব্ধ পুরাতন সকল কথাই লিখিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই জন্যই অপ্রীতিকর হইলেও এ সকল কথা প্রকাশ করিলাম। কেবল মহিষাদলে কিছুদিন বাস করিবার পরই যে জলধর বাবুর সহিত আমার সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপও নহে ; কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা একযোগে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছিলাম। জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ একত্র ভোগ করিয়াছি ; প্রবন্ধান্তরে সে সকল কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সহায়-সম্পদ-হীন, সংসারে বীতস্পৃহ, বিপত্নীক যুবক জলধর বাবুকে, আমার কাকাই তাঁহার মহিষাদলের বাসা হইতে উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া তাঁহার ঘোর অনিচ্ছার মধ্যেই বিবাহ দিয়া আনিলেন,—

"সে আজিকে হ'ল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সে দিন সকাল।"

সে সময় কলিকাতা হোটেল ও পৌর্ণমাসী মিলন-বাসরের অস্তিত্ব ছিল না।

জলধরবাবু ভাগ্যবান্ পুরুষ সন্দেহ নাই। এ কালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সকল বন্ধু লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুরক্ত, তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, দরদী 'দাদার ভাই!' অধিক কি, সাহিত্য-সমাজের দিক্‌পাল, পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে তিনি বৈবাহিক রূপে লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাঁহার এই বৈবাহিক বিদ্যাভূষণ মহাশয় জলধর বাবুর পরিচয়েই আমার মুরুব্বী হইয়া আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দিনে সাহিত্য-সেবার উপলক্ষে আমাকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও কতকগুলি লোকের নিকট অপদস্থ করিয়া সাহিত্য-সমাজে স্বীয় সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাহাও আমাকে এই স্মৃতি-কথায় একদিন প্রকাশ করিতে হইবে ; আমার অপরাধ, আমি সরলভাবে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপকার করিয়াছিলাম।—শুনিয়াছি, 'কাকে কাকের মাংস খায় না!' কিন্তু সাহিত্যসেবা যাঁহাদের জীবনের ব্রত, সাহিত্যসমাজে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত, তাঁহাদেরও কেহ কেহ এই কিংবদন্তীর অসারতা সপ্রমাণ করিতেছেন!—

যাঁহাদের কবিত্ব-সৌরভে বঙ্গের আকাশ পূর্ণ, এবং জমীদার বলিয়া যাঁহারা সমাজে সমাদৃত, তাঁহাদেরও কেহ কেহ চাবাগিচার 'সেয়ারে' রাতারাতি বড়মানুষ করিবার লোভ দেখাইয়া কি কৌশলে দরিদ্র ও সাংসারিক বুদ্ধিহীন সাহিত্যসেবীর পত্নীর শেষ সম্বল অসঙ্কোচে আহরণ করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির পর বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন, তাহাও সাহিত্য-সমাজে আলোচনার অযোগ্য নহে। কবি আইনের বাগুরাজালকে সকৌতুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, কবিকুঞ্জে বসিয়া স্বদেশ-প্রেমের যে বংশীরব সাহিত্যকানন ঝঙ্কারিত করেন, তাহার উচ্ছ্বাস শেষ-সম্বলে বঞ্চিতা হতভাগিনীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ চাপা দিতে পারে কি? মিথ্যা প্রলোভনে প্রতারিতা, পল্লীবাসিনী নারী তাহার দীর্ঘজীবনের কষ্ট-সঞ্চিত অর্থরাশি, স্বদেশপ্রেমিক, খদ্দরভক্ত ও মহাত্মা গান্ধীর গুণকীর্ত্তনে অনুরক্ত, স্বরাজপ্রার্থী কবির হাতে তুলিয়া দিয়া যখন জানিতে পারিলেন—ঐ ভাবেই অর্থ সংগ্রহ কবির একটা পেশা মাত্র, তখন সেই সম্বলহারা অভাগিনী ক্ষোভে দুঃখে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন :—কোন্ কাল্পনিক উপন্যাস এই শোচনীয় নারী-হত্যার কাহিনী অপেক্ষা অধিক মর্ম্মভেদী? তাহা পাঠে সরলপ্রকৃতি ও বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ অনেক নির্ব্বোধের চোখ ফুটিতে পারে।

মহিষাদলে আমাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। সেই সময় কৈলাস বাবু নামক একজন হেড মাষ্টার আসিয়াছিলেন; তিনি ইংরাজী ডিটেকটিভ নভেলের পরম ভক্ত ছিলেন, এ জন্য স্কুল-লাইব্রেরীর জন্য অনেকগুলি ডিটেক্‌টিভ নভেল আনাইয়াছিলেন; আমি মধ্যে মধ্যে তাহা লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতাম। স্কুলের শিক্ষকদের নামের তালিকায় আমার নাম ছিল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। জলধর বাবু শিক্ষকতা-কার্য্যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, স্কুলের ছেলেরা অল্পদিনেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল, তিনি কোন ছাত্রকে কখন কঠিন কথা বলিতেন না, কিন্তু ছেলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিত। কাকাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু তিনি বক্তৃতায় লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন—এ কথা কেহই জানিত না। তিনি সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক, গম্ভীর; দুই চারি জন বন্ধুবান্ধব, স্কুলের শিক্ষক, সব-রেজিষ্ট্রার কালী বাবু, পোষ্টমাষ্টার নীলমণি গাঙ্গুলী প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না। মহিষাদলের রাজ-অমাত্যগণের মধ্যে মিশিবার মত শিক্ষিত লোক অধিক ছিলেন না। ডাক্তার ললিত বাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনিই জলধর বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমাদের মেহেরপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি তেজস্বী, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন; তথাপি তিনি উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম বলিয়া স্থানীয় গোঁড়া হিন্দুদের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমরা তখন নীচের ক্লাশে পড়িতাম। একবার এক জন ইংরাজ—তিনি মিশনারী কি অন্য জাতীয় সাহেব—তাহা আমার স্মরণ নাই, মেহেরপুর স্কুলের আঙ্গিনায় কয়েক দিন বাসের জন্য তাম্বু তুলিয়াছিলেন; সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি এজন্য স্কুলের হেড মাষ্টারের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। হেড মাষ্টার দেখিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্কুলগৃহের দক্ষিণ দিকের আঙ্গিনায় তাম্বু উঠিতেছিল। তিনি সাহেবকে বলিলেন, 'you must not raise a tent here'—তাঁহার কথাগুলি এখনও আমার বেশ মনে আছে। সাহেব তাঁহার মুখের দিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া কুলীদের তাম্বু খাটাইতে আদেশ করিলেন। অপমানিত হেড মাষ্টার স্কুলের সম্পাদকের নিকট অভিযোগ করিলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব তাম্বু খাটাইতেছিল, তাহাতে আপনার কি ক্ষতি হইতেছিল যে, আপনি তাহাকে তাম্বু তুলিতে নিষেধ করিলেন? নিজের মান নিজের কাছে, তাহা কি আপনি জানেন না? আপনি সাহেবের অপমান করিয়া ভারী অন্যায় করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার কৈফিয়ৎ চাহিলে আমি কি জবাব দিব? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কলমের এক খোঁচায় স্কুলের সরকারী 'এড' বন্ধ হইতে পারে, তা জানেন? ভাগ্যে তখন স্বদেশী যুগ আরম্ভ হয় নাই। তখন সাহেবদের কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস করিত না, কেবল নামকাটা সিভিলিয়ান সুরেন্দ্র বাবু বিদ্রোহের সুর বাহির করিয়া স্কুল-কলেজের ছেলেদের ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিলেন। শরৎবাবু সেই যুগের লোক; এ কাল হইলে পুলিস এই ব্যাপারে বিপ্লববাদীদের সহিত তাঁহার সহানুভূতির গন্ধ পাইত না কি? যাহা হউক কি হইতে কি হইল, জানি না, শরৎ বাবু কিছু দিন পরে চাকরীতে ইস্তফা দিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছেলেদের অভিভাবকদের নিশ্চিন্ত করিলেন; অনেক অভিভাবকের ধারণা হইয়াছিল—তাঁহার দৃষ্টান্তে ছেলেরা বিগড়াইয়া যাইবে, হিন্দুধর্ম্মে আর তাহাদের আস্থা থাকিবে না। শরৎ বাবু তখন যৌবনসীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও বিবাহ করেন নাই। মেহেরপুর স্কুলের চাকরী ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় বেণীগোপাল বাবুর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বেণীগোপাল বাবু নদীয়ার কালেক্টরীতে চাকরী করিতেন,

পরে তহবিল তছরুপের অভিযোগে তাঁহার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, নদীয়ার কালেক্টরীর হাজার হাজার টাকা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে খরচ হইয়াছিল। কালেক্টর পর্য্যন্ত কৈফিয়তের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

সে বহুকাল পূর্ব্বের কথা। শরৎ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু ছিলেন। মহিষাদল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইলে হেম বাবু সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাধানাথ মাইতি নামক একজন উকীল রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক ছিলেন; পরে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, ইহার কারণ জানিতে পারি নাই। পোষ্টমাস্টার নীলমণি বাবু মজলিসী লোক ছিলেন। সন্ধ্যাকালে কাকার বাসায় ইঁহাদের খেলার আড্ডা বসিত। মাষ্টার মহাশয় সেই আড্ডায় যোগ দিতেন না। এক দিন কাকা 'ভারতী'তে মাষ্টার মহাশয়ের 'ভ্রমণ-কাহিনী' পাঠ করিয়া আমাকে বলিলেন, "মাষ্টার মশায় চমৎকার বাঙ্গালা লেখেন, ভারতীতে তাঁর 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' বেরুচ্ছে, দেখেছিস ?"—আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, "হাঁ, তা দেখছি ত; উনি কাঙ্গাল হরিনাথের সাকরেদ, ভাল লিখবেন না ?" আমার ভয় হইয়াছিল—জলধর বাবু হয় ত আমাকে বিপন্ন করিবেন,—বলিবেন, 'মশায়, আপনার ঐ লক্ষ্মীছাড়া ভাইপোটাই যত নষ্টের গোড়া।' কিন্তু তিনি দয়া করিয়া আমাকে বিপন্ন করিলেন না, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমার ভয় ছিল, কাকা টের পাইলে হয় ত বলিবেন, "ওরে হতভাগা, এই বুঝি মাষ্টার মশায়ের কাছে তোর অঙ্ক শেখা ?" কিন্তু কাকা কিছুই জানিতে পারিলেন না। সকলেই জানিল, জলধর বাবু চমৎকার লেখেন।

বাবু নীলমণি মণ্ডল মহিষাদল এষ্টেটের সব-ম্যানেজার ছিলেন; রাজার আমলাদের মধ্যে তাঁহার আর্থিক অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বচ্ছল ছিল। তিনি প্রথম-যৌবনে অতি সামান্য বেতনে জমীদারী সেরেস্তায় চাকরী আরম্ভ করিয়াছিলেন, সব-ম্যানেজার হইয়া তিনি মাসিক এক শত পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন; তিনি বাঙ্গালানবীশ কর্ম্মচারী হইলেও জমীদারী কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। কাকা তাঁহার এই অভিজ্ঞ সহকারীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না। রাজ এষ্টেটের তহবিলে লাট খাজনার টাকার অভাব হইলে নীলমণি বাবু কখন কখন নিজ তহবিল হইতে ২০/২৫ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া লাট রক্ষা করিতেন; শুনিয়াছি—তাঁহার হরিখালী হাটের আয় ছিল বার্ষিক বারো হাজার টাকা। তিনি যে সামান্য বেতনে সব ম্যানেজারী কেন করিতেন—তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু জমীদারীতে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তাঁহার হৃদয় উদার ছিল; তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কাকাকে যখন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়, তখন নীলমণি বাবুই কাকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এ কালে শিক্ষার কদর বাড়িতেছে, কিন্তু নীলমণি বাবুর ন্যায় উদারপ্রকৃতি লোকের অভাব হইতেছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানেও দেখিতেছি—অনেক শিক্ষিত লোক স্বার্থের অনুরোধে অযোগ্য ব্যক্তির ধামা ধরিয়া জনসাধারণের ক্ষতি করিতেছে।

বলিয়াছি, পোষ্টমাষ্টারটি বড় মজলিসী লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল।—তিনি দেবী সুরেশ্বরীর বড় ভক্ত ছিলেন, বোতল ভিন্ন তাঁহার চলিত না; এ অবস্থায় মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে তিনি কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ? সুতরাং তাঁহাকে সরকারী তহবিলের টাকা 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' দেখিতে হইত। সেই সময় এক জন ইংরাজ মেদিনীপুর ডিভিসনের পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি মহিষাদলের ডাকঘর পরিদর্শন করিতে আসিবার পূর্ব্বে পোষ্টমাষ্টার কাকার কাছে আসিয়া ধরণা দিতেন, এবং দুই এক দিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে দুই তিন শত টাকা ধার

করিতেন। কাকা কোন দিন তাঁহাকে ঐ ভাবে টাকা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোষ্ট আফিসের তহবিল দেখিয়া প্রস্থান করিলে পোষ্টমাষ্টার কাকাকে টাকাগুলি ফেরত দিয়া যাইতেন। পোষ্টমাষ্টার কি উদ্দেশ্যে দুই এক দিনের জন্য টাকা ধার লইতেন—তাহা কাকা জানিতেন না বা তাঁহাকে ইহার কারণও জিজ্ঞাসা করিতেন না। তবে পোষ্টাল সুপারিনটেনডেণ্ট মহিষাদলে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পোষ্টমাষ্টারের টাকার প্রয়োজন হইত,—কাকা ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে হয় না। কাকা পান পর্য্যন্ত খাইতেন না, আর পোষ্টমাষ্টার 'ভাটী' পর্য্যন্ত নিঃশেষে পান করিতে পারিতেন। তথাপি কাকা কোন দিন তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করেন নাই। তিনি কাকাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার অনুগত ছিলেন; লোকটির সদ্‌গুণ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঐ এক দোষেই বেচারার সর্ব্বনাশ হইল। একবার কাকা জমীদারী পরিদর্শন উপলক্ষে মফঃস্বলের কাছারীতে গিয়াছিলেন। সেই সময় পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহিষাদলে উপস্থিত।—পোষ্টমাষ্টার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন; তাঁহার তহবিলে তিন শত টাকার অনটন ছিল। তিনি টাকা ধার করিতে ব্যস্তভাবে আমাদের বাসায় আসিলেন। কাকা বাসায় নাই, কে তাঁহাকে টাকা ধার দিবে? দুই দশ টাকা নয়, তিন শত টাকা। পোষ্টমাষ্টার টাকা সংগ্রহের জন্য ধনাঢ্য বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সরকারী তহবিল পরীক্ষা করিয়া, তহবিল ঘাটতি দেখিয়া তাঁহাকে ফৌজদারী-সোপর্দ্দ করিলেন। তমলুকে তাঁহার অপরাধের বিচার হইল; কাকার বন্ধু স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ই বোধ হয় তখন তমলুকের ডেপুটী ছিলেন। তিনি কাকার খেলার আড্ডায় পোষ্টমাষ্টারকে দেখিয়াছিলেন, পোষ্টমাষ্টার কাকার কিরূপ অনুগত ছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন; কিন্তু সরকারের তহবিল তছরুপের বিচারে আসামীকে দণ্ডদান করিতে তিনি বাধ্য; তবে তিনি দয়া করিয়া যথাসম্ভব লঘুদণ্ডই দিয়াছিলেন। তিনি যে টাকা ভাঙ্গিয়াছিলেন, তত টাকা তাঁহার জরিমানা, এবং ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টারের দুইটি কন্যা ও স্ত্রী ভিন্ন তাঁহার বাসায় পুরুষ অভিভাবক কেহই ছিল না। পোষ্টমাষ্টারের কারাদণ্ডের সংবাদ শুনিয়া তাহাদের কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দন। পোষ্টমাষ্টারের কোন আত্মীয় তাঁহার বাসায় না আসা পর্য্যন্ত কাকা এই দুস্থ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম—পোষ্টমাষ্টারকে আর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয় নাই, কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিহিত উস্তিতে জলধর বাবুর বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। জলধর বাবু তরুণ যুবক, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তিনি সর্ব্বাংশে সুপাত্র। জলধর বাবু এই বয়সে বিপত্নীক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, সমস্ত জীবন পড়িয়া আছে—অথচ তিনি সংসারধর্ম্ম করিবেন না—ইহা সকলেই অসঙ্গত মনে করিলেন। উস্তির দত্তরা সম্ভ্রান্ত পরিবার, এই বংশের এক জন স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী বসুর জামাতা ছিলেন; আর এক জামাতা জলধর বাবুর কনিষ্ঠ শশধর বাবু; সুতরাং দত্ত-পরিবারে জলধর বাবুর বিবাহে কোন বাধা উপস্থিত হইল না, কাকা সানন্দচিত্তে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। জলধরবাবু তখনও মাথা নাড়িতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয় বড় কোমল, অতীত জীবনের সাংসারিক সুখদুঃখের স্মৃতি তাঁহার কোমল হৃদয় বেদনাতুর করিয়া তুলিল। তাঁহার বিবাহ হইবে শুনিয়া আমার এতই উৎসাহ হইল যে, আমি এক কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। তখন বিবাহ উপলক্ষে কবিতা লেখা একালের মত ফ্যাসানে পরিণত হয় নাই। কবিতায় কি লিখিয়াছিলাম, স্মরণ নাই, তবে প্রথম কয়েক ছত্র মনে আছে,—

“মাষ্টার মশায়ের বিয়ে,
এয়োরা সব ছুটে এসো বরণডালা নিয়ে ;
উলু দাও, কেউ বাজাও শাঁখ,
সবে, ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে।
উস্তি গ্রামের দত্ত বাড়ী
আমার, ‘মাষ্টারজি’র বিয়ে।”

কিন্তু মাষ্টার মশায়ের বিরাগ-ভয়ে এ কবিতা ছাপাইতে পারি নাই। কাকীকে লুকাইয়া শুনাইয়াছিলাম, সুতরাং কাকা তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, “কি ছেলেমানুষি কচ্ছিস্‌ ? একেই ত ভদ্রলোক বিয়ে করতে রাজী নয়, অনেক কষ্টে রাজী করা গিয়েছে, তোদের অত্যাচারে শেষে হয় ত কোন্ দিন লোটা-কম্বল নিয়ে আবার কোন্ দিকে স'রে পড়বেন।”— কাযেই আমার সাধের কবিতাটি মঠে মারা গেল।

স্মরণ হইতেছে, জলধর বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর শশধর বাবুর পরম বন্ধু—আমার ভগিনীপতির বাসা—কলিকাতার ১৭নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট (কুমারটুলী) হইতে আমরা এই বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলাম। কাকার পুত্র শ্রীমান্ সুরেন ভায়ার বয়স তখন বছর দশেক, সে মাষ্টার মশায়ের ‘কোলবর’ হইয়াছিল। প্রথমে কথা হইয়াছিল, কুমারখালী হইতে তাঁহাদের পারিবারিক পুরোহিতকে আনাইয়া শেষ করা হইবে। কিন্তু ভোটে এই প্রস্তাব টিকে নাই। সেই সময় যশোহর—হরিনারায়ণপুরের অধিবাসী জোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক একটি প্রতিভাবান্ দরিদ্র যুবক আমার ভগিনীপতির কলিকাতার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তিনি তখন বোধ হয় এল, এ, পড়িতেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় এবং ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। তিনি আমাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। আমার ভগিনীপতির কলিকাতাস্থ গদীয়ান স্বর্গীয় ভাদুড়ী মহাশয় তাঁহার মামা কি পিসে হইতেন। জ্যোতিষচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, এজন্য কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় নিশিকান্ত সেন মহাশয়ও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। জ্যোতিষচন্দ্রই জলধর বাবুর বিবাহে পৌরোহিত্য-ভার গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ পুরোহিত অতি অল্পসংখ্যক যজমানের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। শুভ বিবাহে শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ পুরোহিতের সহায়তার উপর দম্পতির জীবনের সুখ ও সাফল্য নির্ভর করিলে, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব—জ্যোতিষচন্দ্রের পৌরোহিত্য সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল। বলিয়াছি, অতি অল্পসংখ্যক যজমানের ভাগ্যেই জ্যোতিষচন্দ্রেব ন্যায় পুরোহিত জুটিয়া থাকে—আমার এই উক্তি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, এই জ্যোতিষচন্দ্রই যোগ্যতার সহিত এম এ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে পূর্ণিয়ায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং অসামান্য যোগ্যতাবলে পূর্ণিয়ার সরকারী উকীল হইয়া কালক্রমে ‘রায় বাহাদুর’ ও বেহার-কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছিলেন ; কমলার কৃপায় বাল্যের দরিদ্র জ্যোতিষচন্দ্র ওকালতী ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সুরসিক লেখক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় তিনি বেহারে ‘ধেমোশালিক’ (ডমিসাইল্ড) হইয়াছিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যেরও সুলেখক ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বিবাহের পর জলধর বাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরী করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ ৪০/৪১ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

আমার মহিষাদল-ত্যাগের পর জলধর বাবু কত দিন মহিষাদল স্কুলে মাষ্টারী

করিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি মহিষাদল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং ভারতী আফিসেই বাস করিতেছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যপ্রতিভা তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতীতেই বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া তিনি প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ভারতীর সাহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। কলিকাতার উত্তরাংশে কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ীতে তখন ভারতী আফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল ; সেই বাড়ীতে একটি প্রেসও ছিল। যে সময় আমি ভারতী আফিসের সেই বাড়ীতে বাস করিতাম, সে সময় পূজনীয়া সম্পাদিকা মহোদয়া কলিকাতায় ছিলেন না ; তিনি তখন বোধ হয় বোম্বে অঞ্চলে ছিলেন। স্বর্গীয় জানকী ঘোষাল (মিঃ জে ঘোষাল) তখন একাকী সেই বাড়ীতে থাকিতেন। ঘোষাল মহাশয় আমাদেরই জেলার লোক, চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনে তাঁহার বাড়ী ছিল, এবং তাঁহার পৈতৃক অবস্থাও সমৃদ্ধ ছিল ; আমার ঠাকুরদাদা ঘোষাল মহাশয়ের পিতৃদেবকে চিনিতেন, তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, তিনি ঐ অঞ্চলের খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন ; জানকী বাবু কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে বিবাহ করিবার পরে স্বগ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন কি না জানি না ; কিন্তু সে সময় পল্লী-সমাজে গোঁড়ামীর যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা স্মরণ হইলে মনে হয়, মিঃ ঘোষাল বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া স্বগ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজনের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, একালের বিলাত-ফেরত ও সেকালের বিলাত-ফেরতে আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল। তাঁহার সাহেবী ধরণে হাঁচিতেন, কাসিতেন, খাইতেন, শুইতেন, এবং যদি কোন কারণে কাপড় পরিবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে 'সভার' করিতেন। এই সকল কারণে গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন না। বিলাত ফেরতদের পত্নীরা বিলাতে না গিয়াই একটু বেশী মাত্রায় মেম সাহেব হইয়া উঠিতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমাদের বাল্যকালে আমাদের জেলার কোন প্রতাপশালী জমীদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিলাতে গিয়া নানা শিল্পকার্য্য শিখিয়া আসিয়াছিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দেশে ফিরিয়া কলের সাহায্যে কোন প্রকার শিল্পকার্য্য আরম্ভ করিবেন। তিনি দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরিয়া সে জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন, মূলধনেরও অভাব হয় নাই ; কিন্তু যেমন হইয়া থাকে—তাঁহার ব্যবসায় স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। তিনি দেশে ফিরিয়া সাহেবীয়ানা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর মেমসাহেবীয়ানা দশগুণ অধিক হইয়াছিল। মেম সাহেব শাড়ী পরিধানের কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া গাউন ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন ; এবং মেম-সাহেবের মত বড় 'ওয়েলার' ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া এক পাশে দুই পা ঝুলাইয়া দিয়া পাঁচ সাত ক্রোশ অনায়াসে ঘুরিয়া আসিতে পারিতেন। তিনি অসঙ্কোচে পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতেন এবং প্রকাশ্যভাবে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। পাছে বৌ-মা লজ্জা পাইবেন—এই ভয়ে তাঁহার ভাশুর মহাশয় সযত্নে তাঁহাকে পরিহার করিয়া চলিতেন ; কিন্তু 'বৌ মা' বিলাত-ফেরতের 'মেম', তিনি ভাশুরের তোয়াক্কা রাখিতেন না। এক দিন তাঁহার ভাশুর মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহার টমটম্ হাঁকাইয়া নবদ্বীপের দিকে যাইতেছিলেন ; সেই সময় মেম সাহেব (তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী) নবদ্বীপের দিক্ হইতে অশ্বারোহণে কৃষ্ণনগরে আসিতেছিলেন। ভাশুর মহাশয় টমটম্ হাঁকাইতে হাঁকাইতে অশ্বারোহিণী ভ্রাতৃবধূকে দেখিতে পাইলেন। পাছে তাঁহাকে দেখিয়া 'বৌমা' লজ্জা বোধ করেন, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি টমটম্ হইতে নামিয়া পথের ধারে একটি গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকাইলেন। 'বৌমা' কদমে ঘোড়া ছুটাইয়া টমটমের পাশ দিয়া প্রস্থান করিলে

ডাক্তার মহাশয় গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া টমটমে উঠিয়া বসিলেন। সেকালে অনেক গুরুজন এই ভাবে নিজের মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। সেকালে সাহেবীয়ানার মোহ এইরূপ প্রবল ছিল, আর একালে খাঁটি বিলাতী মেম সাহেবরা বাঙ্গালীকে বিবাহ করিয়া শাড়ী পরিতেছেন ও সীঁথায় সিঁদূর দিয়া খাঁটি বাঙ্গালিনী সাজিতেছেন।—এই জন্যই বোধ হয় হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন—"বিলেতফের্ত্তা টান্‌চে হুঁকা, সিগারেট ফুঁক্‌চে ভশ্চায্যি!" বিলাতীমেম সাহেবের বাঙ্গালী স্বামী এখন ঘরে বাহিরে ধুতি ও চটি ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন না। কিন্তু ঠাকুর-বাড়ীর মহিলারা কোনও দিন 'মেম সাহেব' সাজেন নাই। বরং তাঁহারাই অনেক বাঙ্গালী মেমকে শাড়ী ধরাইয়াছেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সকল বিষয়েই সমাজের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না! আর পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রগতির প্রচণ্ড আবর্ত্তে পড়িয়া সমাজের কি হাল হইবে, তাহা কল্পনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। আজকাল নানা রাজনৈতিক অপরাধে যুবতীরা দলে দলে স্বরাজলিপ্সু যুবকদের সঙ্গে অসঙ্কোচে কারাবরণ করিতেছেন; কিন্তু ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়, উচ্চশিক্ষিতা যুবতীরা, অধিক কি, তরুণীরা পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের দলে মিশিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্তে নরহত্যা করিতেছে। আমরা স্বরাজ পাই বা না পাই, শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী নারীর রুচি, প্রবৃত্তি, চিন্তার ধারা, এবং শিক্ষা-দীক্ষার এই পরিবর্ত্তনে কি সমাজের কল্যাণ হইবে? হাড়ি, মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতিকে মাথায় তুলিয়া এই যে আমরা নাচিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহা দেখিয়া একদল লোক আমাদের পিঠ চাপড়াইয়া বাহবা দিতেছে; অনেকে আশা করিতেছে, ভারতের দুঃখনিশার অবসানের আর বিলম্ব নাই! কিন্তু আমাদের অবস্থা শেষে সিন্দবাদ নাবিকের মত হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তখন কি 'কম্‌লি ছোড়্‌তা নেহি' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে হইবে না?—সে দিন মাদ্রাজ অঞ্চলের একদল কালো খৃষ্টান অপমানের কালী গাল ও মুখ হইতে মুছিবার জন্য বুক চাপড়াইয়া নাকী সুরে বলিতেছিল, "আমরা কালো খৃষ্টান বলিয়া ধলো খৃষ্টানেরা তাহাদের ভজনালয়ে আমাদিগকে ভগবানের উপাসনা করিতে দেয় না। ধর্ম্মের রাজ্যে তাহারা আমাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে।" এ দেশে এ রকম হোটেল অনেক আছে—যেখানে ধলা ভিন্ন কালার প্রবেশ নিষেধ। অথচ আমরা মুচি-মুদ্দোফরাসদের লইয়া 'সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে'র জন্য ক্ষেপিয়াছি। রঙ্গমঞ্চে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে 'মন্দির-প্রবেশ' করাইবার জন্য হাততালির লোভে নাটক লিখিতেছি। যাহারা নানাভাবে অন্যকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই আমাদের দেশ হইতে অস্পৃশ্যতা-বিলোপের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে; বঁড়শিতে অস্পৃশ্যতার টোপ গাঁথিয়া আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া বলিতেছে—রাঘববোয়ালের মত কপ করিয়া গিলিয়া ফেল, তৎক্ষণাৎ স্বরাজচন্দ্র উদ্বাহু বামনের করতলগত হইবে। সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইলে যে বিরাট শক্তির প্রয়োজন—সে শক্তি ছিল সন্ন্যাসি শিরোমণি ভগবান তথাগতের, সে শক্তি ছিল প্রেমের অবতার মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেবের, যাঁহার কণ্ঠ হইতে এক দিন অগ্নিরাশি নিঃসারিত হইয়া সমগ্র ভারতের জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা ভস্মে-পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মতিমান্ ভক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভগবদাশীর্ব্বাদে সেই অমোঘ শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এখন যাঁহারা আগুন লইয়া খেলা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সে শক্তি, সে সাধনা, সেই বিশাল আত্মনির্ভরতা ও নিষ্ঠা কোথায়? মহাকবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,—

"ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে জন বিরল।"

সমাজ ভাঙ্গিবার জন্য চারিদিক্ হইতে এই যে লাঠী পড়িতেছে, ইহার ফলে হয় ত সব সমভূমি হইয়া যাইবে, কিন্তু কেই শ্মশানে অমরার পারিজাত ফুটাইয়া তুলিবে—সে শক্তি কাহারও নাই। কামারের কুম্ভকার-বৃত্তি দ্বারা কখন সুফল উৎপন্ন হয় নাই। তবে কিছু দিন হাততালি পাওয়া য়ায় বটে।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এবার ফিরিয়া খেই ধরি। মিঃ জে ঘোষালের কথা বলিতেছিলাম। কংগ্রেসকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য কি বিশাল শ্রমই না করিতেন! তাঁহার অটল ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। কংগ্রেস তখন আভিজাত্যের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিপ্লববাদীরা সে কালেও কংগ্রেসের তোয়াক্কা রাখিত না. এখনও রাখে না।. দামোদর ও হরিচাপেকার যখন রাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে হত্যা করিয়াছিল, তখন তাহারা কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। তখন হিউম, ইউল, কেইন, ব্রাড্ল, কটন প্রভৃতি মহাপ্রাণ ইংরাজরা কংগ্রেসকে প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন, এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন; আর এখন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মাত্রই ইহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তখনকার বড়লাট ইহা 'মাইক্রস্কপিক মাইনরিটী' বলিয়া ইহার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন; আর এখন কর্ত্তৃপক্ষ ইহার অস্তিত্ব-বিলোপের জন্য উৎসুক। মিঃ ঘোষাল এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ বোধ হয় কল্পনাও করেন নাই যে, তাঁহাদের সাধের কংগ্রেস একদিন আভিজাত্য হারাইয়া গুর্জ্জরের এক জন সর্ব্বত্যাগী 'অর্দ্ধোলঙ্গ ফকিরের' ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবে এবং সমগ্র ভারত উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। চিত্তরঞ্জন তখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে আসিয়া হাইকোর্টে কঠোর জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র এবং অরবিন্দ বরোদায় আসিয়া গায়কবাড়ের চাকরী গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় থাকিয়া চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু উমেদারী করিবার শক্তি ছিল না। কি করিয়া আফিসের কর্ত্তাদে. মন ভিজাইতে হয়, সাহেব লোকের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিতে হয় এবং তৈলদানের প্রকৃষ্ট পন্থা কি, তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল; পালিত সাহেব কবিবর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি তখন রাজসাহীর জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি স্বয়ং আমার জন্য কিছু করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রাজসাহী জেলাজজের নিকট আমার জন্য সুপারিশ কবিয়া এক পত্র দিলেন।

আমি কাকাকে বলিলাম—রাজসাহী যাইব, জজকোর্টে একটা কিছু জুটিতে পারে। কাকা বলিলেন, "জেলা আদালতে আমলাগিরি চাকরীর মধ্যে সেরেজদার, হেডক্লার্ক, ট্রানস্লেটার প্রভৃতি দুই একটি পদ ভাল, তদ্ভিন্ন অন্যান্য পদের গৌরব নাই, উন্নতিও নাই। কোন কোন সেরেস্তায় বিলক্ষণ দশ টাকা উপরি অর্থাৎ ঘুষ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাতে যে নৈতিক অধঃপতন ঘটে, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা অপেক্ষা অনাহারে থাকা অনেক ভাল। আমি এত বড় এষ্টেটের ম্যানেজার করি, কিন্তু আমার অপেক্ষা আমার তাঁবেদার তমলুক ও গুমগড় পরগণার নায়েবের অবস্থা অনেক ভাল। উপরি পয়সা লইতে হইলে নর্দ্দমার পাঁক ঘাঁটিতে হয়, সেই পাঁকে হাত ডুবাইতে হয়; এই জন্য আজ যদি কোন কারণে আমার চাকরী যায়—তাহা হইলে কাল তোমাদের সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে, সুতরাং তোমার চাকরী করাই উচিত; আমার দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বন্ধু আছেন বটে, কিন্তু আমি তোমার জন্য তাঁহাদের কাছে উমেদারী করিতে পারিব না। অনেকে ছেলেদের 'গতি' করিবার জন্য উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক বা রাজা-মহারাজার মনোরঞ্জনের চেষ্টায় তাঁহাদের

মজলিসে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত ইতর প্রবৃত্তি ; আর এক শ্রেণীর লে আছে—তাহারা তোমাকে দেখাইবে, তাহাদের আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর, তাহারা স্পষ্টবাদী, নির্ভীক, তেজস্বী ;—কিন্তু কোন বড় লোক 'তু' করিয়া ডাকিলে দৌড়াইয়া যাইবে, এবং তাঁহাদের প্রসন্নতালাভের জন্য তোষামোদ করিবে ; তাঁহাদিগকে দেবতার আসনে বাসাইতেও লজ্জা বোধ করিবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি মানুষ হও, উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের যুদ্ধ আরম্ভ কর। তোমার ইচ্ছা ছিল, স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবে। কিন্তু টাকা দিয়া তোমাকে একটা প্রেস করিয়া দিতে পারিলে হয় ত ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিতে ; কিন্তু তোমাকে প্রেস করিয়া দিতে পারি—সে শক্তি আমার নাই। নিজের চেষ্টায় যদি কখন পার, প্রেস করিও। এখন রাজসাহীতেই যাও ; কিন্তু রাজসাহীর অনেকেই নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের দুই এক জন পরিচিত লোক আছেন ; কিন্তু তাঁহারা ভদ্রসমাজে মিশিবার অযোগ্য। শুনিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নহে ; তুমি রাজসাহীতে তাঁহাদের সঙ্গে মিশামিশি করিও না। কোন মেসে থাকিবে ; খরচপত্র যাহা লাগে, আমাকে জানাইবে. পাঠাইয়া দিব।"—আমি অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে কাকার নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলাম। স্থির করিলাম, বাড়ীতে কয়েক দিন কাটাইয়া রাজসাহী যাইব। একাকী কখন দূর-প্রবাসে যাই নাই ; ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজসাহী যাইতেছি, সম্বল পালিত সাহেবের একখানি পত্র। মন অশান্তিপূর্ণ হইল।

বাড়ীতে চারি পাঁচ দিন থাকিয়া গো-শকটে চুয়াডাঙ্গায় আসিলাম। তখন মোটর-বাস দূরের কথা, মেহেরপুর হইতে চুয়াডাঙ্গায় আসিতে ঘোড়ার গাড়ীও মিলিত না ; সনাতন গো-যানই একমাত্র সম্বল ছিল। পথিমধ্যে দুইটি নদী খেয়া নৌকায় পার হইয়া রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিতে রাত্রি বারোটা বাজিল—বেলা তিনটার সময় গরুর গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাহার পর গরুর গাড়ীর ভিতর পড়িয়া ছট্‌ফটানি ! জেলা বোর্ডের পথ, ঠিকেদার পথ মেরামতের জন্য যে কয়টি টাকা গ্রহণ করিত, তাহার সিকি টাকা খরচ করিয়া কয়েক গাড়ী লাল মাটী ও ঝামা পথে বিছাইয়া দিত ; বোর্ডের পরিদর্শককে পান খাইতে কিছু দিলেই পথের মেরামতি মঞ্জুর হইয়া যাইত, তাহার পর গো-শকটের চক্রাঘাতে তিন মাসের মধ্যে পথের মধ্যে মধ্যে 'হাঁড়োল' (গর্ত্ত) হইত ; গাড়ী চলিতে চলিতে তাহার চাকা যখন 'হড়াস্' শব্দে সেই হাঁড়োলে পড়িত, তখন গাড়ীর আরোহীর সর্ব্বাঙ্গে যে ঝাঁকুনী লাগিত, তাহাতে প্রাণ খাঁচা ছাড়িবার উপক্রম করিত। তাহার পর চুয়াডাঙ্গায় পৌঁছিয়া মনে হইত, পাঁজরার হাড়গুলি গুঁড়া হইয়া চামড়ায় বাধিয়া আছে।

দেহের এই অবস্থা লইয়া 'বুকিং আফিসে' প্রবেশ করিলাম ; বুকিং-ক্লার্ক পরিচিত যুবক ; সে বলিল, "এত রাত্রে যে ! উল্টো পথে কোথায় যাবেন ?" আমি দামুকদিয়া ঘাটের টিকিট লইয়া রাত্রি তিনটার সময় ট্রেনে চাপিলাম। ভাল গরুর গাড়ী এই ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়াইয়া বাজী মারিতে পারিত। চারিটি ষ্টেশন পার হইয়া পোড়াদহে আসিতেই পূর্ব্বাকাশ অরুণাভ হইল। তাহার পর যখন দামুকদিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল।

তখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। পদ্মার জলরাশি কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। রেল-লাইনের দুই পার্শ্বে যে নিম্নভূমি ছিল, তাহা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল ; অদূরবর্ত্তী পাট ও আখ ও 'গ্যামা'র ক্ষেত্রে এক-বুক জল ! দামুকদিয়া ঘাটের নিকট অসংখ্য বাবলাগাছগুলি এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া প্রাতঃ-সমীরণ-হিল্লোলে ঝাঁকড়া মাথা আন্দোলিত করিতে করিতে যেন বলিতেছিল. "নাঃ, আর পারা যায় না।"—আকাশে বর্ষার মেঘের অভাব ছিল

না, কয়েক মিনিটের মধ্যে চারি দিক্ হইতে গাঢ়তর মেঘস্তর ভাসিয়া আসিল, তাহার পর ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি !—গাড়ীর দরজার কাছে একটা কুলী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, মুটে লাগ্‌বি ?"—আমি তাহার মাথায় আমার আসন্ন প্রবাসের সংসার চাপাইয়া আই, জি, এস, এন্ কোম্পানীর 'স্প্যারো' জাহাজে আশ্রয় লইলাম। ষ্টীমারখানি তেমন বড় না হইলেও দোতলা। সাড়ে চার গণ্ডা পয়সা খরচ করিয়া ষ্টীমারের উপরেই আলাইপুর ষ্টেশনের একখানি পীতবর্ণ টিকিট সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ডেকে উঠিয়া গাঁটরি খুলিয়া বিছানা বিছাইলাম, এবং অতৃপ্ত নেত্রে কূলপ্লাবী পদ্মার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বহু দূরে অপর পার ধোঁয়ার মত দেখা যাইতেছিল ! বাড়ীর কথা মনে পড়ায় বুকের ভিতর টন্‌টন্ করিতে লাগিল ; ঝাপসা চোখের পাশে চাহিয়া একখান দোতলা বড় ষ্টীমারকে ধোঁয়া উড়াইয়া কর্কশ বংশীরব করিতে করিতে পদ্মার অপর পারে সাঁড়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। ষ্টীমারের চাকার আবরণের উপর নাম ছিল—'এলিগেটর।'—ইনি 'ক্রোকোডাইলে'র সহযোগিনী। যেমন ভীষণ-কায়া নদী, তাহার পারাপারের যানেরও তেমনই বিকটাকার নাম ! 'এলিগেটর্' বহু স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী দ্বারা উদরগহ্বর পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পরিপাক না করিয়া সাঁড়ার জেটিতে উদ্‌গিরণ করিবে। তাহার পর সেই সকল যাত্রী ছোট লাইনের গাড়ীতে চাপিয়া রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, কুচবিহার, সিলিগুড়ি অঞ্চলে যাইবে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় সুবিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রীজ প্রস্তুতের কল্পনা সরকারের ও রেল-কোম্পানীর বড় বড় মাথা আলোড়িত করিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু এই সুবিরাট সেতু ও সাঁড়া হইতে উত্তরাঞ্চলে 'ব্রডগেজ' রেল লাইনের সম্ভাবনা আমাদের স্বপ্নেও স্থান পায় নাই।

সকালে আটটার সময় 'স্প্যারো' ষ্টীমার রাজসাহী ও মালদহের যাত্রী লইয়া দামুকদিয়া ঘাটের জেটি ত্যাগ করিল। আমি মামার বাড়ী যাইব, এ জন্য রাজসাহীর টিকিট না লইয়া আলাইপুরের টিকিট লইয়াছিলাম। ষ্টীমার নদীর কূলে কূলে চলিতে লাগিল, সেই বর্ষার পদ্মার স্রোত এরূপ প্রখর যে, সেই স্রোত প্রতিহত করিয়া উজাইয়া যাইতে ষ্টীমারের চাকা অতি ধীরে ঘুরিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে জলরাশি ঘুরিতেছিল ; সেখানে ষ্টীমার সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। পদ্মার কোন কোন স্থানে আবর্ত্ত এরূপ ভীষণ যে, ষ্টীমার সেই সকল আবর্ত্ত দূরে রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। যদি কোন নৌকা সেই সকল আবর্ত্তের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই নৌকা আবর্ত্তের প্রভাব হইতে দূরে লইয়া যাওয়া অসাধ্য। নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভীষণ আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলে আকৃষ্ট হয়, তাহার পর তাহা নতমুখে পশ্চাদ্ভাগ ঊর্দ্ধে তুলিয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করে। পদ্মাবক্ষস্থ এই আবর্ত্তগুলি কিরূপ ভয়ানক, তাহা পূর্ব্বে কোন দিন কল্পনা করিতে পারি নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে কুমারখালি গিয়া শুনিয়াছিলাম—সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সিটী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের বড়দাদা রাধাগোবিন্দ বাবু কৌতূহল বশতঃ নৌকারোহণে পদ্মার 'পাক' দেখিতে গিয়াছিলেন। নৌকা একটা প্রকাণ্ড পাক হইতে কিছু দূরে থাকিতে মাঝি নৌকা থামাইয়া সেই পাকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তিনি মাঝিকে সেই পাকের আরও কাছে যাইবার জন্য আদেশ করিলে মাঝি বলিয়াছিল, নৌকা পাকের টানের মুখে পড়িলে প্রাণরক্ষা করা অসাধ্য হইবে ; কিন্তু অসমসাহসী আরোহী মাঝির কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে আর একটু অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে নৌকা পাকে পড়িল এবং কয়েকবার ঘূর্ণিত হইয়া তলাইয়া গেল। কাহারও প্রাণরক্ষা হইল না।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আলাইপুর ষ্টেশনে ষ্টীমার হইতে নামিয়া চক্ষুস্থির। ষ্টেশনটি

যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক বর্ষার জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। সুবিস্তীর্ণ পাথার পার না হইলে জলঙ্গী পৌঁছিবার উপায় নাই। আলাইপুর ষ্টেশন হইতে মামার বাড়ী জলঙ্গী এক ক্রোশেরও অধিক। পাথারে তিন চারি হাত গভীর জল। সৌভাগ্যক্রমে একখানি ছোট ডিঙ্গী পাইলাম, তাহাই ভাড়া করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে জলঙ্গীর থানার নীচে নামিলাম। সেই স্থান দিয়া জেলা বোর্ডের মেটে পথ বহরমপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত। এখন আর সেই জলঙ্গীর অস্তিত্ব নাই, পথ, থানা, রাজার, অট্টালিকা, পুষ্করিণী সকলই পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। বেলা ১টার সময় মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। স্থির হইল, সেখানে দুই দিন বাস করিয়া রাজসাহী যাইব।

(১১)

পূজনীয় 'মাষ্টার মহাশয়'—জলধরবাবু এই নগণ্য লেখকের কথার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, 'হিমালয়ে' যে উচ্ছ্বাসগুলি আছে, তাহাই মাত্র আমার নিজস্ব। কিন্তু যাঁহারা হিমালয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, হিমালয়ের পথের কথা, নদ-নদী, নির্ঝর, চটি প্রভৃতি তাঁহার নিজস্ব কথা ভিন্ন আর যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই উচ্ছ্বাস। ভাবপ্রবণতাই উহার বিশেষত্ব। এই অক্ষম লেখক মুহুরীরূপে তাঁহার মুখের বর্ণনা শুনিয়া লিখিয়া যাইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে 'একটু থামিতে বলিয়া' নিজেই রচনা করিয়া ঠিক একই সুরে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে ভাব ও ভাষাগত সামঞ্জস্য রাখিয়া, (কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংযোগ করিয়া) সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসগুলি লিখিয়া ফেলিতেছে, এরূপ শক্তি, কোন মহুরী দূরের কথা, কোন লেখকেরই আছে কি? মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং তাহা পারেন?

আমার শুভানুধ্যায়ী ভক্তিভাজন জলধর বাবুর যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসচিত্রে' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি অধুনা-লুপ্ত 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সকলগুলিই সুমার্জ্জিত, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় পল্লবিত, ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট করিবার সকল ভার জলধর বাবু এই অধম সাহিত্যসেবকের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি যথাসাধ্য পরিশ্রমে প্রবন্ধগুলি পারিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিলে, সেই ভাবেই কয়েকটি 'জন্মভূমি'তে ও অবশিষ্টগুলি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। জলধর বাবু এই দীর্ঘকাল পরে এ কথা বিস্মৃত হইয়া 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন। জলধর বাবু সাধু ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন,—আমিও অল্প লিখি নাই। আমাদের উভয়ের ভাষা, রচনা-প্রণালী (ষ্টাইল), এবং প্রকাশভঙ্গি যাঁহাদের সুপরিচিত—তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন আমার রচনার ভাষা প্রবাসচিত্রের প্রত্যেক প্রবন্ধে পরিস্ফুট; সুতরাং জলধর বাবুর অন্য কোন পুস্তকের ভাষার সহিত প্রবাসচিত্রের ভাষার সাদৃশ্য নাই। 'সাহিত্যে' প্রকাশের জন্য প্রেরিত কোন প্রবন্ধের ভাষা পরিমার্জ্জিত করিবার প্রয়োজন হইলে সাহিত্য-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অতি যত্নে সেই কার্য্যটি স্বয়ং করিতেন, সে ভার তিনি অন্য কোন লেখকের হাতে কখনও ছাড়িয়া দিতেন না—তা যিনি যতই নামজাদা লেখক হউন।

জলধর বাবু 'হিমালয়ে'র রচনাসংক্রান্ত সকল ভার আমার আগ্রহেই আমার হাতে ছাড়িয়া দেওয়ায় উহার ভাষার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করি নাই। তাঁহার চোখের জলে, কি আমার বুকের রক্তে এই সৌধের গাঁথুনী হইবে—এ বিষয়ে তিনিও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সেই সময় আমি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' পাঠ করিতেছিলাম, আমি সেই পুস্তকের ভাষায় এবং তাঁহার রচিত কবিতাগুলির প্রতি

আকৃষ্ট হইয়া, যৌবনসুলভ উৎসাহে 'হিমালয়ে' কবিবরের 'পত্রে'র ভাষারই অনুকরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে তাঁহার কবিতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া রচনাটি সরস করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ সকল কথা ত জলধর বাবুর অজ্ঞাত নহে। জলধর বাবু সাধু-ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমিও লিখিয়াছি। কিছুদিন হইতে তিনি চলতি ভাষায় লিখিতেছেন। তিনি চলতি ভাষায় লিখিতে পারেন, সাধু ভাষার অন্য লেখক তাহা পারে না, তাঁহার এরূপ মন্তব্য কি যুক্তিসহ ? আমি তাঁহার শ্রেষ্ঠতা কোনও দিন অস্বীকার করি নাই, এবং তাঁহার সাফল্য-গৌরব আমার কঠোর শ্রমের পুরস্কার বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি। আমি তাঁহার জন্য কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহাও তিনি জানেন। এই জন্য তাঁহার উক্তির প্রতিবাদে এ সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিতেছি। তিনি 'দুটি কথা' না লিখিলে আমি আর একটি কথাও লিখিতাম না।

আমি যে সময় মহিষাদলে ছিলাম, সে সময় আমাদের মেহেরপুর মহকুমায় পাঁচ সাত জনের অধিক উকীল ছিলেন না ; বি-এল, উকীল এক জনও ছিলেন না। সে সময় অনেকে এল এ পাশ করিয়া আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইতেন। কাকার ইচ্ছা ছিল, আমি কোন-রকমে এল-এ পাশ করিতে পারিলে আমাকে উকীল বানাইয়া গ্রামে বসাইবেন ; আমি 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে' থাকিব। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে মহিষাদলে লইয়া গিয়া স্কুলের মাষ্টারদের খাতায় আমার নাম লিখাইয়াছিলেন ; এবং আমি গণিতে 'গো-মুখ্খু' ছিলাম বলিয়াই, যদি আমি গণিতে পাশ করিতে পারি, এই আশায় আমার 'আঁক শিখিবার' সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গণিতে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। পরীক্ষা-ফল প্রকাশের পর যে 'ক্রশলিষ্ট' আসিয়াছিল, তাহা আমি নিজেই দেখিয়াছিলাম ; এবং সাহিত্যসেবার প্রতি অন্ধ অনুরাগের জন্যই গণিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া কাকা অনুযোগ করিয়াছিলেন ; তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এত দিন পরে শুনিলাম, সেবার আমি 'আঁকে খুব বেশী নম্বর পেয়ে পাশ' হইয়াছিলাম। এই নবাবিষ্কৃত সংবাদে গৌরবের পরিবর্ত্তে আমি আন্তরিক লজ্জা অনুভব করিতেছি ; এবং অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত আজ আমাকে 'অনেক বেশী নম্বর পেয়ে আঁকে পাশ হওয়া'র কথা সত্যবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। আমার অক্ষমতার জন্য আমিই দায়ী ; সে জন্য ঐ ভাবে বিদ্রূপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? যাহা সত্য, তাহাই লিখিয়াছি, কাহারও যশ হরণ করিবার দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের আমি অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য লেখক—তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে ; তবে চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণেরই বা প্রয়োজন কি ? যে সর্ব্বহারা হইয়া মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামের প্রতীক্ষা করিতেছে, সে কোন্ প্রলোভনে ৪২ বৎসর পরে মিথ্যা কথা লিখিয়া শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরাগভাজন হইবে ?

পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, রাজসাহীর পথে আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে নামিয়া জলঙ্গী গ্রামে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলাম। বাল্যকালে মামার বাড়ীর ঘরে ছাদ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে যে পদ্মার তীরভূমি মসীলেখাবৎ প্রতীয়মান হইত, তাহা তখন দেখি জলঙ্গী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার পর গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জলঙ্গীর সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া পদ্মা আরও পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে ; সে কালে পদ্মাতীরে 'ঝাউবনা' 'আকন্দবনা' প্রভৃতি যে সকল কৃষক-পল্লী দেখিয়াছিলাম, তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান জলঙ্গীও এখন যায় যায়। এ অবস্থায় পদ্মা যদি সুবিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রীজটিকে এক পার্শ্বে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া প্রাচীন খাতে প্রবাহিত হয়,

তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই ; অনেকেই বহুদিন হইতে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন। আশা করি, বহুদর্শী এঞ্জিনিয়ারগণের চেষ্টায় পদ্মার এই আক্রমণের বেগ প্রতিরুদ্ধ হইবে।

জলঙ্গীতে দুই তিন দিন বাস করিয়াছিলাম ; অধিবাসীরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অধিকাংশই ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী। পদ্মার চরে তখন সোনা ফলিত। দধি, দুগ্ধ ও ইলিশ মাছ অসাধারণ সুলভ ছিল। এক শত কুড়ি তোলায় এক সের দুধের মূল্য এক আনা! সেই দুধের সহিত কলিকাতার 'নির্জ্জলা' দুধের তুলনা হয় না। মামাকে বলিলাম, 'মামা, এখানকার গয়লারা দুধে জল দেয় না ?'—মামা বলিলেন, 'হুঃ, নির্জ্জলা দুধেরই খদ্দের নেই, জোলো দুধ কিন্‌বে কে ? তোমার জন্যে চার পয়সার দুধ বেশী নিয়েছি—ঐ দেখ এক ঘটী।'

আমি পূর্ব্বে কখন রাজসাহী যাই নাই শুনিয়া মামা আমাকে সঙ্গে লইয়া রাজসাহীতে রাখিয়া আসিতে সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন বেলা এগারটার পূর্ব্বেই আহারাদি শেষ করিয়া মামার সঙ্গে জেলে-ডিঙ্গীতে উঠিয়া, সেই পাথার পার হইলাম, এবং আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে আসিয়া নদীকূলে বসিয়া রহিলাম। ষ্টীমার তখনও বহুদূরে ; কিছুকাল পরে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি দেখিতে পাইলাম। ষ্টীমার দামুকদিয়া-ঘাট ছাড়িয়া রাজসাহীর রাজাপুর ষ্টেশনে থামিয়াছিল ; তাহার পর পদ্মা পাড়ি দিয়া বেলা প্রায় একটার সময় আলাইপুর ষ্টেশনে আসিল।

এই একতলা ষ্টীমারখানি আলাইপুরে মাল নামাইয়া নঙ্গর তুলিলে আমরা রাজসাহী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টীমার বেলা তিনটার সময় কয়েক মিনিটের জন্য চারঘাট ষ্টেশনে থামিল এবং যাত্রী ও মাল নামাইয়া, অদূরবর্ত্তী বড়ল নামক ক্ষুদ্র শাখানদীর মোহনা ছাড়াইয়া সরদহ ষ্টেশনে আরও কিছু মাল নামাইয়া দিল। চারঘাট ও সরদহ এই উভয় ষ্টেশনের ব্যবধান এক মাইলেরও কম। সরদহ এখন রাজসাহী জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থান, পুলিসের বড় আড্ডা ; শিক্ষানবীশ দারোগাদের শিক্ষালয়। কিন্তু সে সময় এখানে শ্বেতাঙ্গদের রেশমের কুঠী ছিল, ইহার আর কোন উল্লেখযোগ্য খ্যাতি ছিল না। এখনকার মত তখনও বিলমারিয়ায় শ্বেতাঙ্গ জমীদারদের প্রধান কুঠী ছিল।

ক্রমশঃ তালাইমারীর শ্মশানভূমি পার হইয়া ষ্টীমার যখন রাজসাহীর আখড়ার ঘাটে নঙ্গর ফেলিল, অপরাহ্ণের তপন তখন পশ্চিম গগন সুরঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে দিগন্ত-সীমায় অদৃশ্য হইতেছিলেন ; পদ্মার জলরাশিতে লোহিতালোক প্রতিফলিত। ষ্টীমার-ঘাটে বহু লোকের সমাগম দেখিলাম। অনেকে বন্ধুবান্ধবের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। সে সময় কলিকাতা হইতে রাজসাহী আসিতে হইলে যাত্রীরা দামুকদিয়া-ঘাটে নামিয়া ষ্টীমারেই আসিতেন। মুর্শিদাবাদ রেললাইন নির্ম্মিত হইলে অনেকে লালগোলাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া 'ডাউন' ষ্টীমারে আসিতেন। যাঁহারা সারাদিন ষ্টীমারে বসিয়া থাকা কষ্টকর মনে করিতেন ও ব্যয়বাহুল্যে কুণ্ঠিত না হইতেন, তাঁহারা নাটোরে নামিয়া, ঘোড়ার গাড়ীতে আটাশ মাইল অতিক্রম করিয়া রাজসাহী আসিতেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এই পথেরই পক্ষপাতী ছিলেন। নাটোর হইতে রাজসাহী পর্য্যন্ত জেলা-বোর্ডের পথ অতি উৎকৃষ্ট, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রভৃতি জীমদারগণের অর্থ-সাহায্যে এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, মোটর-যান প্রবর্ত্তিত হইলে নাটোর-ষ্টেশন হইতে এক ঘণ্টায় রাজসাহী আসিতে পারা যাইত ; কিন্তু দামুকদিয়াঘাট হইতে ষ্টীমারে রাজসাহী সারাদিনের পথ। রাজসাহীতে রেল-লাইন হওয়ায় এখন পথের কষ্ট দূর হইয়াছে। সে কালে রাজসাহী যাইতে আতঙ্ক হইত।

ষ্টীমার হইতে কাঠের সাঁকোর উপর সিঁড়ি পড়িলে, বোঁচকা-বাণ্ডিল লইয়া মামার সঙ্গে নদীতীরে নামিয়া পড়িলাম। ঘাটে দাঁড়াইয়া কত লোক নবাগত বন্ধু-বান্ধবের সহিত কত উৎসাহে গল্প করিতেছিল, এক এক স্থানে সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবদের হাসির হর্‌রা উঠিতেছিল ; কিন্তু সেই অগণ্য বালক ও যুবকদলের মধ্যে পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম না। জনাকীর্ণ-নদীকূলে আপনাকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইল।

মামা আমার মুখ দেখিয়া বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। নদীতীরেই মামার শ্বশুরালয়। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। মামীর মা তখনও জীবিত ছিলেন ; আমার আদর-যত্নের ত্রুটি হইল না। কিন্তু সে আড়তদারের বাড়ী ; রাজ্যের মাড়ুয়াবাদী ও খোট্টা লইয়া তাঁহাদের কারবার। তাহাদের মধ্যে দুই এক দিন বাস করিয়াই আমি হাঁপাইয়া উঠিলাম। বিশেষতঃ, কাকা আমাকে ঐ সকল সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন ; এ জন্য সেখানে বাস করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠা অনুভব করিলাম। দুই এক দিন পরে মামা বাড়ী ফিরিলেন। আমি কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্র তখন রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল, তিনি তখন 'ভারতী'র লেখক ; আমার নাম তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এক দিন তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ; তিনি আমাকে একটা ভাল 'মেস্‌' খুঁজিয়া লইয়া সেখানে বাস করিতে উপদেশ দিলেন। 'মেসের' সন্ধানে দুই এক দিন কাটিয়া গেল।

এই সময় হঠাৎ এক দিন একটি তরুণ যুবকের সহিত পরিচয় হইল, নাম অক্ষয়কুমার সরকার। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ; তিনি আমার লেখা পড়িয়াছিলেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথের এরূপ ভক্ত আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি আমকে তাঁহার পিতৃদেবের সহিত পরিচিত করিবার জন্য তাঁহাদের বাসায় লইয়া চলিলেন।

অক্ষয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইলাম। সে দিন আমার জীবনের একটি শুভদিন মনে করি। হরকুমার বাবুর ন্যায় দেবপ্রকৃতি, সরলহৃদয়, অমায়িক ভদ্রলোক সকল যুগেই এ দেশে দুর্লভ। তিনি জমীদার, রাজসাহীর করচমাড়িয়ার অধিবাসী ; কিন্তু রাজসাহীতে বাস করিতেন। তিনি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক সার যদুনাথ সরকারের পিতৃ সহোদর। কি শিক্ষায়, কি সামাজিক শিষ্টাচারে ইঁহারা তখন রাজসাহীর আদর্শ পরিবার ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি হরকুমার বাবুর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল ; বাঙ্গালাদেশে এরূপ কোন মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল না, যাহা তাঁহার লাইব্রেরীতে না আসিত। তাঁহার গৃহে রাজসাহীর শিক্ষিত সমাজের মজলিস বসিত। রাজসাহী আসিয়া আমি কোথায় উঠিয়াছি শুনিয়া হরকুমার বাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন। আমি মেসের সন্ধানে ছিলাম শুনিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'মেসে বাস করিতে তোমার কষ্ট হইবে, অক্ষয়ের ইচ্ছা, আপাততঃ তুমি আমার এখানেই থাক। তুমি আমার ছেলেদের মত থাকিবে, তাহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। ইহাতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিও না।'

তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া উচিত কি না, তাহা চিন্তা করিলাম না ; ভগবান্ আমার মনের কষ্ট বুঝিয়াই বুঝি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বিপন্ন প্রবাসীকে আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন। আমি হরকুমার বাবুর দয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। হরকুমার বাবুর বড় জামাই কিশোরী আমাদের জেলার লোক। তাঁহার মামা শ্রীশ বাবু অনেক দিন পূর্ব্বে মেহেরপুরের স্কুল-সবইন্‌স্পেক্টর ছিলেন ; কিশোরী মেহেরপুরে তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন, আমাকে 'দাদা' বলিতেন। বহুকাল পরে তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া আমার আনন্দ হইল ; আমি কিছু দিনের মধ্যেই সেই বাড়ীর ছেলে-মেয়েদেরও 'দাদা' হইয়া উঠিলাম। পূজনীয়

হরকুমার বাবু আমার অভিভাবকের স্থান অধিকার করিলেন ; আর তাঁহার সুযোগ্যা সাধ্বী পত্নীর স্নেহ-করুণার কথা কখন ভুলিতে পারিব না। কোন বিষয়ে আমার কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হয়—সে দিকে এই কোমলহৃদয়া অতিথিবৎসলা মহিলার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের শান্তিপূর্ণ পরিবারে বাস করিয়া আমি প্রবাসের কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। স্বর্গীয় হরকুমার বাবুর নানা সদ্গুণ এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রণালী দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শে তিনি জীবন গঠন করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখ ও সরল প্রাণের উচ্চ হাসি আমি কখন ভুলিতে পারিব না। আমার কোন গুণ ছিল না, তথাপি তাঁহারা আমাকে এত স্নেহ করিতেন, আমাকে কোন অসুবিধা সহ্য করিতে হইত না, ইহা তাঁহাদেরই মহত্ত্ব।

মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সে সময় কলিকাতায় থাকিতেন, তখনও তাঁহার ছাত্রাবস্থা ; আমি রাজসাহী থাকিতে থাকিতেই তিনি এম· এ· ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পূজার অবকাশে তিনি রাজসাহী আসিয়া তাঁহার কাকার বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াইতে আসিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার স্নেহমধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজসাহীর উকীল কুমুদ বাবু সর্ব্বদাই এ বাড়ীতে আসিতেন ; আমি তাঁহাদের সকলেরই স্নেহানুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলাম। রাজকুমার বাবু প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্'—এ কথা সত্য হইলে স্বর্গীয় রাজকুমার বাবু পুণ্যাত্মা ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সাত সাত পুত্রের সকলেই রত্নস্বরূপ ; এই সাত ভাইয়ের মধ্যে সার যদুনাথ যেন 'দ্যুতিমান মধ্যমণি'—যাহার উজ্জ্বল প্রভায় আজ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা গৌরবপ্রদীপ্ত। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবেই তিনি অধ্যাপকের পদ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যদু বাবুর পাঠ্যানুরাগ ও অদ্ভুত শ্রমশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজনবিদিত ; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার সেই প্রথম-যৌবনেই এরূপ পারদর্শিতা হইয়াছিল যে, স্বর্গীয় মিষ্টার এন্ ঘোষ তাঁহার সম্পাদিত 'নেশন'-পত্র সম্পাদনে তাঁহার সহযোগিতা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিতেন। উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাপ্তাহিক বলিয়া 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সেকালে এ দেশের ও য়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল ; এবং সে সময় শ্রীযুক্ত যদুনাথের অনেক প্রবন্ধ ও প্যারা নেশনের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সে কালে ইংরাজী সাহিত্যে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষের পারদর্শিতা শিক্ষিত যুবকগণের আলোচনার বিষয় ছিল, এবং 'বন্দে মাতরমের' সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবার পর শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী সাহিত্যে কত বড় পণ্ডিত—সে কথা লইয়া অনেকেই আন্দোলন আলোচনা করিতেন্।

রাজসাহীতে দিনগুলি পরম আনন্দেই কাটিতেছিল। স্মরণ হয়, যদুনাথ বাবু সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে রাজসাহী যাইতেন, সুহৃদ্ স্বর্গীয় রমণীমোহন ঘোষ তাঁহার নিমন্ত্রণে কিছুদিন রাজসাহীতে কাটাইয়া আসিতেন ; সে সময় পদ্মাতীরে জ্যোৎস্নালোকে এক এক দিন আমাদের যেন আনন্দের হাট বসিত, হাসি গল্প চলিত ; সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত পদ্মা, অপর পারে মুরশিদাবাদ জেলার তটসংলগ্ন শ্যামল প্রান্তর ; দূরস্থ বনরাজী শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে চিত্রপটে অঙ্কিত সুদৃশ্য চিত্রবৎ পরিস্ফুট হইত, বহুদূরে সরদহের তটে সমুন্নত ঝাউ-বৃক্ষশ্রেণী চন্দ্রালোকে ধূসর মেঘের ন্যায় প্রতীত হইত, এবং আমাদের পদপ্রান্তে তরঙ্গোচ্ছ্বসিত পদ্মার

জলরাশি উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ বক্ষে ধারণ করিয়া তরল রজতস্রোতের শোভা বিকাশ করিত। রমণীবাবু তখন বি-এ পাশ করিয়া আইন অধ্যায়ন করিতেছিলেন ; ইহার অনেক দিন পরে তিনি ডাক বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়া নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের পোষ্টাল সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; তাহার পর রাজকর্ম্ম হইতে চির-অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে সমগ্র ভারত ও ব্রহ্মের ডাক বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর জেনারলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অকালে সন্ন্যাসরোগে দিল্লীর প্রবাসে সহসা প্রাণত্যাগ করেন। আজ সকল ঘটনার কথা স্বপ্নের ন্যায় মনে হইতেছে।

রাজসাহীর ধর্ম্মসভা বহুকালের প্রতিষ্ঠান ; এই ধর্ম্মসভাভবনে একটি মুদ্রাযন্ত্র আছে, উহা রাজসাহীর কোন রাজার দান। বহুদিন হইতে রাজসাহী ধর্ম্মসভার মুখপত্রস্বরূপ একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহার নাম 'হিন্দুরঞ্জিকা'। দুষ্ট ছেলের দল সেই কাগজখানিকে 'হিন্দুর গঞ্জিকা' বলিয়া উপহাস করিত। উহা ধর্ম্মসভা-সংলগ্ন তমোঘ্ন প্রেসেই মুদ্রিত হইত। প্রেস ও কাগজখানি সুপরিচালিত না হওয়ায় ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের পরিচালনভার পূজনীয় হরকুমার বাবুর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে আমার অনুরাগের পরিচয় পাইয়া তিনি 'হিন্দুরঞ্জিকা'র প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনের ও পরিদর্শনে ভার আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। সে সময় 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় নীলামের ইস্তাহার, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এবং হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য মামুলী ধরণের দুই একটি পাণ্ডিত্য-খচিত প্রবন্ধ থাকিত, তাহাতে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না ; এ জন্য কাগজখানি কেহই প্রায় খুলিতেন না। কিছু কিছু চাঁদা আদায় হইত, তাহাতেই নির্ভর করিয়া হিন্দুরঞ্জিকা জীবিত ছিল ; নীলামের ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া সরকার হইতেও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইত। আমরা ছোকরার দল 'হিন্দুরঞ্জিকা' হাতে লইয়া বিদ্রোহের সুর তুলিলাম, কোন কোন ধার্ম্মিকের গুপ্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির প্রসঙ্গে আন্দোলন আলোচনা চলিত লাগিল। খোঁচা খাইয়া সুপ্ত বিষধর ফোঁস করিয়া ফণা তুলিল। সে দলে শক্তিশালী সামাজিক মোড়লদেরও অভাব ছিল না ; সে কালের কথা, তাঁহাদের অনেকে পুরুষের চরিত্রদোষটাকে আমোল দিতেন না। আমরা তাঁহাদের দুর্ব্বলতায় আঘাত করায় নানাভাবে আমাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। হরকুমার বাবুর চেষ্টায় ও প্রভাবে আমাদের মাথা বাঁচিল। আমরা যুবকের দল কাগজখানির সংস্কারের চেষ্টা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময় ধর্ম্মসভার তমোঘ্ন প্রেস হইতে আমার একখানি ছোটগল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'বাসন্তী'। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'নেশনে' তাহার প্রশংসাসূচক একটি ক্ষুদ্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেইখানি আমার প্রথম পুস্তক।

রাজসাহী বহুদিন হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র। আমার রাজসাহী গমনের বহু পূর্ব্বে, বোধ হয়, আমার শৈশবকালে রাজসাহী হইতে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। শুনিয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' প্রথমে এই 'জ্ঞানাঙ্কুরে'ই প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি যে সময় রাজসাহীতে ছিলাম, সে সময় সেখানে বঙ্গসাহিত্যের সুলেখকের অভাব ছিল না। রাজসাহী কলেজের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বঙ্কিম-যুগের খ্যাতনামা লেখক ছিলেন ; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরের' যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। যশস্বী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় আমার রাজসাহী-গমনের কিছুদিন পরে 'সিরাজদ্দৌলা' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় শশধর রায় সে সময় কলিকাতার কোন কোন বাঙ্গালা মাসিকে সামাজিক প্রবন্ধ লিখিতেন।

নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথও সাহিত্যানুশীলনে আনন্দলাভ করিতেন। মনে হইতেছে, এই সময় কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রধানতঃ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও উৎসাহে 'সাধনা' প্রকাশিত হইলে 'সাধনা'য় স্বর্গীয় মহারাজের কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় সে সময় রাজসাহীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইতেন। মিঃ পালিতও 'সাধনায়' লিখিতেন। রাজসাহীর উকীল বন্ধুবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন বঙ্গসাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন ; কিন্তু তখনও তাঁহার কবিত্ব-গৌরবে বঙ্গদেশ পূর্ণ হয় নাই। এই উদারহৃদয়, সুরসিক, বন্ধুবৎসল সুহৃদের প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব। বস্তুতঃ, রাজসাহীতে সে সময় সাহিত্যালোচনায় উৎসাহের ও উৎসাহদাতার অভাব ছিল না বলিয়াই নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের আহ্বানে নাটোরের রাজবাড়ীতে মহাসমারোহে সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্মরণ হইতেছে, ১৩০৪ সালে মহরমের ছুটীর সময় এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল ; স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই যজ্ঞের পৌরোহিত্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উৎসবের শেষ দিন অপরাহ্নের ভীষণ ভূকম্পনে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সে আজ ছত্রিশ বৎসরের কথা !

এ সময় স্বর্গীয় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অবসরকালে পূজনীয় হরকুমার বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া নানাগল্পে চিত্তবিনোদন করিতেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কুমুদিনী বাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল ; তাঁহার রচিত বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কোন কোন পাঠ্য পুস্তক থাকিলেও তিনি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিবিধানের জন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। রাজসাহী কলেজের বিজ্ঞানাগারে কি একটা রাসায়নিক পরীক্ষার সময় তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। তিনি সুসামাজিক ও মজলিসী ভদ্রলোক ছিলেন, এবং তাঁহার মিষ্ট স্বভাব ও ব্যবহারগুণে ছাত্রসমাজ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার তখন তরুণ যুবক, নবীন অধ্যাপক, তিনি মুরুব্বীদের দলে তেমন বেশী মিশিতেন না ; আমাদের সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন, এবং আমার সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমি রাজসাহী ত্যাগ করিবার পর বহুদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে তিনি যখন প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, সেই সময় স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি একবার মেহেরপুরে গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি প্রসঙ্গক্রমে মেহেরপুর স্কুলের সম্পাদককে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন বাড়ীতেই ছিলাম শুনিয়া তিনি আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, স্কুলের সম্পাদক আমাকে স্কুলে উপস্থিত হইবার জন্য লোক প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহাকে নিষেধ করেন, এবং স্বয়ং আমার বাড়ীতে আসিয়া দোতলায় একবার আমার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত। আমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার কি আনন্দ ! তাহার পর কত কথা ! কথা যেন আর ফুরায় না। তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত রাজকর্ম্মচারীকে ঐ ভাবে আমার সহিত মিশিতে দেখিয়া গ্রামের মুরুব্বীরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। হেম বাবু কিরূপ সদাশয় ও বন্ধুবৎসল, তাহার উদাহরণস্বরূপ এই তুচ্ছ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলাম। হেম বাবু রাজসাহীত্যাগের পূর্ব্বে পদ্মাতীরে একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখনও সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার্চ্চনার

ব্যবস্থা আছে। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ, ইহা তাহারই নিদর্শন। শুনিয়াছি, হেম বাবু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন দেওঘরে বাস করিতেছেন। এই সহৃদয় বন্ধু-বৎসল সুহৃদের সহিত জীবনে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে—এ আশা নাই। আর কয় দিনই বা বাঁচি? এই বার্দ্ধক্যে অতীতের স্মৃতি বড় মধুময়, কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ করিয়া কাহারও কাহারও মনে কষ্ট দিয়াছি, এবং তাঁহাদের ক্রোধভাজন হইয়াছি—ইহাই আমার পরম দুর্ভাগ্য। অপ্রিয় সত্য গোপন করা উচিত, এই উপদেশ সকল সময় স্মরণ থাকে না।

সুরেশচন্দ্র সাহা নামক একটি সাহিত্যোৎসাহী যুবক এইসময় রাজসাহী হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিল, মাসিকখানির নাম ছিল 'উৎসাহ।' স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র এবং নব্য উকীল স্বর্গীয় সুদর্শন চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তী উৎসাহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের নাম তখন সাহিত্য-সমাজের অজ্ঞাত থাকিলেও তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া উৎসাহে দুই একটি কবিতা লিখিতেন। উৎসাহের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। মফস্বলের ছোট মাসিক হিসাবে উৎসাহ ভালই চলিতেছিল; কিন্তু সুরেশচন্দ্র অকালে প্রাণত্যাগ করায় কিছুদিন পরে উৎসাহ বন্ধ হয়। সুরেশচন্দ্রের অকালমৃত্যু উপলক্ষে রজনী বাবু একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, সেই করুণ মধুর সঙ্গীতটি যে তাঁহার ভবিষ্যৎ খ্যাতির সূচনা, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আমি রাজসাহীতে বাস করিলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই। জানিতাম, তিনি সুগায়ক ও সুরিসক। রাজসাহীর জন্য আদালতে চাকরী আরম্ভ করিয়া, অন্যান্য উকীলের মত তাঁহাকেও চোগাচাপকান পরিয়া, সামলা মাথায় দিয়া ঘুরিতে দেখিতাম, এবং রজনী বাবুর গান ভিন্ন কোন সভা জমিত না, তাহাও জানিতাম।

হরকুমার বাবুর বাসার অদূরে রাজসাহীর সাধারণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজসাহী-কাশিমপুরের জমীদার স্বর্গীয় রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর সেই অট্টালিকা ক্রয় করায় লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এখন রাজসাহীর সাধারণ পুস্তকালয় একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমি রাজসাহী ত্যাগের পর সুপ্রশস্ত ভূখণ্ডে সেই সুদৃশ্য সুবৃহৎ-দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজসাহীর বহু জমীদার এই অট্টালিকা-নির্ম্মাণে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয় বাবু প্রভৃতির চেষ্টায় সেখানে রঙ্গালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই লাইব্রেরী রাজসাহীর গৌরবের প্রতিষ্ঠান। দিঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্-এ এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রভৃতির চেষ্টায় রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' কর্ত্তৃক একটি সুবৃহৎ যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু আমি তাহা দেখিয়া আসি নাই। দিঘাপতিয়ার অর্থ-সাহায্যে রাজসাহীতে অনেক সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজসাহীর গৌরবর্দ্ধন করিয়াছে। পুঁটিয়ার মহারাণী স্বর্গীয়া হেমন্তকুমারী দেবীও রাজসাহীর জনসাধারণের হিতকার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শাশুড়ী স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর বদান্যতা চিরপ্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত 'মহাভারত' বহুদিন পূর্ব্বে প্রধানতঃ তাঁহার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কালে সে কথা অনেকের স্মরণ নাই। এই দীর্ঘকাল পরে রাজসাহীর যে উন্নতি হইয়াছে—সে কালে আমি তাহা দেখিয়া আসি নাই। এখন রাজসাহী দেখিলে আর একটি নূতন নগর বলিয়া মনে হয়। রাজসাহীতে প্রায় তিন বৎসর বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম,—প্রবন্ধান্তরে সে সকল বিষয়ের

আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১২)

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় সেই সময়ের বিখ্যাত মাসিকপত্র 'ভারতী'-তে হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবন-কাহিনী ও তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক অবস্থা কিরূপ ছিল—তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ও হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষায় প্রকাশিত করিতেছিলেন। অক্ষয়বাবু যেমন সুরসিক ও সুবক্তা ছিলেন, সেইরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা উপলক্ষে য়ুরোপের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পত্র-ব্যবহার হইত, তাঁহার কাছে বসিয়া সেই সকল পত্রের প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। তিনি রাজসাহীর বড় উকীল ছিলেন, বিশেষতঃ ফৌজদারী ও দায়রা আদালতের মামলা-পরিচালন-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল। বড় বড় মামলায় তিনি প্রায়ই এক পক্ষে থাকিতেন, এ জন্য তাঁহার অবসর বড় অল্প ছিল ; কিন্তু সেই প্রকার অবসরের অভাবেও তিনি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, এমন কি, হিন্দুশাস্ত্রেরও আলোচনা করিতেন ; অথচ যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে, কিংবা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে তিনি দুই এক কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় করিতেন না ; দীর্ঘকালের আলোচনায় তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় দিতেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—সকল বিষয়েই তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল। বহু দিন পরে সরকার হইতে তিনি সি, আই, ই খেতাব পাইয়াছিলেন ; তাঁহাকে এই খেতাব দিয়া সরকার তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার ভাষা যেরূপ সরল, সেইরূপ মধুর ছিল। 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিতেন, তিনি অক্ষয়বাবুর পাণ্ডুলিপিতে কখনও একটি শব্দও পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁহার রচিত ইতিহাসের ভাষা উপন্যাসের ভাষার মত চিত্তাকর্ষক হইত ; বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়েরও এইরূপ দক্ষতা ছিল। অক্ষয়বাবু প্রথম যৌবন হইতেই বাঙ্গালা রচনায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমরা যখন নিতান্ত শিশু, সেই সময় কুমারখালির গৌরব স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় কুমারখালি হইতে 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' নামক একখানি সাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছিলেন, সে সময় বাঙ্গালায় 'সংবাদপত্রের যুগ' আরম্ভ হয় নাই। তখন বোধ হয়, সোমপ্রকাশ, সুলভ সমাচার প্রভৃতি দুই একখানি সংবাদপত্র ভিন্ন এ দেশে অন্য কোন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিল না ; এ কালের মত সে কালে শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকরা সংবাদপত্র পাঠের জন্য তেমন আগ্রহও প্রকাশ করিতেন না, এ জন্য গ্রামবার্ত্তার গ্রাহকসংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত ছিল এবং বিজ্ঞাপনের আয় কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূজনীয় জলধরবাবু একবার আমাকে কাঙ্গাল হরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিবার ভার দিয়া কতকগুলি পুরাতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন ; তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, কাঙ্গাল হরিনাথ কিরূপ প্রতিকূল অবস্থায় নানাভাবে বিপন্ন হইয়াও দেশের ও দশের সেবায় অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে স্থানীয় অভাব অভিযোগের আলোচনা করিতেন। জমীদার, এমন কি, খোদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনাচার ও খামখেয়ালের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এ

জন্য জমীদারের পক্ষ হইতে প্রেরিত লাঠিয়ালরা তাঁহাকে প্রহার করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল।

'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকার' সম্পাদন উপলক্ষে হরিনাথ তাঁহার তিনজন সাহিত্যনিষ্ঠ সাক্‌রেদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন ; স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। আমার স্মরণ আছে, বহুদিন পূর্ব্বে একবার বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে হরিনাথের তিরোধান উপলক্ষে কুমারখালিতে উৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবে আমরা অনেকেই যোগদান করিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে যে সকল সাহিত্য-সেবক কুমারখালি গমন করিয়া সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, জলধরবাবু পরমাগ্রহে তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রতিবেশী ও আমার বৈবাহিক স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ সাহা মহাশয়ের সুবিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত বৈঠকখানায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও সেই দলে ছিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে সভাস্থলে হরিনাথের গুণমুগ্ধ গ্রামবাসীরা দলে দলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু কার্য্যানুরোধে রাজসাহী হইতে কুমারখালি আসিয়া সভায় যোগদান করিতে না পারায়, তাঁহার সাহিত্যগুরুর প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি নিবন্ধন দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় আবেগপূর্ণ ভাষায় হরিনাথের গুণকীর্ত্তন করিয়া সেই প্রসঙ্গে হরিনাথকে তাঁহার সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিনাথের এই শিষ্যত্রয় উত্তরকালে বঙ্গসাহিত্যের সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আজ পূজনীয় বিদ্যার্ণব মহাশয় ও অক্ষয়বাবু জীবিত নাই ; কিন্তু সাহিত্যসাধনায় তাঁহাদের খ্যাতি চিরদিন অক্ষুন্ন থাকিবে।

অক্ষয়বাবুর পিতা স্বর্গীয় মথুরবাবু রাজসাহীতে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্য হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিয়া আর কুমারখালিতে প্রত্যাগমন করেন নাই। অক্ষয়বাবু রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় শ্রীমান্ আশু ও অশ্বিনী রাজসাহীতেই থাকিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আশু লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকরীবাকরীর চেষ্টা করিতেছিলেন। পরে তিনি সাহেব কোম্পানীর রেশমের কুঠীতে ম্যানেজারের সহকারীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আশু ভাল শিকারী, তিনি সাহেবীয়ানার পক্ষপাতী ছিলেন, হ্যাট-কোট পরিয়া বেড়াইতেন ; এ জন্য আমরা তাঁহাকে 'আশু সাহেব' বলিতাম ; তিনি সুপুরুষ, তাঁহার প্রকৃতিও মিষ্ট। অশ্বিনী তখন রাজসাহী কলেজে এল, এ পড়িতেন। হরকুমারবাবুর পুত্র অক্ষয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব থাকায় তিনি সর্ব্বদা অক্ষয়দের বাড়ীতে আসিতেন, এবং আশু ও অশ্বিনী আমাকে 'দাদা' বলিতেন : তাঁহাদের সেই ভালবাসার সম্ভাষণ কখন ভুলিতে পারিব না। আর একজনের কথাও এত দিন পরে সর্ব্বদা স্মরণ হয়, তিনি বন্ধুবৎসল, এবং বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। তিনি এখন 'রায় সাহেব' হইয়া সরকারের শাসনবিভাগে চাকরী করিতেছেন। অশ্বিনী এখন রাজসাহীর প্রধান উকীলগণের অন্যতম। বহু কাল পরে অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত রাজসাহীতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম ; প্রথম-যৌবনের সেই মধুর স্মৃতি—তিনি এখনও ভুলিতে পারেন নাই ; কিন্তু ওকালতী করিতে বসিয়া এখন আর তাঁহার অবসর নাই। শুনিলাম, রাজসাহী জেলা কোর্টের সে কালের উকীলবর্গের মধ্যে এখন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় বর্ত্তমান আছেন। সে কালে যাঁহারা কলেজে পড়াশুনা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে জজকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার ও আমার কর্ম্মজীবনের গুরু ভক্তিভাজন স্বর্গীয়

মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র দেবেন্দ্রবাবু এবং আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ কবিবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের আত্মীয় শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভায়া মহাশয় ওকালতীতে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় রায় বাহাদুর সর্ব্বদা রজনীবাবুর বাসায় যাইতেন, এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে উকীল-সরকার হইয়া রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করিবেন, তাহা কি তখন কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম ? তাঁহার দাদা রাজসাহীর মুন্সেফী কোর্টে চাকরী করিতেন, এ জন্য সহযোগী কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। দিঘাপতিয়ার রাজা স্বর্গীয় প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের জামাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী আমার রাজসাহীত্যাগের অনতিকাল পূর্ব্বে ওকালতীতে প্রবেশ করেন, এখন তিনি রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল। দিঘাপতিয়ার যে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছিলাম, দীর্ঘকাল পরে সেই স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিঘাপতিয়ার ছোট কুমার বাহাদুর এখন স্থায়িভাবে রাজসাহীবাসী হইয়াছেন।

যাহা হউক, এ কালের কথা ছাড়িয়া এখন সে কালের কথা বলি। সিরাজুদ্দৌলা সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যখন মাসের পর মাস ধরিয়া মৌলিক প্রবন্ধগুলি লিখিতে লাগিলেন, তখন পাঠকসমাজ বিস্মিত হইয়া অবিবেচক, অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, কাপুরুষ, নিষ্ঠুর, নাবালক নবাবের—বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদের অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য সেই 'সাক্ষীগোপালটার' প্রকৃত চরিত্রের বর্ণনা পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি সিরাজুদ্দৌলার রাজোচিত নানা দুর্লভ গুণের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, আমরা এত দিন ইতিহাস বলিয়া যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহা স্বার্থপর বিদেশী ঐতিহাসিকগণের রচিত, পক্ষপাতদুষ্ট, কাল্পনিক উপকথা মাত্র ; সত্য বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করিয়া আমাদের বিভ্রম উৎপাদন করা হইয়াছিল। 'সিরাজুদ্দৌলা' রচনার পরও তিনি সেই সময়ের আর কয়েকখানি ইতিহাস এবং প্রাচীন যুগের 'ঐতিহাসিক চিত্র' লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল 'সিরাজুদ্দৌলা' দীর্ঘকাল বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের চিত্তরঞ্জনের সুযোগ পায় নাই ; কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাহার পুনঃপ্রকাশ রহিত হইল। তিনি অত বড় উকীল হইয়াও, অন্ধকূপহত্যা উড়াইয়া দিয়া কিরূপ অসঙ্গত দুঃসাহসের কায করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয় ! কিন্তু সরকার তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, এবং তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তেই সেই সম্মান শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। এখন আমার সেই প্রথম চাকরীর সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না লিখিলে এই অকিঞ্চিৎকর আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে ; এই জন্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হইলেও তৎসম্বন্ধে নীরব থাকা সঙ্গত নহে বিশেষতঃ, ইহাতে পাঠক-সমাজ প্রায় ৪০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী জেলা-আদালতের সেরেস্তার অতিরঞ্জিত চিত্রেরও কতকটা আভাস পাইবেন, এবং আশা করি, তাহা উপভোগ্য হইবে।

মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত জেলা-জজ মিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের নিকট আমাকে যে সুপারিশ-পত্র দিয়াছিলেন, তাহা আমি শীল সাহেবের কুঠীতে গিয়া তাঁহাকে দিলে শীল সাহেব আমাকে দয়া করিয়া জানাইলেন, মিঃ পালিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মিঃ পালিত পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমার কথা বলিয়াছিলেন ; কিন্তু আফিসে তখন কোন চাকরী খালি ছিল না, এ জন্য তিনি আমাকে তাঁহার সেরেস্তায় শিক্ষানবিশ থাকিতে আদেশ করিয়া, আদালতে সেরেস্তাদার স্বর্গীয় মহেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে বলিলেন। অতঃপর আদালতে উপস্থিত হইয়া শিক্ষানবিশীতে ভর্ত্তি হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইল না। সেরেস্তাদার মহাশয়ের আদেশ হইল—হেডক্লার্ক স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের সেরেস্তায়

ইংলিস ডিপার্টমেণ্টে আমাকে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। আমি পূজনীয় হরকুমারবাবুর বাসায় খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে আরম্ভ করিলাম।

রাজসাহী সহর হইতে কোর্ট প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই তিন মাইল হাঁটিয়া কোর্টে যাওয়া কষ্টকর ; বিশেষতঃ, আদালতের আমলাদের বেলা এগারটার সময় আফিসে হাজিরা দিতে হয় ; এ জন্য দেওয়ানী ফৌজদারী সকল আফিসের কর্ম্মচারীরা আদালতে যাইতে পাল্কী-গাড়ী বা টমটমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। টমটমের ভাড়া প্রত্যেক আরোহীর এক আনা, পাল্কী-গাড়ীর দেড় আনা। উকীল, মোক্তার ও পদস্থ কর্ম্মচারীরা পাল্কী-গাড়ীতে যাইতেন, অল্পবেতনের কর্ম্মচারীরা টমটমের আশ্রয় লইতেন ; এই টমটমগুলি যে কি পদার্থ, তাহা না দেখিলে তাহাদের চেহারা ধারণা করা যায় না। পশ্চিমের এক্কা তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক আরামদায়ক যান। চারি জন আরোহী তাহাতে অতি কষ্টে বসিতে পারে। তক্তার উপর দুর্গন্ধময় মলিন, শতচ্ছিন্ন কাঁথা বা কম্বল ভাঁজ করিয়া পাতিয়া রাখে, তাহাই আরোহীদের আসন ; তাহার সম্মুখে একটু নীচে যে অপ্রশস্ত তক্তা প্রসারিত, তাহাই সারথির সিংহাসন ; তাহার উপর সে পা ঝুলাইয়া বসিয়া, জিহ্বা ও তালুর সংস্পর্শে এক রকম শব্দ করিতে করিতে টমটমের অস্থিচর্ম্মসার, খর্ব্বকার, পুকুরে ঘোড়াটাকে হাতের দণ্ড দিয়া নির্দ্দয়রূপে পিটিতে থাকে। ঘোড়া চলিতে চলিতে দশ পনেরবার থমকিয়া দাঁড়ায়, কখন কখন চারি পা মুড়িয়া শুইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আরোহীরা আসনচ্যুত হইয়া গাড়োয়ানের পিঠে ডিগবাজি খায়! গাড়োয়ান তখন তাহার সিংহাসন হইতে নামিয়া এক হাতে ঘোড়াটাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে, আর এক হাতে ঘোড়ার মুখের দড়ির লাগাম ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু পচা দড়ির লাগাম সেই 'টগ অফ ওয়ারের' জুলুম বরদাস্ত করিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া যায়। অগত্যা গাড়োয়ান সেই লাগামে গেরো বাঁধিয়া ঘোড়াটাকে ধনঞ্জয়দানে অতি কষ্টে তুলিয়া, পুনর্ব্বার চালাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে আরোহীরা 'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার' হয় ; তবে সকল টমটম যে রকম আরোহীভীতিদায়ক নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন, আদালতের কর্ম্মচারীদের আর একটা সুবিধা আছে ; যাঁহারা মাস-কাবারে গাড়োয়ানদের ভাড়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টম্‌টম হইতে নামিয়া নাম-স্বাক্ষরিত এক-টুকরা কাগজ গাড়োয়ানের হাতে দিলেই নিষ্কৃতি। পরবর্ত্তী মাসের প্রথমে গাড়োয়ান সেই টিকিটগুলি ফেরত দিয়া তাহার প্রাপ্য ভাড়া লইয়া যায়।

'ইংলিস ডিপার্টমেণ্টে' হেডক্লার্ক বাবু কৃষ্ণলাল দত্তের নিকট তাঁহার সেরেস্তার কাজকর্ম্ম শিখিতে লাগিলাম। মাসখানেক এই ভাবে কাজ করিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলাম। শীঘ্র কোন চাকরী জুটিবে তাহার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলাম না। হেড ক্লার্ক কৃষ্ণলালবাবুর জামাই স্বর্গীয় মহেন্দ্র ধর কুমারখালির অধিবাসী,—জলধরবাবুর প্রতিবেশী ও তাঁহার স্নেহভাজন ছিলেন। আমি মহেন্দ্রকে চিনিতাম। মহেন্দ্র অন্য কোথাও চাকরী জুটাইতে না পারিয়া শ্বশুরকে ধরিয়া রাজসাহীর জজ আদালতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তিনি তখন দ্বিতীয় 'কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক।' নকলনবিশরা যে সকল দলিলপত্রাদির বা রায়ফয়সালার নকল করে, তাহা আসলের সঙ্গে মিলাইয়া, ষ্ট্যাম্প ঠিক দেওয়া হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া, রেজিষ্ট্রী-বহিতে জমা করিয়া, সেরেস্তাদারের সহি ও মোহরযুক্ত সেই নকল দরখাস্তকারী উকীল মোক্তারদের দেওয়া, এই সকল কর্ম্মচারীর কাজ। মহেন্দ্র তখন মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতন পাইতেন। এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনার মত লোক জজ আদালতে চাকরী করতে এসেছেন কেন? আদালতের চাকরীতে কি কোন 'প্রস্‌পেক্ট'

আছে ? দেখুন, আমার শ্বশুর হেডক্লার্ক, জজসাহেব তাঁকে ভালবাসেন, বিশেষতঃ সাহেব আমাদেরই স্বজাতি ; সকলেই বলেন, সুবর্ণ-বণিকরা বড় স্বজাতিবৎসল ; কিন্তু আমি দুই তিন বৎসর এই সামান্য চাকরীতেই প'ড়ে আছি, উন্নতির কোন আশা দেখ্‌ছি নে। আমারই যখন এই অবস্থা, তখন কেবল পালিত সাহেবের সুপারিশে আপনার কি সুবিধা হবে, তা বুঝ্‌তে পারিনে। এ সব চাকরীর চেয়ে কোন ছোট-খাট মুদীখানার দোকান ঢের ভাল।"

আমি বলিলাম, "আরও দিনকতক দেখি ত, ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চ'লে যাওয়া আর শক্ত কি ? যে দিন ইচ্ছা, দোয়াত কলম ফেলে রেখে স'রে পড়লেই চল্‌বে।"

যাহা হউক, আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সেরেস্তার কাজ শিখিতে লাগিলাম, এবং এই উপলক্ষে আফিসের অনেক কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় হইল। ইহাদের মধ্যে জজ আদালতের বেঞ্চক্লার্ক স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায় এবং নকল সেরেস্তার কর্ত্তা মোহিনীবাবু প্রধান।

স্বর্গীয় মোহিনীমোহন রায়ের হস্তে নকল সেরেস্তার ভার ছিল ; কারণ, তিনিই তখন 'হেড কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক।' এক এক দিন তাঁহার সেরেস্তায় প্রবেশ করিয়া দেখিতাম, তিনি ও তাঁহার দুই জন সহকারী শ্রেণীবদ্ধভাবে চেয়ারে বসিয়া নকল সেরেস্তা পরিচালিত করিতেন। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত টেবিলের চারি দিকে বারো চৌদ্দ জন নকলনবিশ এক একখানি ক্ষুদ্র টুলে উপবিষ্ট। টেবিলের উপর প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটি দপ্তর। প্রত্যেকেই দপ্তর হইতে 'ফোলিও' লইয়া নথির বিভিন্ন অংশ নকল করিতেছে। এক জন নকলনবিশের উপর নক্সা নকলের ভার ছিল। সে একখানি স্বতন্ত্র টেবিলে 'ট্রেসিং'-কাপড় পিন-বিদ্ধ করিয়া নক্সা আঁকিত। ঐ সকল নকলনবিশদের কাহারও বয়স পঁচিশ, ত্রিশ ; কাহারও ষাট-পঁয়ষট্টি। অনেকে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তাহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন মুসলমান। এই সকল নকলনবিশ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; একদল বাঙ্গালানবিশ। তাহারা কেবল বাঙ্গালা দলিলপত্রাদি নকল করিত ; ইংরাজীজানা নকলনবিশেরা সাক্ষীর জবানবন্দী, রায় প্রভৃতি নকল করিত ; প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালা নথিপত্রাদিও তাহাদিগকে নকল করিতে দেওয়া হইত। বাঙ্গালানবিশদের অপেক্ষা তাহাদের মাসিক আয় অনেক অধিক হইত ; কিন্তু সকলের আয় সমান হইত না। বাঙ্গালা নকলনবিশরা মাসিক ১৫/২০ টাকা উপার্জ্জন করিত, ইংরাজী নকলনবিশরা কেহ ২৫৲ টাকা, কেহ বা ৪০৲ টাকাও পাইত। আয়ের এইরূপ পার্থক্যের অনেক কারণ ছিল ; তন্মধ্যে প্রধান কারণ, 'হেড কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক' মোহিনীবাবুর খেয়াল। তিনি যাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিতেন, সে কোন কোন মাসে ৪৫/৫০ টাকাও পাইত। মোহিনীবাবুর কৃপাকটাক্ষের সহিত ভেট বা অর্থের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা কোন দিন জানিবার চেষ্টা করি নাই ; তবে নকলনবিশদের এইরূপ অসমান আয়ের জন্য নকল সেরেস্তার কর্ত্তা সেরেস্তাদার বাবুর নিকট মোহিনীবাবুকে মধ্যে মধ্যে কৈফিয়ৎ দিতে হইত ; মোহিনীবাবুর যতটুকু ইংরাজী বিদ্যা ছিল, তাহাতে নির্ভর করিয়া ইংরাজী ভাষায় কৈফিয়ৎ লেখা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইলেও, যে সকল উকীলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল—তাঁহারাই তাঁহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন, এবং তাঁহার কৈফিয়ৎ এরূপ সন্তোষজনক হইত যে, সেরেস্তাদারবাবু, এমন কি, জজসাহেবও তাঁহার উপর পক্ষপাতের আরোপ করিতে পারিতেন না। দীর্ঘকাল এই পদে নিযুক্ত থাকায়, নকল সেরেস্তার কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে হাইকোর্ট হইতে যে সকল 'সার্কুলার' বাহির হইত, তাহা সমস্তই মোহিনীবাবুর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে নকল সেরেস্তায় কর্ত্তৃত্ব করিতেন ; এ জন্য হরিনাথ নামক একটি কৃষ্ণবর্ণ

খর্ব্বকায় বাঙ্গালানবিশ 'কপিষ্ট' তাঁহাকে 'নায়েব জজ' বলিয়া উপহাস করিত। মোহিনীবাবুর অনুগ্রহে সে বেচারা নকলনবিশী করিয়া কোন মাসে পনের টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না।

নকল সেরেস্তায় তিন জন কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক ছিলেন ; মহেন্দ্রনাথ ধরের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মোহিনীবাবুই এই বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। লোকটির দেহ সুবিশাল, ভুঁড়িটি দেহের অনুপাতে অসাধারণ স্থূল, এবং মস্তকটি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র ছিল ; কিন্তু দেহের সহিত তাঁহার বুদ্ধির সামঞ্জস্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইত। সেরেস্তায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া সে কালের পাঠশালার গুরুমহাশয়দের কথা মনে পড়িত। নকলনবিশদের নকল শেষ হইলে আসলের সহিত তাহা মিলাইয়া লইবার কার্য্যটি তিনি সযত্নে পরিহার করিতেন। অন্য দুই জন সহযোগীর হস্তে সেই ভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় বারান্দায় গল্পের ও তামাকের আড্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোর্টের আঙ্গিনায় কে কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনিয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে ছুটিতেন, এবং নাজীর নন্দগোপালবাবু যখন কাঠের হাতুড়ি হাতে লইয়া ক্রোকী মাল নীলাম করিতে বসিতেন, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নীলাম দেখিতেন ; কোন জিনিস ডাকিয়া লইবার ইচ্ছা হইলে বেনামীতে ডাকিতেন। তাহার পর অপরাহ্ণে যখন নকলের দরখাস্তগুলি নকলনবিশদের 'হাওলা' করিবার সময় আসিত, তখন তাঁহার সিংহাসনে আসীন হইয়া দরখাস্তের মাথায় এক এক জন নকলনবিশের নাম লিখিয়া যাহাকে যেখানি ইচ্ছা নকল করিতে দিতেন ; কেহ কম দরখাস্ত পাইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিলে তিনি তাহার কাগজ-পত্রের বোঁচকা টানিয়া বাহির করিতেন ; এবং সেগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিতেন, "তুমি পাঁচখান দরখাস্ত ফেলে রেখেছ, সাত দিনের মধ্যে নকল শেষ করতে পারনি ; আজ আবার নূতন দরখাস্ত বেশী চাচ্ছ ; কাল প্রথম কাছারীতেই সাহেবের কাছে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব ; তুমি ভারি 'ইন্‌কম্‌পিটেন্ট কপিষ্ট, যাও, আর একখানও দরখাস্ত পাবে না।"

সেরেজদার মহাশয় পাছে মনে করেন, মোহিনীবাবু সেরেস্তার কার্য্যে অমনোযোগী, এই জন্য মোহিনীবাবু প্রতিদিন ন্যূনকল্পে সাত আটবার বিভিন্ন নকলের দরখাস্ত লইয়া সেরেজদারবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, এবং দরখাস্তে কোন গোল থাকিলে, কিম্বা কোন নকল দেওয়া যায় কি না, এ-বিষয়ে সন্দেহের কারণ না থাকিলেও, নানা প্রশ্নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। সেরেজদারবাবু তখন হয় ত রিপোর্ট লিখিতেছেন, কোন মহিলা জমীদারের নাবালক পুত্রের বিবাহের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য জজ সাহেবের নিকট দশ হাজার টাকা মঞ্জুরের প্রার্থনায় দরখাস্ত পেশ হইয়াছে ; সেরেজদার মহাশয় সেই দরখাস্তের একপাশে 'নোট' লিখিতেছেন, মোহিনীবাবু ঝড়ের মত বেগে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "হাইকোর্টের অমুক নম্বর সার্কুলার অনুসারে এই নকল দেওয়া যায় না ; আপনি একবার—" সেরেজদারবাবু কলম বন্ধ করিয়া বলিতেন, "দেখ মোহিনী, তুমি কি আমাকে এক মুহূর্ত্ত, একটু শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না ? আমি ব্যস্ত আছি—যাও এখন।" মোহিনীবাবু মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিতেন, "এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা ! কালই আপনি কৈফিয়ৎ চাবেন—কেন এ দরখাস্তের নকল দেওয়া হ'ল ? তখন কি কৈফিয়তে লিখব—সেরেজদারবাবুর হাতে কাজ থাকায়—" কিন্তু সেরেজদারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আর কথা শেষ করিতে তাঁহার সাহস হইত না ; তিনি সেরেস্তায় ফিরিয়া সদম্ভে বলিতেন, "তুড়ে দু' কথা শুনিয়ে এসেছি ; 'ডিউটি ইজ অলওয়েজ ডিউটি', আমি কি ভয়ে মুখ বুঁজে থাকবার ছেলে ?"—এইরূপ বাক্যবর্ষণ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না ; সেই সময়

উকীল মোহিনী ঘটক আসিয়া বলিলেন, "মিতে, আমার নকলটা হয়েছে ? বড় জরুরি, আজ যে না পেলেই নয় ।"—মোহিনীবাবু বলিলেন, "গাছতলায় খাসা খাস্তা রসগোল্লা বিক্রী হচ্ছে, বাগবাজারের রসগোল্লাকে বলে ওখানে থাক, সেরখানেক নিয়ে এস ত মিতে ! তোমার নকল এখনই 'রেডি' ক'রে দিচ্ছি ।"

অগত্যা রসগোল্লার আবির্ভাব, এবং 'মধুরেণ সমাপয়েৎ ।'

মোহিনীবাবুর এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও সেরেজদারবাবু তাঁহার সবলতার জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন ।

আমি যখন রাজসাহীর জজ আদালতে প্রবেশ করি—সেই সময় নাটোরের বড় তরফ ও ছোট তরফের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মামলা আরম্ভ হইয়াছিল । হরমতুল্লা, কি ঐ রকম নামের একটা আরদালী খুন হইয়াছিল ; হত্যাকাণ্ডের পর তাহার ধড়টি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুণ্ডটি অদৃশ্য হইয়াছিল ! এত কাল পরে সেই মামলার বিশেষ বিবরণ আমার স্মরণ নাই ; তবে দায়রা আদালতে জজ মিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সেই মামলার বিচার করিতেছিলেন । মামলা মোকদ্দমায় বড়লোকের টাকা জলের মত কিরূপ অজস্রভাবে ব্যয় হয়, এবং জিদ বজায় রাখিতে গিয়া এ দেশের বড় বড় জমিদার কিভাবে জেরবার হইয়া থাকেন, এই মামলাটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । মাসাধিক কি প্রায় দুই মাস ধরিয়া এই মামলা চলিয়াছিল, এবং সে কালে কলিকাতা হাইকোর্টের যাঁহারা প্রধান ব্যারিষ্টার ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই কোন না কোন পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়াছিলেন । মিঃ ডব্‌লু সি বোনার্জি, টি, পালিত, এ, চৌধুরী এবং আরও কত জন আসিয়াছিলেন স্মরণ নাই ; মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী বোধ হয় আসেন নাই । মিঃ সি, আর, দাশ সম্ভবতঃ সেই বৎসর কি তাহার পূর্ব্ববৎসর ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিয়াছিলেন ; তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিঃ তখনও পরিস্ফুট হইয়া বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় উদ্ভাসিত করে নাই ; এ জন্য এই মামলা উপলক্ষে সেই সময় রাজসাহীতে তাঁহার পদধূলি পড়ে নাই । সেই সময় শুনিয়াছিলাম, বোনার্জি সাহেব প্রথম দিন পাঁচ হাজার টাকা, এবং তাহার পর যত দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিদিন দুই হাজার টাকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ ইহা অমূলক জনরব নহে । এই মামলায় নাটোরের ছোট রাজাও জড়িত ছিলেন । এজলাসে প্রতিদিন যেন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইত ! জজ আদালতের উকীলের দল কোন এক পক্ষে নিযুক্ত থাকিতেন । বিচারকক্ষ লোকে লোকারণ্য ; আদালতের বিভিন্ন সেরেস্তার কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া আমলার দল মামলার আলোচনায় উন্মত্তপ্রায় ! মোহিনীবাবু মত্তমাতঙ্গের মত পদভরে তাঁহার সেরেস্তা হইতে আদালতের উত্তরদিকের বারান্দা কম্পিত করিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘণ্টায় দশবার এজলাসে যাইতেন, এবং কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষীদের রোমাঞ্চকর জবানবন্দীর সংবাদে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিতেন । এক দিন তিনি এজলাস হইতে আসিয়া বলিলেন, "মহাযুদ্ধ ! ব্যারিষ্টার এ, চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের উকীল ধরবাবুর বিষম বাগ্‌যুদ্ধ হয়ে গেল । তা এ, চৌধুরী হলেন ব্যারিষ্টার ! একে আমাদের পাবনার দুর্গাদাস চৌধুরীর ছেলে, তার ওপর হলেন কি না ঠাকুরবাড়ীর জামাই, মহাকবি রবীন্দ্র ঠাকুরের ভাইঝি-জামাই, যে সে লোক ত ন'ন । তা তাঁর ব্যারিষ্টারী না হয় চার পাঁচ বছরেরই হ'ল, আর আমাদের—ধরবাবু পাকা উকীল, ফৌজদুরী মামলায় দিক্‌পাল বল্লেই হয়, তা তিনি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কথার লড়াই ক'রে কি জিততে পারেন ? মিঃ চৌধুরী আজ—ধরবাবুকে খুব শুনিয়ে দিয়েছেন ; আমরা হ'লে ত (দুই চক্ষু মুদিত করিয়া ও জিহ্বা বাহির করিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে) ঐ এজলাসের মধ্যেই মূর্চ্ছা যেতাম !"

তাঁহার কথা আর ফুরায় না। নকলনবিশরা কাগজ-কলম ফেলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখব্যাদান করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার সেই অপরূপ মুখভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে করিতে গল্পসুধা পান করিতেছিল। সকলেই বলিয়া উঠিল, "কি, ব্যাপার কি, তাই বলুন ; মূর্চ্ছা যাওয়ার মত কি কাণ্ড ঘটল বড়বাবু!"

মোহিনীবাবু আবার আরম্ভ করিলেন, "আরে, চৌধুরীসাহেব অল্পদিনের ব্যারিষ্টার কি না, তাই পাকা উকীল—ধরবাবু তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বল্লেন, আপনার ত মাত্তর দু' বছরের অভিজ্ঞতা ?—এ কথা শুনে চৌধুরী সাহেব হেসে বল্লেন, 'দু' বছরের অভিজ্ঞতা, বারো বছরের অজ্ঞতার চেয়ে ভাল।' আঃ, শুনে—ধরবাবুর মুখ চূণ হয়ে গেলো। কেমন মুখের মত জবাব! না হবে কেন'—ইত্যাদি।

এইরূপ প্রতিদিন এজলাসের নূতন নূতন গল্পে মোহিনীবাবু তাঁহার এজলাস সরগরম রাখিতেন। অথচ এই মামলা উপলক্ষে নকল বিভাগের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কাহারও নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর ছিল না।

মোহিনীবাবু খুব মজার লোক ছিলেন এবং একাই আফিস সরগরম করিয়া রাখিতেন, এ জন্য আমলাদের মধ্যে প্রথমেই তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। নকলনবিশরা কখন কখন তাঁহার উপর পক্ষপাতের আরোপ করিয়া সেরেস্তাদার মহাশয়ের নিকট নালিশ করিলে মোহিনী কি ভাবে আত্মসমর্থন করিয়া জয়লাভ করিতেন, সেই কাহিনী যেমন উপভোগ্য, সেইরূপ হাস্যোদ্দীপক, সে সকল কথা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আমি কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিবার পর জজসাহেব হেডক্লার্কের তত্ত্বাবধানে আমাকে সেসনস্ বিভাগের কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সেরেস্তার সহিত ঐ বিভাগের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

(১৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিনাথ নামক বাঙ্গালানবিশ 'কপিষ্ট'এর সহিত 'হেড কম্পেয়ারিং ক্লার্ক মোহিনী বাবুর সদ্ভাব ছিল না, এই জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হরিনাথের পারিশ্রমিক কোন মাসে ১৫৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিত না ; অথচ বাঙ্গালা-নবিশ অন্যান্য কপিষ্ট হরিনাথের অপেক্ষা অনেক অধিক উপার্জ্জন করিত। এ জন্য হরিনাথ মোহিনী বাবুর ব্যহারে পক্ষপাতের আরোপ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সেরেস্তাদার বাবুর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল ; সেই দরখাস্তে আরও দুই এক জন কপিষ্টের স্বাক্ষর ছিল। সেরেস্তাদার বাবু সেই দরখাস্ত পাইয়া মোহিনী বাবুর কৈফিয়ৎ তলপ করিলে মোহিনী বাবু মহা উৎসাহে সেই সকল 'কপিষ্টের' নানাপ্রকার গাফিলী ও ত্রুটি প্রদর্শন করিলেন। তিনি দেখাইলেন, কোন নকলনবিশ নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে নকল 'রেডি' করিতে পারে নাই, কোন নকলনবিশ নকলের 'ফলিও'তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা কম শব্দ লিখিয়া নকলে অধিক 'ফলিও' ব্যবহার করিয়াছে ; ইহাতে নকলের দরখাস্তকারীর, ক্ষতি হইয়াছে এবং হাইকোর্টের সার্কুলারের আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে ; কোন নকলনবিশ মূল দলিলের লেখা পড়িতে না পারিয়া 'ফলিও'র নকলে অত্যন্ত অধিক কাটাকুটি করিয়াছে। এক জন নকলনবিশ একখানি উইল নকল করিবার সময় একটি কৈফিয়তের নকলে হাস্যোদ্দীপক ভুল করিয়াছিল। উইলের শেষে কৈফিয়ৎ ছিল,—দলিলের অমুক পৃষ্ঠায় অমুক লাইনে 'কালিমোছার দাগ' থাকিল। নকলনবিশ নকল করিয়াছিল, দলিলের অমুক পৃষ্ঠায় অমুক লাইনে 'কালিমোহন দাস' থাকিল। নকলনবিশের এই অদ্ভুত বর্ণজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া গম্ভীরপ্রকৃতি সেরেস্তাদার

বাবুও হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সকল নকলনবিশ 'মাছিমারা কেরাণী'র আদর্শ। মামলায় মোহিনী বাবু জয়লাভ করিয়া তাঁহার সেরেস্তায় ফিরিয়া লম্ফ-ঝম্প করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছিল, সেরেস্তাদার বাবুর দয়ায় তাহারা সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিল বটে, কিন্তু লঘু দণ্ডস্বরূপ কাহারও দুই দিন, কাহারও চারি দিন 'হাওলা' বন্ধ থাকিল, অর্থাৎ ঐ কয় দিন তাহাদিগকে নকলের দরখাস্ত দেওয়া হইল না। মোহিনী বাবু এই ভাবে দীর্ঘকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে নকল সেরেস্তায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন ; শুনিয়াছি, তাঁহাকে অন্য সেরেস্তায় উচ্চতর পদে বদলি করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি সেরেস্তাদার মহাশয়ের নিকট দরবার করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মহাপুরুষের উক্তি, সিংহের ল্যাজ হওয়া অপেক্ষা কুকুরের মাথা হওয়া ভাল।"

শীল সাহেব যখন রাজসাহীর জজ, সেই সময় স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায় পেস্কারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অবিনাশ আমার অপেক্ষা বয়সে অল্প কিছু বড় ছিলেন ; অল্পদিনেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। অবিনাশ পেস্কারী কার্য্যে এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, রাজসাহীতে যখনই যে জজ আসিয়াছেন, তিনিই অবিনাশের পক্ষপাতী হইয়াছেন। অবশেষে এক জন সিভিলিয়ান জজ নদীয়ায় বদলী হইলে তিনি অবিনাশকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া তাঁহার নাজিরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই পদে চাকরী করিতে করিতে অবিনাশ পরলোকে গমন করেন। কিন্তু আমি যত দিন রাজসাহী ছিলাম, অবিনাশের সহিত একত্র চাকরী করিয়াছি ; অবিনাশ আফিসের কাজে নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করিতেন। জজের পেস্কারী চাকরী করিয়া অবিনাশ ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা 'উপরি' উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপরি উপার্জ্জনের লোভ করেন না, আদালতে এরূপ আমলার সংখ্যা অত্যন্ত বিরল ; কিন্তু অবিনাশ ধনাঢ্য পিতার সন্তান না হইলেও কখনও কাহার সম্মুখে হাত পাতেন নাই, অথচ সাধ্যানুসারে সকলেরই উপকার করিতেন ; এ জন্য আদালতের উকীলরা ও স্থানীয় ভদ্র-লোকরা অবিনাশকে ভালবাসিতেন, সেরেস্তাদার মহাশয়ও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

মিঃ শীল সিভিলিয়ান জজ ছিলেন না, তিনি সবজজ হইতে কার্য্যদক্ষতাগুণে জেলা-জজ হইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান জজের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। সহকারী জেলা জজ ও সেসন জজের পদেও অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেন না। শীল সাহেব সুবিচারক ছিলেন ; কেহ কোন দিন তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ পক্ষপাতের আরোপ করিতে পারে নাই ; কিন্তু আফিসের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের সুখ-দুঃখে কখন তাঁহার সহানুভূতির কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সকলেরই মনে হইত, তাঁহারা যে কলের আদেশে পরিচালিত হইতেছিলেন, তাহার ভিতর হৃদয় নামক কোন পদার্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'তুমি কর্ত্তব্য যথানিয়মে সম্পন্ন কর—কোন কথা নাই ; কিন্তু যদি কর্ত্তব্য-পালনে সামান্য ত্রুটি হয়—তাহা হইলে শাস্তি পাইবে,' কর্ম্মচারীরা তাঁহার এইরূপ মনোভাবেরই পরিচয় পাইতেন। আমরা কোন দিন তাঁহার হৃদয়ের কোমলতার কোন পরিচয় পাই না ; কিন্তু তিনি লঘু অপরাধে কাহাকেও গুরু দণ্ড দিয়াছেন, ইহারও প্রমাণ পাই নাই। সিভিলিয়ান জজরা অনেক সময় যে সকল খুঁটিনাটি উপেক্ষা করেন, শীল সাহেব তাহা লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামাইতেন। কত দিন দেখিয়াছি, সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, তখনও তিনি বাতি জ্বালিয়া কাজ করিতেছেন, বেলা তিনটার সময় খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া তিনি একদলা অহিফেন গলাধঃকরণ করিতেন, তাহার পর মাথা গুঁজিয়া সেই যে রায় লিখিতে বসিতেন, সময় যে

কোথা দিয়া যাইতেছে, সে দিকে তাঁহার খেয়াল থাকিত না।

'সেসনে'র কার্য্য আরম্ভ হইলে কোন কোন দিন, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আমরা নিষ্কৃতি পাইতাম না। আমার বেশ স্মরণ আছে—এক দিন রাত্রি দশটার সময় জজসাহেব তাঁহার টমটমে উঠিয়া কুঠীতে প্রস্থান করিলে আমরা কোর্ট হইতে বাহির হইলাম। সেরেস্তাদার মহাশয় ও হেড ক্লার্ক কোনও উকীলের পাল্‌কি গাড়ীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক টম্‌টমের সম্মুখের দিকে হুড কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক মোহিনী রায় এবং মহাপেস্ (রেকর্ড কিপার) গদাধর রায়, পশ্চাতে আমি ও পেস্কার অবিনাশ রায়। গাড়ী-বারান্দার বাহিরে টম্‌টমে উঠিবার সময় অবিনাশ রহস্য করিয়া বলিলেন, "আমরা চার 'রায়' এক টম্‌টমে চড়িলাম—পথে কি ঘটিবে—কে জানে ?"—যাহা হউক, মাইলখানেক নির্ব্বিঘ্নে চলিলাম ; তার পর হঠাৎ টম্‌টমের ঘোড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারথি ক্রমাগত 'দাণ্ডা' দিয়া তাহাকে পিটিতে লাগিল, কিন্তু সে নিশ্চল।—হঠাৎ একটা বোট্‌কা গন্ধ পাইলাম, তাহার পর আর কি! 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' মহাশয় পথের উত্তর ধারের নয়ঞ্জুলি হইতে ধীরে ধীরে পথে উঠিয়া থাবা গাড়িয়া বসিলেন, এবং টমটমের দিকে চাহিয়া এরূপ এক শব্দ করিলেন, যেন ভূমিকম্প হইল! সেই জ্যোৎস্নালোকেও তাহার চক্ষু দুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল। তাহার পর আর কি ? তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ও গর্জ্জন শুনিয়া টম্‌টমের অশ্বিনী কুমার একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া টম্‌টমসহ পথের অন্য দিকের নয়ঞ্জুলি দাখিল! মোহিনী রায় ও গদাধর রায়—দু'জনের ওজন সাত মণ সাড়ে সাঁইত্রিশ সেরের কম নয়, ডিগবাজি খেলিয়া হেঁটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে এলাহিবক্স কোচম্যানের ঘাড়ের উপর পড়িলেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া একদম্ ঘোড়ার পিঠে, তাহার পর সেখান হইতে গড়াইয়া নয়ঞ্জুলির মধ্যস্থিত কণ্টকেয়ারীর কণ্টক-শয্যায় সুগুরু দেহভার প্রসারিত করিলেন। আমি ও অবিনাশ পশ্চাতের আসন হইতে গড়াইয়া পড়িয়া চাকায় বাধা পাইলাম। ভাগ্যে ঘোড়াটা তখন টম্‌টম ঘাড়ে লইয়া লাফালাফি করে নাই! আমাদের অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যাঘ্র মহাশয় বোধ হয় আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই কৃপা করিয়া আমাদের অঙ্গ-লেহনের প্রবৃত্তি সংবরণ করিলেন ; তিনি এক লাফে জেলা বোর্ডের প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের আট দশ হাত পূর্ব্বে আসিয়া নয়ঞ্জুলিতে নামিলেন এবং আর এক লাফে পথের দক্ষিণ দিকের ক্ষেতে উঠিয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া পদ্মাতীরের দিকে ধাবিত হইলেন।

বাঘ অদৃশ্য হইলে আমরা কণ্টকশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক্! মনে হইল, বুকের ভিতর ঢেঁকি পড়িতেছে! কারণ, রাজসাহীর বাঘ আমাদের পল্লীঅঞ্চলের 'কেঁদো' বা 'গো-বাঘা' নহে ; ইহারা 'রাজকীয় বঙ্গীয়ে'র মাস্‌তুতো ভাই! ইহাদেরই স্বশ্রেণীর একটি নরভুক্ কিছু দিন পূর্ব্বে আড়ানীতে শতাধিক নরনারীকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিয়াছিল ; অবশেষে রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাইজ সাহেব বহু চেষ্টায় তাহাকে বধ করেন।

অবিনাশই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, "কেমন বেয়াই, (তিনি আমাকে 'বেয়াই' বলিতেন) তখনই বলি নি ? কেমন ফল্‌লো কিঁ না ?"

মোহিনী বাবু সুপ্রশস্ত ভুঁড়িতে হাত বুলাইয়া বললেন, "শীল সায়েবের দয়ায় কোন্ দিন বাঘের পেটেই যেতে হবে ; রাত্তির দশটা পর্য্যন্ত আফিস! জজিয়তি ত আর কেউ করে না। একটা সিভিলিয়ান জজ এলে বাঁচি! মার্কণ্ডের 'প্রেমায়' নিয়ে ব'সে আছেন, 'রিটায়ার' করবার নাম নেই, 'সার্ব্বিস্ বই'য়ে বোধ করি দশ বচ্ছর বয়স কম লেখা আছে!"

অবিনাশ বলিলেন, "তোমরা দু'জন সঙ্গে থাক্‌তে আমাদের কোন ভয় নাই। পাহাড়ের

আড়ালে ছিলাম দাদা। তোমাদের ঐ নধর আট মণ গোস্ত ত্যাগ ক'রে আমাদের এই চামড়া-ঢাকা হাড় চিবোতে আস্‌বে—ওরা এত বোকা নয়।"

মোহিনী বলিলেন, "সে ভরসা ক'রো না, ভাই; 'নিয়ারার দি বোন, সুইটার দি মীট,' তোমার আমার চেয়ে বাঘের এ জ্ঞান টন্‌টনে।"

গদাধর বাবু প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি বলিলেন, "আর রসিকতায় দরকার নেই, এখনও প্রায় দু' মাইলের ধাক্কা! ওর জোড়াটা পথে ব'সে আছে কিনা, কে জানে?"

কথাটা অসঙ্গত মনে হইল না। এবার টম্‌টমের 'পাষাণ ভাঙ্গিয়া' লওয়া হইল। অবিনাশ গদাধর বাবুর পাশে বসিলেন। মোহিনী পশ্চাতে আমার পাশে আসিলেন। সত্যই পাহাড়ের আড়ালে পড়িলাম, কিন্তু অবশিষ্ট পথ নির্ব্বিঘ্নেই পার হইলাম।

এই ভাবে সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। তিন বৎসর রাজসাহীতে ছিলাম; শীল সাহেবের পথ ষ্টীনবার্গ, পালিত, ষ্টেলি প্রভৃতি কয়েক জন জজের আমলে চাকরী করিলাম; কিন্তু সেই একঘেয়ে জীবন। ইহারা সকলেই সিভিলিয়ান জজ। শীল সাহেবের মত খুঁটিনাটি লইয়া মাথা ঘামাইতে কেহই ভালবাসিতেন না। ষ্টীনবার্গ বোধ হয় জাতিতে জার্ম্মাণ, খর্ব্বকায়, মুখ লোহিতাভ; অন্যান্য জজের তুলনায় বিলাসী বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার ব্যবহারে আফিসের আমলাদের প্রতি সহানুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যাইত। দুই একটা ঘটনার কথা বেশ মনে পড়ে।

জজসাহেবদের আরদালীদের মধ্যে একজন মুসলমান আরদালীর নাম ছিল আলি সেখ। শুনিয়াছি, আলি এখনও জীবিত আছে, খুব বুড়া হইয়াছে। আলি সাহেবদের কুঠীর অনেক গল্প বলিত। ষ্টীনবার্গ সাহেব জজ হইয়া রাজসাহীতে আসিলে বৈশাখ মাসের শেষে এক দিন আলি বলিল, "বাবু, এবার আপনাদের খুব নিচুফল খাওয়াব।"

অবিনাশ বলিলেন, "নিচু কোথায় পাবে আলি, তুমি কি নিচুর বাগান জমা নিয়েছ?"

আলি বলিল, "খোদা কি আর আমার নশিবে তা লিখেছে। আমাদের সায়েবের কুঠীর বাগানে কত নিচু ফলের গাছ, তা দেখেছেন ত? এবার আমড়ার মত বড় পড় নিচু ফলের ভাড়ে গাছ ভেঙ্গে পড়ছে। আর আর সায়েবদের আমোলে ওদিকে নজর দিবার যো ছেল না। ফল না পাক্‌তে নিকিরিরা এসে গাছগুলো ফলকর জমা লিতো। জজ সায়েব পাঁচ সাত কুড়ি ট্যাকায় তা বিচে ফেল্‌তো। এবার সে দিন এক বেটা নিকিরি এসে আমাকে বুল্‌লে—যদি গাছগুলো তাকে সুবিদে দরে লিয়ে দিতে পারি, ত সে আমাকে পাঁচ ট্যাকা পাণ খেতে দেবে। আমি সায়েবকে সেলাম ঠুকে বুললাম, 'সায়েব, নিচুগুলো ফলকর বিচে দেব?' সায়েব ত পের্‌থমে আমার কথা সম্‌জাতেই পার্‌লো না। শেষে সায়েবকে সম্‌জিয়ে দিলাম যে, এই নিচুফল পাক্‌লে নিকিরিরা গাছগুলোর ফল কিনে ন্যায়; তিন চার কুড়ি ট্যাকায় (আমি একটু হাতে রেখেই বললাম) কিনে ন্যায় কি না, তাই সেই নিকিরি এবারও গাছগুলো ফলকর জমা লিতে এসেছে। তাকে কত দর বল্‌বো হুজুর।—সায়েব খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে বুলেল 'নেই নেই, বেচো মৎ। হাম্‌ সব্‌জি বেচনেওয়ালা সাহেব নেহি। ফল পাড়ো, থোড়া হাম্‌কো দাও, নওকর লোককো দাও, আউর অফিস্‌মে যো সব বাবু লোক হ্যায়—সব বাবুকো ভেজ দাও।' এবার বাবু আপনাদের প্যাট ভ'রে নিচু ফল খাওয়াব।"

আলির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। রাজসাহীর লিচু উৎকৃষ্ট, চারি পাঁচ আনা শ; আলি দুই এক শ লিচু উপহার দিবে। শুনিয়া আনন্দ হইল, এ কথা বলিতে পারি না; কিন্তু এই সামান্য কথায় জজ মিঃ ষ্টীনবার্গের হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। এ পর্য্যন্ত অনেক জজ

রাজসাহী আসিয়াছেন, কিন্তু কেহ ত কোন দিন তাঁহাদের বাগানের ফল আফিসের হতভাগ্য কেরাণীদের দিতে পারেন নাই। আমরা বাঙ্গালী জাতি এতই কৃতজ্ঞ এবং ভাবপ্রবণ যে, উপরওয়ালার এতটুকু সহৃদয়তাতেই মুগ্ধ হইলাম। তাহার উপর তিনি যখন বলিলেন, তিনি 'সব্‌জি বেচনেওয়ালা' সাহেব নহেন, তখন আমাদের মনে হইল, তিনি সত্যই ত 'দোকানদারের জাত' নহেন। আমাদের সেই শ্রদ্ধার মূল্য 'চার পাঁচ কুড়ি' টাকার লিচুর মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক নহে কি ? আমাদের দেশের শ্বেতাঙ্গ উপরওয়ালাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, নির্ভয়ের শক্তি ছিল, তাহা যদি একালে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে জন্য কি কেবল আমরাই দায়ী ? সেকালের মত দরাজ মেজাজের সাহেব একালে আমরা কয় জন দেখিতে পাই ? কেনই বা দেখিতে পাই না ? সেকালের সে সকল ইংরাজ 'নবাব' কোথায় এখন ?

ষ্টীনবার্গ সাহেবের সহৃদয়তার আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আজ এই অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

এ কালের সংবাদ জানি না, সে কালে উনবিংশ শতাব্দীর অবস্থানকালে রাজসাহীতে যখন চাকরী করি, তখন রাজসাহী ও মালদহ এই দুই জেলার মামলার বিচারভার রাজসাহীর জজ ও সবজজের হস্তে অর্পিত ছিল। মালদহে একাধিক মুন্সেফ ছিলেন। মালদহের দায়রার বিচার রাজসাহীর জজকেই করিতে হইত। মালদহের বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার বা আপীল জজ সাহেব রাজসাহীর আদালতে বসিয়া সম্পন্ন করিতেন ; কিন্তু দায়রার বিচারে জন্য জজ সাহেবকে মালদহে যাইতে হইত। জজ-সাহেব দায়রার বিচারের দিন স্থির রাখিতেন এবং দুই তিন মাস অন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে মালদহে উপস্থিত হইয়া বিচারকার্য্য শেষ করিয়া রাজসাহীতে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার ত একা যাইলে চলিত না, তাঁহার পেস্কার, সেসন্‌স ক্লার্ক এবং আর্‌দালী খানসামাকে সঙ্গে লইতে হইত। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় যখন সেসন্‌স জজ, তখন পেস্কার স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে অন্য কেরাণী যাইতেন, মিঃ শীল প্রত্যেকবার সদলে ষ্টীমারযোগেই রাজসাহী হইতে মালদহ যাইতেন ; সুদীর্ঘ নদীপথ ষ্টীমারেই অতিক্রম করিতে হইত।

রাজসাহীর দায়রা বিভাগের কার্য্যভার আমার হাতে আসিলে মালদহের সেসন্‌স আরম্ভ হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে অবিনাশ বলিলেন, "বেয়াই, নথিপত্র গুছাইয়া লও, চল মালদা বেড়াইয়া আসি।" আমি বলিলাম, "সেখানে কি করিতে হইবে ?" অবিনাশ বলিলেন, "এখানেও যা, সেখানেও তাই। তবে প্রয়োজন হইলে দুই একটা কেসের বাঙ্গালা কাগজ-পত্র ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে, সাহেব ত বাঙ্গালা জানেন না। ট্রান্‌স্লেটার শরৎ বাবু অধিকাংশ নথির তর্জ্জমা শেষ করিয়া রাখিয়াছেন, দুই একটি বাকি আছে।" আমার একটু ভয় হইল, তবে পূর্ব্ব হইতেই অনুবাদে অভ্যস্ত ছিলাম—যদিও নথিপত্রের অনুবাদ কোন দিন করি নাই। শরৎ বাবু বি· এ· অনুবাদ ভালই করিতেন, আমি তাঁহার মত ভাল অনুবাদ করিতে পারিব—ইহা আশা করিতে পারিলাম না। হাসিয়া বলিলাম, "শেষে ছাগল দিয়া যব মাড়াইবে ? সাহেব বলিয়া না বসে—'কোন্ উল্লু ট্রাংশ্লেশন কিয়া' ?" অবিনাশ আমাকে অভয় দান করিলেন। আমরা ষ্টীমারে মালদহ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

মালদহ-যাত্রার এক দিন কি দুই দিন পূর্ব্বে স্মরণ নাই, এইটুকু মনে আছে, তখন বসন্তকাল, ফাল্গুনের শেষ। পদ্মার জল নামিয়া খোলে প্রবেশ করিয়াছিল, পদ্মাবক্ষে প্রকাণ্ড চর মাথা তুলিয়াছিল, এবং মালদহগামী ষ্টীমার মধ্যে মধ্যে চড়ায় বাধিয়া দুই এক দিন

সেখানে বসিয়া থাকিত। ষ্টীনবার্গ সাহেব টিফিনের সময় খাস-কামরায় হেড্ ক্লার্ককে বলিলেন, পরদিন সকালে নাটোরে ট্রেন ধরাইবে তাঁহার জন্য পাল্কী গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। হেড্ ক্লার্ক ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "ইওর অনার কি কলিকাতায় যাইবেন, পরশু যে মালদহের সেসনস্ আরম্ভ।" সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তা আমার জানা আছে, সেই জন্যই গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বলিতেছি।" হেড ক্লার্ক কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় সাহেবকে আর কোন কথা বলিত সাহস করিলেন না ; আফিসে ফিরিয়া সেরেস্তাদারবাবুকে বললেন, "সাহেব বলে কি ? নাটোর দিয়ে মালদা যাবে, "টিস্‌কেল' (ঢেঁকিশালা) দিয়ে পুরী ? নাটোর থেকে নৈহাটী, নৈহাটী থেকে হুগলী, হুগলী থেকে রাজমহল, তার পর গঙ্গা পার হয়ে ১৪ ক্রোশ পাল্‌কীতে মালদা যাবে ? পাগল আর কি !"

সেরেস্তাদার বাবু বলিলেন, "সাহেব নূতন এসেছে, রাস্তাঘাটের খবর রাখে না। তা' ছাড়া ষ্টীমারে মালদা যাওয়ার সহজ ও নিকট পথ থাক্‌তে ঐ রকম ঘুরে যেতে বিস্তর খরচ হবে, হয় ত অত বেশী টাকার বিল মঞ্জুর করতে চাবে না ; তখন সাহেবকে পকেট থেকে টাকা দিতে হবে। সাহেব রাগ ক'রে বল্‌তে পারেন, আগে এ কথা কেন বল নি ?"

একাউণ্টেণ্টের উপর সাহেবকে এ কথা জানাইবার ভার পড়িল। তিনি সাহেবকে সেলাম করিয়া কথাটা বলিতেই অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ি। তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, "জানি জানি, নদীপথে মালদা যাব, পথে যদি ষ্টীমার দু'দিন চড়ায় বাধিয়া থাকে, তাহা হইলে কাযকর্ম্মের যে ক্ষতি হইবে, সেসন্‌সের সকল ব্যবস্থার যে ওলট্-পালট্ হইবে—সে জন্য তোমার একাউণ্টেণ্ট জেনারেল দায়ী হইবে ? যাও, মালদহের মুন্সিফকে টেলিগ্রাম কর, কাল রাত্রি বারোটার সময় রাজমহলের পরপারে আমার জন্য পাল্কী থাকিবে।"—একাউণ্টেণ্ট আভূমি মাথা ঘোরাইয়া সেলাম দিয়ে ব্যাঘ্রগুহা হইতে পলায়ন করিলেন ; এবং সেরেস্তায় আসিয়া সাহেবের হুকুম শুনাইলে, অবিনাশ বলিলেন, "বাবা, এ কি মুন্সেফি থেকে জজ যে, কোথায় দু'পয়সা বেশী খরচ হবে—সেই ভয়েই অস্থির ! ও সব বাঘের বাচ্ছা, বিলাতী সিভিলিয়ান—ওদের রকমই আলাদা ! 'সব্‌জি বেচ্‌নেওয়ালা' সাহেব ত নয়।"

সাহেবের পাল্কী পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম চলিয়া গেল। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহেন, সাহেবের জন্য পাল্কী রাজমহলের পারঘাটার অপর পারে ঠিক সময়ে হাজির থাকিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিল না।

সাহেব এজলাস হইতে উঠিবার সময় অবিনাশকে বলিলেন, "তুমি ও সেসনস ক্লার্ক আমার আরদালীদের লইয়া আজ রাত্রিতে রাজমহল 'ষ্টার্ট' করিবে। সোমবার সকালে মালদা 'সার্কিট হাউসে' তোমাদের হাজির চাই।"

শনিবার রাত্রিতে এক গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া দুই বেয়াই-এ নাটোর যাত্রা করিলাম। নাটোরের পথে বৈদ্যবেলঘরিয়া নামক একখানি গ্রাম আছে, সেখানে অবিনাশের কোন আত্মীয়ের বাস। আমরা পথিমধ্যে গাড়ী হইতে নামিয়া সেই ভদ্র লোকের বাড়ী প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম। নাটোর ষ্টেশনে পৌঁছিবার কয়েক মিনিট পরে সিলিগুড়ির ট্রেণ আসিল। রাজসাহী হইতে নাটোর পর্য্যন্ত ১৪ ক্রোশ গরুর গাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বশরীর বেদনায় টনটন করিতেছিল। হায়, কোথায় তখন ছিল রজসাহী—চাপাই-নবাবগঞ্জের ট্রেণ, আর কোথায় বা ছিল এ কালের মোটর কার, ব'স ! ব্যথিত দেহে শ্রান্তমনে ট্রেণে উঠিবার সময় একবার ট্রেণের পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সাহেব গজেন্দ্রগমনে একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণও করিলেন ; তিনিও একবার সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়া লইলেন, আমরা আসিয়া ট্রেণ ধরিয়াছি। সাঁড়া ঘাট ষ্টীমারে পার হইলাম।

নৈহাটীতে নামিয়া পশ্চিমের গাড়ীতে উঠিলাম। হুগলীতে ট্রেণ বদল করিয়া যে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহাতে রাজমহল যাওয়া যায়। সন্ধ্যার পর ট্রেণ বোলপুর ষ্টেশনে থামিলে দেখিলাম, কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে নামিলেন। চাহিয়া দেখি, পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সদলে তাঁহাদের আশ্রমে চলিয়াছেন ; তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন একটি কেশও শুভ্র হয় নাই।

রাত্রি বারোটার সময় রাজমহল ষ্টেশনে নামিলাম, সঙ্গে বিছানা ও দুই জনের দুটি ব্যাগ। প্ল্যাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইতেই সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের বলিলেন. "তোমরা এখনই গঙ্গা পার হইয়া যাও, ওপারে আমার পাল্কী বেহারা আছে, তাহাদের প্রস্তুত থাকিতে বলিবে। আর—আর—সারাদিন তোমাদের বোধ হয় খাওয়া হয় নাই ? অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।" তিনি পকেট হইতে একখান দশ টাকার নোট বাহির করিয়া অবিনাশের হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমরা এই টাকা লইয়া যাও, ভাল করিয়া খাইয়া লও। সকালেই সার্কিট হাউসে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে।"

সাহেব আমাদের অভিবাদনে ললাটে অঙ্গুলি তুলিয়া ডাকবাংলার দিকে কি কোন দিকে চলিলেন, জানি না। অবিনাশ বলিলেন, "দেখ বেয়াই, এ পর্য্যন্ত অনেকবার জজের সঙ্গে গিয়াছি, অনাহারে কষ্ট পাইয়াছি, এ কথা কোন দিন কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই, পকেট হইতে এ ভাবে টাকা দেওয়া ত দূরের কথা। আমাদের এই নূতন জজ, বাহ্য ব্যবহারে কি কড়া ! যেন খেজুর গাছ ; কিন্তু ভিতরে এত রস—মন সহানুভূতি ও করুণায় পূর্ণ ইহা কে জানিত ?"

সেই গভীর রাত্রিতে আমরা যাহা কিছু পাইলাম, খাইয়া লইয়া খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইলাম। অন্ধকার রাত্রি। গঙ্গা পার হইয়া আট জন বেহারাসহ সাহেবের পাল্কী দেখিতে পাইলাম ; তাহাদিগকে সাহেবের জন্য প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতেই পাঁচ সাত জন ঐ দেশী গাড়োয়ান আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাইব ? রাংরেজা ? 'রাংরেজা' অর্থাৎ ইংরেজাবাদ। ইহারা মালদহকে ইংরেজাবাদ বলে, তাহা জানিতাম না। আর্দ্দালী আলি আমাদের জন্য গাড়ী ঠিক করিয়া তাহাতে বিছানা বিছাইয়া দিলে দুই বন্ধুতে তাহাতে শয়ন করিলাম। আলি ও তাহার সঙ্গিদ্বয় অন্য গাড়ী করিল। প্রভাতে বেলা আটটার সময় মালদহ সার্কিট হাউসের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিলাম ; নববসন্তের মৃদু প্রভাতসমীরণ আম্রকূলের গন্ধ বহন করিয়া আমাদের ক্লান্ত দেহে বীজন করিতে লাগিল।

(১৪)

ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, সকল কথা স্মরণ নাই, অনেক কাজের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, আবার দুই-একটা তুচ্ছ কথাও স্মরণ আছে ; এরূপ কেন হয়, তাহা মনস্তত্ত্ববিদরা বলিতে পারেন। রাজসাহীর জজের পেস্কার প্রিয় সুহৃদ অবিনাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যেবার সর্ব্বপ্রথম মালদহে গিয়াছিলাম, তখন বসন্তকাল, এ কথা স্মরণ আছে ; মালদহে উপস্থিত হইয়াই মনে হইয়াছিল, আম্র-মুকুলের সৌরভে মালদহের বায়ুস্তর আমোদিত। মালদহের সার্কিট হাউসের আঙ্গিনায় কয়েকটি প্রকাণ্ড আমগাছ ছিল। আম্র মুকুল তখন প্রস্ফুটিত ; এত অধিক মুকুল হইয়াছিল যে, পাতা দেখা যাইত না। মালদহ আমের বাগানের জন্য বিখ্যাত ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান। যাঁহার দুই তিনটি বড় বাগান আছে, তিনি যেন একটি

ছোটখাট জমীদারীর মালিক ; তবে সকল বৎসর সমান ফল হয় না। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি—সেই বৎসর প্রত্যেক বৃক্ষেই প্রচুর মুকুল হইয়াছিল। কোন কোন দিন অপরাহ্নে অবিনাশের সঙ্গে নগরের বাহিরে বেড়াইতাম ; আম-বাগানের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। মালদহের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। সার্কিট হাউসের অদূরে নদী, ক্ষুদ্রকায়া মহানন্দার জলরাশি অতি নির্ম্মল.—সে দিকে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। নদীর অপর পারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুঁতের ক্ষেত। সে সময় মালদহে রেশমের কারবার ছিল ; রেশম-কীটের আহারের জন্য কৃষকরা তুঁতের আবাদ করিত।

সার্কিট হাউসের সুপ্রশস্ত হল-ঘরে দায়রা আদালত, জজ সাহেবের এজলাস। পার্শ্বস্থ কক্ষে জজ সাহেব বাস করিতেন, আমরা অন্য দিকের কক্ষে থাকিতাম। জজ সাহেবের সঙ্গে এক অট্টালিকায় বাস করিতে আমার একটু সঙ্কোচ বোধ হইত, কিন্তু কোন দিন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রথম দিন আহারের কি ব্যবস্থা করিব, স্থির করিতে না পারায় দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন পথে পথে কাটিয়াছিল, তাহার পর সারাসাত্রি জাগিয়া বয়েলের গাড়ীতে চৌদ্দ ক্রোশ পথ-পর্যটন। মনও ভাল ছিল না। আমার সঙ্গে একটা ঘড়ী ছিল, রদারহামের রূপার ঘড়ী, আমার অবস্থার তুলনায় মূল্যবান্। পূর্ব্বরাত্রিতে রাজমহল হইতে গঙ্গা পার হইয়া গরুর গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণের সময় গাড়োয়ানের লণ্ঠনের আলোকে সময় দেখিয়া ঘড়ীটা বুকের পকেটে রাখিয়াছিলাম। ঘড়ীর কার গলায় ছিল, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, অন্ধকারে তাহা গলা এড়াইয়া গিয়াছিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে দুই জনেই পাশাপাশি শয়ন করিয়া মাথায় মাথায় ঠক্কর লাভের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। গাড়োয়ান আমাদের মাথার কাছে বসিয়া, দুই পা দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া তাহার সম্মুখস্থ সঙ্কীর্ণ জোয়ালে উপুড় হইয়া পড়িয়া এক একবার নাক ডাকাইতেছিল ; কিন্তু অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থা। বলদ জোড়াটার গতি মন্থর হইলে সে হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলদের পিঠে শপাং শব্দে পাচন কষিতেছিল, না হয় পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া উভয় বলদের পেটে পায়ের ডগার খোঁচা দিয়া দুই হাতে তাহাদের লেজ মলিতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বলদের সহিত মধুর কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া বিকৃতস্বরে গালি দিতেছিল, সেই সময় বলদদ্বয়ের দ্রুতগতির ফলে আমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল এবং সেই সঙ্গে সর্ব্বশরীর ভীষণ বেগে আন্দোলিত হইতেছিল। সেই আন্দোলনের ফলে ঘড়ীটি বুকের পকেট হইতে স্খলিত হইয়া, শয্যা অতিক্রম করিয়া, গাড়ীর নীচে পড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। পকেটে ঘড়ী ছিল, সে কথাও স্মরণ ছিল না। পরদিন প্রভাতে সময় দেখিবার ইচ্ছা হইলে দেখি, গলায় কার বা পকেটে ঘড়ী কিছুই নাই। ঘড়ীটা হারাইয়া মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। ভাগ্যে সোনার চেন-ছড়াটা ঐ সঙ্গে ছিল না। আবার মনে হইল, চেনে আবদ্ধ থাকিলে হয় ত অত সহজে হারাইত না। অবিনাশও দুঃখিত হইলেন। আমি বলিলাম, আমারই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কারণ, সাবধানের বিনাশ নাই। অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, "ভুল ; বিনাশের সাবধান নাই। যতই সাবধানে রাখ, যাহা যাইবার, তাহা যাইবেই।" তাহার পর অনেকবার ঠেকিয়া শিখিয়া বুঝিয়াছি, অবিনাশের কথাই ঠিক। তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া, অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়া কত জিনিষ হারাই নাই, অথচ কত যত্নে, কত আগ্রহে, কখন্ হারাই এই আশঙ্কায় চোখে চোখে রাখিয়াছি, যেন ছাড়িয়া দিই নাই, দূরে যাইতে দিই নাই, তথাপি হারাইয়াছি, রাখিতে পারি নাই। এখন কত সময় ইচ্ছা হয়, নিজেকে হারাইয়া ফেলি, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ হয় না। কিন্তু ভগবান ফেলিয়া রাখেন, মৃত্যু কতবার রক্তচক্ষু নৈশ মেল-ট্রেণের মত গর্জ্জন করিয়া ঝটিকাবেগে ছুটিয়া আসে, কিন্তু পাশ দিয়া চলিয়া

যায়। শোকের পর শোকের আক্রমণে শ্মশান-বৈরাগ্য আসে, কিন্তু সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেয় না। আমরা বুড়া হইয়াছি, কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও বুড়ারা জীবনের প্রতি মৌখিক বিরাগপ্রকাশ করেন, আসক্তিহীনতার অভিনয় করেন, কিন্তু পান হইতে চূণটুকু খসিলেই সর্ব্বনাশ। যাঁহারা সাধুতার ভান করিয়া লোকের নিকট দেবতার সম্মান আহরণে ব্যস্ত, পরীক্ষার আগুনে পড়িয়া তাঁহারা অসঙ্কোচে মিথ্যা কথা বলিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করেন, সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, লোকের চক্ষুকে প্রতারণা করাই যেন জীবন-সংগ্রামের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মনুষ্য-হৃদয়ের এই সকল দুর্ব্বলতা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকা একান্ত বিড়ম্বনা। মানুষ চিনিয়া লাভ কি ? যে ডুব দিয়া জল খায়, সে অন্যকে ফাঁকি দিতে পারিলেও আপনাকে ফাঁকি দিতে পারে না, এই জন্য আপনাকে সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টায় যাহাদের হস্তে সে আত্মসমর্পণ করে, তাহাদের নিকট হৃদয়ের দৈন্য গোপন করিতে পারে না। কিন্তু জীবনের সেই নববসন্তে কাহাকেও মন্দ লোক বলিয়া সন্দেহ হইত না, মানুষ স্বার্থান্ধ হইয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, ইহা বিশ্বাস করিতাম না। সাধুতার মুখোস জীবনের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ঢাল মাত্র, তাহাতে বঞ্চিত হইলে বড় বড় ধার্ম্মিক অসহায় হইয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়, এই মর্ম্মান্তিক সত্য তখন উপলব্ধি করিবার শক্তি ছিল না, এ জন্য নিঃসন্দেহে সকলকে ভাল লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাসে একালের মত সে কালে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই। এই জন্য অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিলাম, ঘড়ীটা গাড়ী হইতে পথে পড়িয়া থাকিলে খুঁজিয়া দেখিলেই পাওয়া যাইবে। সকালে সার্কিট হাউসে গাড়ী হইতে নামিতেই পুলিসের এক জন দারোগার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুলিসের সহিত সেসন্‌স্ কোর্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দারোগা বাবুর সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল, আমি ও অবিনাশ তাঁহাকে ঘড়ীর কথা বলিলাম। দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ দুই জন চৌকিদার ডাকিয়া তাহাদিগকে রাজমহলের পথে পাঠাইলেন, পথের উপর নজর রাখিয়া ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার এই আদেশে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কারণ, দারোগা বাবু একটা 'রেপ কেসের' নথি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই নথি রেকর্ডের বাক্সে আমারই জিম্মায় ছিল। তিনি ত ঘড়ীর সন্ধানে চৌকিদার পাঠাইলেনই, তাহার উপর রাত্রিযোগে পোলাও-কালিয়ারও লোভ দেখাইলেন।

যথাসময়ে চৌকিদারদ্বয় শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিল। গাড়ী হইতে রাত্রিকালে কখন্ কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহা কি আর পাওয়া যায় ?

আমরা সার্কিট হাউসে আসিয়াছি শুনিয়া হরি বাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। হরি বাবু কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড জোয়ান, বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব তাঁহার দেহের কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই ; দুই একটা চুল পাকিয়াছিল কি না, স্মরণ নাই। তিনি মালদহের পাবলিক প্রসিকিউটার—বাবু হরিনাথ পালিত। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, অবিনাশ পরিচয় করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনঃকষ্টের কারণও বলিলেন। পালিত মহাশয় শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ দূরের কথা, হো হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন, "চৌদ্দ আনার জিনিস হারিয়েছে, সে জন্য আর এত দুঃখ কেন ?" আমি বলিলাম, "চৌদ্দ আনার জিনিস ?" পালিত বলিলেন, "অবিনাশ ভায়া বল্লে না ওটা তোমার শ্বশুরের দান, বিয়ের যৌতুক, আসল যৌতুক খোয়াও নি, এই-ই ঢের ! আর দুই চারবার রাজমহল ঘুরে মালদয়ে এসো, ট্রাভলিং-এর টাকাতে ওর চেয়ে ভাল সোনার ঘড়ী হবে। এ জজ্ কেমন ? নূতন লোক শুনেছি, জর্ম্মাণের বংশধর।" অবিনাশ বলিলেন, "সবজিবেচনেওয়ালা সাব নেই হ্যায়।" হরিনাথ বাবু বলিলেন, "কি রকম ?" সাহেবের আরদালী অলি (তাহার নাম 'আলি',

নহে 'অলি, রাজসাহীতে অলির সঙ্গে দেখা হইলে, যদি সে আমার ভ্রমের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চিত বলিবে—'বাবু আমার নামখান্ত করেছেন যে !') সেখানে দাঁড়াইয়া নথিপত্র গুছাইতেছিল, অবিনাশ হরিনাথ বাবুকে বলিলেন, "ঐ অলিকে জিজ্ঞাসা করুন।" অলি গল্প পাইলে আর কিছুই চাহিত না। সে জজসাহেবের হাতার লিচু-বাগানের লিচু বিক্রয়ের গল্প বলিল। সে কথা শুনিয়া হরি বাবুর কি হাসি। একালের লোক সে রকম প্রাণ-খোলা হাসি হাসিতে পারেন কি না সন্দেহের বিষয়।

হরিনাথ পালিত মহাশয়ের আর একটি অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি অতি অল্পসময়ে পরকে আপনার করিতে পারিতেন। তাঁহার সঙ্গে সেইবার আমার প্রথম সাক্ষাৎ, কিন্তু কি ভাবে আলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমেই লিখিয়াছি। মামলা-মকর্দ্দমা সংক্রান্ত দুই চারিটি কথার পর তিনি অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার ঠাকুর খুব এক্সপার্ট, বেশী দেরী হবে না, স্নান ক'রে তাড়াতাড়ি এসো। আমাকেও একটু সকালে আসতে হবে, নথিপত্তোরগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে কি না।" তাহার পর তিনি দায়রার আসামীদের প্রসঙ্গে দুই এক কথা বলিবার সময় যে ভাষা ব্যবহার করিলেন, তাহা শুনিয়া আমি মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। ভদ্রলোকের মুখে সেরূপ ভাষা পূর্ব্বে কোন দিন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া হরি বাবু বলিলেন, "আমার মুখে ব্রাহ্ম-সমাজের ভাষা শুন্তে না পেয়ে তোমার লজ্জা হয়েছে। ভাবছো, হরি পালিত কি চাষা ? তা ভাই, আমার এ খোলা ড্রেণ—ময়লা বল, দুর্গন্ধ বল, বেশীক্ষণ জম্‌তে পায় না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ, আর আজকাল তোমাদের রুচিবাতিকগ্রস্ত কবিদের যে ভাষায় কবিতা রচনা হয়, তাতে ঘোমটার ভেতর খ্যামটার নাচ চলে, ভাষার আড়ালে ষোল আনার ওপর আঠার আনা ছি—' সে কালে কবির লড়াই-এ কি রকম 'মোটা' চল্‌ত, তা শোননি বুঝি ? সে একদম তেলে পাকা বাঁশের লাঠি—এক ঘা মাথায় বসালে ত মাথা ছাতু ; আর এক কালের কবির সরু কাটেন, অতি সূক্ষ্ম নীড্‌লের ইন্‌জেকসন—খুট্‌ ক'রে মশায় যেন হুল ফুটুলে, কিন্তু রক্তের সঙ্গে মিশ্‌লো সাংঘাতিক বিষ, শেষে ছমাস ভুগে ব্লড পয়জন হয়ে কতরকম আড়ম্বর ক'রে পটল তুলবে। কচুপোড়া খাক্‌ তোমাদের ঐ সব সুরুচি বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট হ'ল, আর দেরী ক'রো না।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার মুখে কটাক্ষপাত করিলেন।

অলি ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত। সে হরি বাবুকে বলিল, "পেস্কার বাবু ছ্যান ক'রে লিয়ে এক্ষুনি যাবেন। আমি কেরাণী বাবুকে (আমাকে) তার আগেই দোলগোবিন্দ ঠাকুরের হোটেল থেকে খেইয়ে আন্‌চি।"

হরি বাবু অলির কথায় বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি রকম ? তোর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি ! তোর কেরাণী বাবু হোটেলে খেয়ে আস্‌বে কি রকম ? আমি হরি পালিত বেঁচে থাক্‌তে সার্কিট হাউসের বাবুরা খাবে হোটেলে ? তুই আমাকে সেই রকম ঠাউরিয়েছিস্‌। ওহে ও অবিনাশ, আমি কি শুধু তোমাকেই, খেতে যেতে বলেছি ? তুমি ত আচ্ছা বামুনের ঘরের গণ্ডমূর্খ্খু।" অবিনাশ কৃত্রিম রাগ করিয়া মুখ হাঁড়ির মত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আপনি কি আমাকে বলেছেন, তোমার বেয়াইকে শুদ্ধ নিয়ে এসো ? বেয়াই আপনার বাসায় খাবে, তা ওকে না বল্লে রবাহুতের মত নিজে থেকে গিয়ে পাত পেড়ে বস্‌বে ? আপনারই বা আক্কেল কি রকম ?"

হরি বাবু আমার মুখের দিকে দুষ্টুমীভরা চক্ষুতে চাহিয়া বলিলেন, "আমাকে মাফ কর ভাই, আমরা সেকেলে লোক, আটকাটীর বড়ো ধার ধারিনি। আমি ত জানি, আমার বাড়ী

তোমাদেরই বাড়ী, খেতে যাবার কথা বল্‌তে হবে কেন ? নিজের খেয়ালে সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকে বল্‌বে—এই ঠাকুর, ভাত লে আও। আমাকে আবার বলতে হবে—দয়া ক'রে খেতে এসো ভাই! কিছু মনে ক'রো না ভাই, আধঘণ্টার মধ্যে আস্‌তে চাও।"

হরি বাবু প্রস্থান করিলেন ; তাহার পর যতবার মালদহ গিয়াছি, দুবেলা হরি বাবু নিজের পাশে বসাইয়া আহার করাইয়াছেন। তাঁহার মত সরলপ্রকৃতির লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি, অথচ যখন তিনি চোগা-চাপকান পরিয়া, মাথায় সামলা আঁটিয়া দায়রা আদালতে মামলা করিতেন, তখন মনে হইত, এ রকম কুটিল, ফিচেলবুদ্ধি, দুর্দ্দান্ত উকীল আর দ্বিতীয় নাই। সে সময় তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভয় পাইত।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে হরি বাবু দায়রার কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়াছেন ; আমাকে ও অবিনাশকেও সঙ্গে লইলেন। পথে বাহির হইয়াই দেখি এক টমটম, টমটমের আরোহী এক শ্বেতাঙ্গিনী এবং তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট এক জন শ্বেতাঙ্গ মিলিটারী রকমের ভাবভঙ্গী। টমটমের পশ্চাতের আসনে সাহেবী পোষাক পরিহিত এক বাঙ্গালী সাহেব।

আমি কৌতূহলভরে বলিলাম, "পালিত মশায়, উঁহারা হন কাহারা ?"

পালিত বলিলেন, "ঐ বাঙ্গালী সাহেবটি দৈবজ্ঞ।"

আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "দৈবজ্ঞ ! এ কথার অর্থ ?"

পালিত বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পাঁজি-পুথি পরকে-দিয়ে, দৈবিজ্ঞি বেড়ায় হাবাত হয়ে।"

অতঃপর পালিত মহাশয় ত্রিমূর্ত্তির যে পরিচয় দিলেন, তাহা এখানে প্রকাশ করিয়া 'গুমোর ফাঁক' করিতে চাহি না। গুমোর ফাঁক কথাটি পালিত মহাশয়েরই ব্যবহৃত।

মালদহে একটি প্রীতিভাজন সুহৃদ লাভ করিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গীয় উকীল রাধেশচন্দ্র শেঠ। রাধেশ বাবু 'সাহিত্যের' লেখক ছিলেন, সাহিত্য-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয় রাধেশ বাবুকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। সুরেশ বাবুর পরেই রাধেশ বাবু আমার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দায়রা আদালতে রাধেশ বাবুর সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল কথা না লেখাই ভাল। কারণ, সুরেশ বাবু ও রাধেশ বাবু উভয়েই এখন পরলোকে ; অথচ সেই সময় যাহারা দুগ্ধপোষ্য কচি খোকা ছিল, তাহারা এখন মুরুব্বী সাজিয়া অনধিকারচর্চা করিতে আসিবে। কিন্তু সংসারে মোড়লীর নিয়মই এই প্রকার,—

"চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকি জ্বালায় বাতি।
মোগল-পাঠান হদ্দ হ'ল, ফারসী পড়ায় তাঁতি !"

(১৫)

সেসনস্‌ উপলক্ষে বিভিন্ন জজের আমলে অবিনাশের সঙ্গে কয়েকবার মালদহে যাইতে হইয়াছিল। গমনাগমনে কোনরূপ বৈচিত্র্য ছিল না ; সেই ঘুরো পথ, রাজসাহী হইতে নাটোর, এবং রাজমহলের অপর তীরস্থিত সৈকত প্রান্তরে বলদবাহিত শকটে আরোহণ করিয়া মালদহে পদার্পণ, দুই দিকে আটাশ মাইল হিসাবে ৫৬ মাইল গমনকালে এবং ৫৬ মাইল প্রত্যাগমনকালে, মোট ১ শত ১২ মাইল পথ পার হইয়া গো-শকটের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। স্মরণ হইতেছে, পূজার পূর্ব্বে বর্ষার শেষে একবার জজ

মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে দুকূলব্যাপী পদ্মাবক্ষে 'স্পারো' নামক ষ্টীমারে সোজা পথে মালদহ গিয়াছিলাম। তাহার পর জজ ষ্টেলি সাহেবের সঙ্গে কোন্ পথে গিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। কিন্তু ষ্টেলি সাহেবের আমলেই আমার চাকরীর শেষ। মিঃ ষ্টেলি অভিজ্ঞ জজ ; সুবিচারক ছিলেন। আইনে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, এই প্রকার মন্তব্য তখন অনেক উকীলের মুখেই শুনিতাম। তাঁহার পরিচ্ছদে, ব্যবহারে, জীবনযাপনের প্রণালীতে আমাদের দেশের সে কালের অধ্যাপকগণের ন্যায় বিলাসের অভাব লক্ষিত হইত। দীর্ঘদেহ মানুষটি, দেহের অস্থি স্থূল, প্রশস্ত ললাট, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন যে, কত দিন দেখিয়াছি—ছেঁড়া পাৎলুনের শিলাই ঢাকা পড়ে নাই। দেখিয়া অবিনাশের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষীণ সৌদামিনী-প্রবাহের ন্যায় মৃদু আভা বিকীর্ণ করিত। তিনি বলিতেন, "দেখ বেয়াই, যদি আমরা ঐ রকম ছেঁড়া পাৎলুনে লজ্জা নিবারণ করতাম, তা হ'লে লোকে বল্‌ত, বেটা কি কঞ্জুষ! একটা ভাল পাৎলুনও কিন্‌তে পারে না।"

মিঃ ষ্টেলি দ্রুতবেগে হাত চালাইতেন, অতি অল্পসময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রায় লিখেতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেখা, কোন ছত্রে একটিও কাটাকুটি দেখিতে পাইতাম না। মিঃ ষ্টেলি নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তাঁহার মুখে কেহ কোন দিন নিন্দা-প্রশংসা শুনিতে পাইত না। তাঁহার প্রকৃতি গম্ভীর ছিল।

মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিতও ভাল জজ ছিলেন। বাঙ্গালী হইলেও তিনি স্থানীয় উকীলদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না। উকীলদের মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রের সহিত তিনি মিশামিশি করিতেন ; কিন্তু উকীলের হিসাবে নহে, সাহিত্যিক হিসাবে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয় বাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। মিঃ পালিত কবিবরের বন্ধু ছিলেন, ইংলণ্ডেও তাঁহারা দীর্ঘকাল এক সময়ে বাস করিয়াছিলেন। উভয়ে একযোগে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। রাজসাহীতে কবিবরের বিস্তীর্ণ জমীদারী আছে। পতিশরে ইহাদের রাজসাহীর জমীদারীর প্রধান কাছারী অবস্থিত। বিখ্যাত সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার অনেক দিন পতিশর কাছারীর নায়েব ছিলেন। মিঃ পালিত যখন রাজসাহীর জজ, তখন রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে রাজসাহী গমন করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। অক্ষয় বাবুও সে সময় তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতেন।

স্বর্গীয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের গৃহে যে সময় বাস করিতেছিলাম, সেই সময় রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম-এ বি-এল মহাশয় তাঁহার দুই পুত্রের শিক্ষার ভার আমার হস্তে অর্পণ করেন : দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে কিশোরী বাবু অন্তরের সহিত যোগদান করিতেন, এখনও করেন। এই প্রাচীন বয়সে তাঁহাকে উপর্য্যুপরি দুঃসহ শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও আমার প্রিয়ছাত্র অশোক পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছিলেন, প্রথম যৌবনেই ভাল উকীল বলিয়া তাঁহার যশ ও পসারপ্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতেছিল ; জনহিতকর কার্য্যে তিনিও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছিলে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অশোক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে দেহত্যাগ করেন। উপযুক্ত পুত্রের অকালমৃত্যুতে কিশোরী বাবু হৃদয়ে কি আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবে না। তিনি অতি কষ্টে সেই শোক সংবরণ করিলেও তাঁহার সাধ্বী পত্নী এই কঠিন আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। অশোকের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্য কোন লোক পুত্রশোকে, পত্নীশোকে প্রাচীন বয়সে হয়ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ

করিতেন ; কিন্তু কিশোরী বাবু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া শোক সংবরণ করিলেন। প্রাচীন বয়সে জীবনসন্ধ্যাতেও তিনি যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছেন। এখনও তিনি ওকালতীতে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অত্যুৎসাহী ও কর্ম্মঠ সদস্য। রাজসাহীর কল্যাণসাধনে তাঁহার চেষ্টার অন্ত নাই। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন উকীল রাজসাহীতে এখন আর কেহই নাই। ব্যবস্থাপক সভার প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া থাকেন, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার চেষ্টা অল্প নহে। জনসাধারণের দুঃখে-কষ্টে তিনি সর্ব্বদাই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন ; সেই সহানুভূতি মৌখিক নহে, আন্তরিক। তিনি বহুসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রকে স্বগৃহে স্থান দান করিয়া তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

রাজদ্বারে কিশোরী বাবুর সম্মানের অভাব নাই, কিন্তু যে সকল গুণ থাকিলে সরকারী খেতাব 'রায় সাহেবী' বা 'রায় বাহাদুরী' লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারা যায়, সে সকল গুণ তাঁহার নাই। এই জন্য তাঁহার কোন কোন জুনিয়ার সহকর্ম্মী এ বিষয়ে তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; কিন্তু খেতাবের গৌরবে তিনি বঞ্চিত থাকিলেও ভগবান্ তাঁহাকে মনুষ্যত্বের গৌরবে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় গুরুনাথ মুন্সী, হরিচরণ মৈত্র, শশধর রায়, ব্রজগোপাল বাগচী, ভুবনমোহন মৈত্র, প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, সুদর্শন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজসাহীর উকীল-সমাজের অলঙ্কার ছিলেন। সে কালের উকীল-সমাজের মধ্যে আরও দুই জন সেকাল ও একালের মধ্যে স্বর্ণ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের একজন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় ও দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী। আরও এক জনের নাম কোন দিন ভুলিতে পারিব না, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ মনে পড়িতেছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষী সুহৃদ, সুকবি, হাস্যরসিক, স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন, রাজসাহীর 'কান্ত' কবি। বহুদিন তাঁহার সহিত সুখে দুঃখে একত্র বাস করিয়াছি। তাঁহার হাস্য-মধুর, চির-নূতন গল্প শুনিতে শুনিতে কত বিনিদ্র বিভাবরী অতিবাহিত করিয়াছি।—সে কত কালের কথা, কিন্তু তাঁহার মধুর কণ্ঠধ্বনি এখনও যেন শ্রবণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কে বলিবে, এই ব্যবধান কালের গজে পরিমিত হইতে পারে ?

রাণীবাজারের, মালোপাড়ার এবং বড় কুঠীর এক একটি মেসে কিছুকাল ধরিয়া বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে মনের মত সাথী জুটিয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি না। এক জনের কথা মনে আছে ; তিনি বড় কুঠীর মেসে আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় কিশোরীমোহন বাগচী, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কেদারনাথ বাগচী মহাশয় বিলমাড়িয়া কুঠীর নায়েব ছিলেন। কেদার বাগচী মহাশয়ের অর্থ-ভাগ্য সর্ব্বজনবিদিত ছিল। কিশোরী তখন রাজসাহীতে থাকিয়া মোক্তারী পড়িতেন। তিনি হাস্যরসিক, গল্পপ্রিয়, সদাপ্রফুল্ল যুবক ছিলেন। পরে তিনি পৈতৃক পদে নিযুক্ত হইয়া বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া তিনি তরুণ জীবনের সরলতা ও মধুরতায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অত বড় জমীদারীর নায়েব কি না। যে সকল প্রবীণ উকীল এখন রাজসাহীর গৌরব, তাঁহাদের কেহ কেহ ত্রিশ বত্রিশ বৎসর ওকালতী করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি যে সময় রাজসাহী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি, তখন তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থা। কত জন অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ; কেহ কেহ ছাত্র জীবনে আমাকে ভালবাসিতেন, দাদার মত শ্রদ্ধা করিতেন, এখন তাঁহারা রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল, কিন্তু বহুকাল সাক্ষাৎ না থাকায় হয় ত আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় হরকুমার বাবুর তৃতীয় জামাতা শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ

সরকার তাঁহাদের অন্যতম। উপেন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন ; কিন্তু ওকালতী আরম্ভ করিয়া তাঁহার বাতিক ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বাবুর ন্যায় সকলেই সব্যসাচী হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। অনেক সাহিত্য-রসিক উকীল আদালতে দাখিল করিবার জন্য মক্কেলের আর্জ্জি রচনাতেই সাহিত্যরস উপভোগ করেন এবং আর্জ্জির ভাষা সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য কোন উকীল 'একান্নভুক্ত পরিবার' না লিখিয়া '৫১ ভুক্ত পরিবার' লিখিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ পাওয়া যায় না।

পূজনীয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাসায় দীর্ঘকাল বাসের পর আমি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এবং তাঁহাকে একটু অসন্তুষ্ট করিয়াই যে সময় রাজসাহীর বিভিন্ন মেসে বাস করি, সে সময় অফিসের কাজ ভিন্ন সাহিত্যালোচনাতেই আমার অবসরকাল অতিবাহিত হইত। স্মরণ হইতেছে, আমি যখন রাণীবাজারের মেসে ছিলাম, সেই সময় ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। সে সময় মহরমের ছুটী ছিল, আমি সেই সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছিলাম ; মনে পড়িতেছে, তখন গৃহের প্রতি আমার কি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাহার সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে সে সকলই আজ আমার স্বপ্ন মনে হইতেছে। আজ আমার পল্লীভবন অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ; সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার জন্য সেখানে কেহ নাই। যাহাদের কলহাস্যে ও আনন্দপূর্ণ গুঞ্জনে নিরন্তর আমার পল্লীভবন ধ্বনিত হইত, তাহাদের প্রায় সকলে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বহু পূর্ব্বেই ভগবৎচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি আজ একাকী স্বজন-বিরহিত প্রবাসে দুঃখ-পূর্ণ শোকসন্তপ্ত জীবন বহন করিতেছি। কেবল যে দেবীর পূজায় প্রথম-যৌবন নিয়োজিত করিয়াছিলাম, এত দুঃখ-কষ্টে শোকেও সেই আরাধ্যা দেবীর উপাসনা ত্যাগ করি নাই, এবং ইহাই আমার শোকে দুঃখে, বার্দ্ধক্যের নানা রোগ-নিপীড়িত অন্তিম জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয় ; নতুবা হয় ত এত দিন জীবন-ভার বহন করিতে পারিতাম না। পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন ফলের প্রত্যাশা করি নাই। সাধনা নিষ্ফল হইয়াছে, হয় ত ভুলপথে চলিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও দুঃখ নাই পরিশ্রম করিয়া সকলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ইহাই আমার অদৃষ্টের কঠোর বিধান, সে জন্য আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। সাহিত্য-সাধনায় যাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে সাহায্য করিয়াছি, তাঁহাদের কেহ কেহ যশের সৌধচূড়ায় আরোহণ করিয়া আমাকে অস্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই ; এ জন্য আক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু ইহাই সাধারণ মানবের ধর্ম্ম, এ কথা আমার ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। সে কথা স্মরণ থাকিলে আজ আমাকে অনেক লাঞ্ছনার কবল হইতে মুক্ত দেখিতে পাইতাম।

যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। মহরমের ছুটি উপলক্ষে রাণীবাজারের মেসের আমার ঘর বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিলাম। মহরমের শেষ দিন অপরাহ্নে যখন মুসলমান-গ্রামবাসী শ্রমজীবীরা পথে পথে লাঠি ও কাঠের তরবারি লইয়া যুদ্ধের অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে, সেই সময় ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। আমাদর গ্রামস্থ কাহারও বাড়ী-ঘর সেই ভূমিকম্পে তেমন বেশী জখম না হইলেও সে দিন উত্তর-বঙ্গের কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।

সেই সময় নাটোরের রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বে ভ্রমক্রমে উহা সাহিত্য-সম্মেলন বলিয়াছি। বাড়ী আসিবার জন্য প্রবল আগ্রহ না থাকিলে সেই সময় হয় ত কোন কোন বন্ধুর সহিত নাটোরে যাইতাম ; কিন্তু তখন নাটোরে যাইতে না পারিলেও ভূমিকম্পে নাটোর রাজপ্রাসাদ কি ভাবে বিধ্বস্ত

হইয়াছিল, তাহার লোমহর্ষক বিবরণ অনেকের নিকটেই শুনিতে পাইয়াছিলাম ; এবং পূজনীয় কবিবর রবীন্দ্রনাথও তাহার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কোন কোন বর্ণনা হইতে পরে তাহা অনেকেই জানিতে পারিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজা তখন নবীন যুবক, এবং বর্ত্তমান মহারাজা তখন কয়েক বৎসরের শিশু। তিনি ভূমিকম্পের সময় রাজবাড়ীর কক্ষে শায়িত থাকিলেও সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে আহত হইতে হয় নাই।

ভূমিকম্পের দুই এক দিন পরে আমি রাজসাহী ফিরিলাম। আমি গো-শকটে চুয়াডাঙ্গার পথে দামুকদিয়া দিয়া ষ্টীমারে রাজসাহী গমন না করিয়া গো-শকটে আমার মাতুলালয় জলঙ্গীতে যাত্রা করিলাম, এবং চৌদ্দ ক্রোশ পথ গো-শকটে অতিক্রম করিয়া জলঙ্গীতে আসিয়া আহার ও বিশ্রামের পর মধ্যাহ্নকালে আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম ; কিন্তু অপরাহ্ন ছটা পর্যন্ত নদীতীরস্থ রৌদ্রপ্রদীপ্ত বালুকারাশি-মধ্যবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে অপেক্ষা করিয়াও ষ্টীমারের চিমনীর ধূম নদীর কোন দিকে দেখিতে পাইলাম না। সকলেরই অনুমান হইল, গ্রীষ্মকালের চরবহুল পদ্মার কোন চরে আই· জি· এস· এন· কোম্পানীর রাজসাহীগামী ষ্টীমার বাধিয়া গিয়াছে, সে দিন আর তাহার আলাইপুর ষ্টেশনে আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং হতাশ-হৃদয়ে জলঙ্গীতে মাতুলালয়ে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু পরদিন আমাকে আফিসে উপস্থিত হইতেই হইবে। ছুটী ফুরাইয়াছিল, ভূমিকম্পের দোহাই দিয়া বা আলাইপুর ষ্টেশনে ষ্টীমার পাই নাই—এই কৈফিয়ৎ দিয়া আর এক দিনও অনুগ্রহ-বিদায়ের জন্য জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিবার ইচ্ছা ছিল না। হয় ত সিভিলিয়ান জজ ছুটী মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু তিনি এ কথাও মনে ভাবিতে পারিতেন, এই সকল যুবক-কেরাণীর কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই শিথিল যে, অনুগ্রহ-বিদায় পাইলেই ইহারা তাহার অপব্যবহারের সুযোগ ত্যাগ করে না। বিশেষতঃ সেই সময় ফৌজদারী আপীলের সেরেস্তার কাগজপত্রের সকল ভার আমার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তখন প্রায় প্রতিদিনই রাজসাহীর জেলখানা হইতে কয়েদীদের আপীল আসিত, জজ সাহেব সেই সকল দরখাস্তের উপর যে আদেশ দান করিতেন, তাহা অবিলম্বেই জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গোচর করিতে হইত। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে ঐরূপ কোন ত্রুটি ঘটিলে সে জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইবে ভাবিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইলাম। কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া লাভ নাই ; কিন্তু অধিকাংশ আফিসের পদস্থ বাঙ্গালী কেরাণীরা তাঁহাদের নিকট-আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক, পুত্র বা জামাতা না হইলে, তাহাদের ত্রুটির জন্য উপরওয়ালাদের নিকট তাহাদের সমর্থনের চেষ্টা ত করেনই না, বরং তাহাদের বিরুদ্ধে দুই চারি কথা বলিয়া ক্ষতি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার কর্ম্ম-জীবনের গুরু স্বর্গীয় সেরেস্তাদার মহেন্দ্র বাবুর এ দোষ ছিল না। অনেক সময় দেখিয়াছি, তিনি আমাদের কোন ত্রুটি দেখিলে রাগ করিতেন, সতর্ক করিবার জন্য অপ্রিয় কথাও বলিতেন ; কিন্তু জজ সাহেবের নিকট আমাদের দোষ ঢাকিবারই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্নেহকোমল ব্যবহারের কথা স্মরণ হইলে এই বার্দ্ধক্যেও কৃতজ্ঞতায় চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। জীবনের অপরাহ্নে কতবার মনে করিয়াছি, রাজসাহী গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি কৃতী পুত্রের হস্তে সংসার-ভার অর্পণ করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মীরা কোন দিন তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, মামাকে একখান গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম, তাঁহাকে জানাইলাম, পরদিন বেলা ১১টার সময় আমাকে রাজসাহী কোর্টে

উপস্থিত হইতেই হইবে। মামা হাসিয়া বলিলেন, "নৈলে কি তোমার রাজসিংহাসন হাতছাড়া হইবে ?" আমি বলিলাম, "না মামা, সিংহাসন খোয়াইবার ভয় করিও না ; ও চাকরী ছাড়িয়া দিতেও কোন কষ্ট নাই। দৈবযোগে একটি চাকরী মিলিয়াছে, অন্য কোথাও আর একটা মিলিতে পারে ; জানি, ভগবান অনাহারে রাখিবেন না, সুখে না হউক, দুঃখ কষ্টেও দুমুঠা মিলিবে, কিন্তু কাজে গাফিলী করিয়াছি, এ দুর্নাম লইতে চাহি না।"

মামা সন্ধ্যার পর তিন টাকা ভাড়ায় একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। গরীব কেরাণী, বাড়ী হইতে চাকরীস্থানে ফিরিতেছ, সঙ্গে অধিক টাকা থাকিবার কথা নয় ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাঁচ টাকা সঙ্গে ছিল, এ জন্য আলাইপুর হইতে রাজসাহী পর্য্যন্ত কয়েক আনা ষ্টীমার-ভাড়ার পরিবর্ত্তে অপরিহার্য্য কারণে তিন টাকা গরুর গাড়ী ভাড়া দিতে হইলেও অসুবিধা বোধ করিলাম না। বাত্রিতে আহারাদির পর গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন বেলা নয়টার সময় পদ্মা নদীর উত্তর পারে খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলাম। মেঠো পথে গাড়ী চালাইবার সময় দেখিয়াছিলাম, ভূমিকম্পে পথের ও মাঠের বহুস্থান ফাটিয়া এরূপ প্রশস্ত চির হইয়াছিল যে, তাহার উপর দিয়া গাড়ী চালাইবার উপায় ছিল না। অগত্যা অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

খেয়া নৌকায় চাপিয়া পদ্মার মধ্যস্থলে আসিয়া পদ্মাবক্ষস্থ সুবিস্তীর্ণ চর ঘুরিতেই অপর পারে রাজসাহীর ঘোড়ামারা অঞ্চলের ঘরবাড়ীর অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কোন বাড়ীই স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে পাইলাম না, অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল, বহু কালের পুরাতন বাড়ীগুলির ত কথাই নাই। বড় কুঠীর প্রাচীন অট্টালিকার দোতলার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নদীতীরে নামিয়া রাণীবাজারে আমাদের মেসে গিয়া দেখিলাম, যে দোতলায় বাস করিতাম, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। আমি বাসায় যে সকল জিনিসপত্র বাখিয়া বাড়ী গিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। অগত্যা আমার প্রবাসের প্রধান আশ্রয় হবকুমার বাবুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাঁহারও দোতলার কোন কোন অংশ ফাটিয়া চৌ-চির হইয়াছিল। দিঘাপতিয়া-রাজের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী সমভূমি হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আহারাদি করিয়া যথাসময়ে আফিসে চলিলাম। সকলের মুখেই ভূমিকম্পে সর্ব্বনাশের কথা। দেখিলাম, রাজসাহীর কোর্টের কোন ক্ষতি হয় নাই, স্থানে স্থানে অল্প ফাটিয়াছিল মাত্র।

বড় কুঠী-সংলগ্ন লম্বা লম্বা একতলা ঘর ছিল, ঘরগুলি বহু পুরাতন, দেখিতে কতকটা ঘোড়ার আস্তাবলের অনুরূপ। সেই ঘরে কয়েকটি কুঠুরী লইয়া একটি মেস হইয়াছিল। সেই মেসে বাস করিবার সময় রাজসাহীর উকীল স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়াছিল। আমাদের মেসের দক্ষিণাংশে রজনী বাবুর বাসা ছিল। এ জন্য সকালে অবসরকালে রজনী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতাম। অনেক সময় কোর্ট হইতে গাড়ীতে বাসায় না ফিরিয়া পদ্মাতীরস্থ বাঁধের উপর দিয়া রজনী বাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে মেসে ফিরিতাম। রজনী বাবু সদা-প্রফুল্ল, হাস্যরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন। অপরাহ্নে কাছারীর পর তাঁহার বাহিরের ঘরে গান-বাজনার বৈঠক বসিত। রজনী বাবু হারমোনিয়ম বাজাইয়া স্বরচিত গান গাহিতেন ; কিন্তু পেস্কার অবিনাশ রায় তাঁহার গানগুলি আরও ভাল গাহিতেন। সেখানে অনেক যুবকের সমাগম হইত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান-বাজনা চলিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় একবার সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি হাসির গানে রাজসাহীর শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গান

শুনিয়া রজনীকান্ত হাসির গান রচনায় মনঃসংযোগ করেন। তাহার পূর্ব্বেও তিনি দুই চারিটি হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর হাসির গান শুনিবার পর তিনি উৎসাহভরে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি গাহিয়া শুনাইয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কোন কোন দিন বলিয়াছি—"আপনার এ গান ডি· এল· রায়ের কোন হাসির গান অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে।"—আমার কথা শুনিয়া তিনি ডি· এল· রায়ের উদ্দেশ্যে দুই হাতে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিতেন, "কি যে বল! তিনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার গান তাঁহার গানের সমকক্ষ হইবার যোগ্য? পাগল আর কি!"—বস্তুতঃ, রজনী বাবু অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিজের প্রতিভা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহার গল্প বলিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে কোন কোন দিন আমাদের রাত্রি একটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার গল্প শুনিতাম! এক দিন সন্ধ্যার পর তিনি একটি ফরাসী ডিটেক্‌টিভের গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়া দুই রাত্রিতে তাহা শেষ করেন। গল্পটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া তিনি আমাকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আমাকে রাজসাহীর পাবলিক লাইব্রেরী হইতে সেই ফরাসী উপন্যাসের একখানি ইংরাজী অনুবাদ আনিয়া দিলেন; আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া দুই পরিচ্ছেদ লিখিলাম। ফরাসীভূমি আমি রাজপুতানায় পরিবর্ত্তিত করিয়া উপন্যাসের ফরাসী নায়ক-নায়িকাগুলিকে রাজপুতে পরিণত করিলাম। রজনীবাবু সেই দুই পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও মুক্তকণ্ঠে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে এখনও লজ্জা অনুভব করি। এই উপন্যাসের কিয়দংশ তৎকাল প্রকাশিত 'দাসী'নামক মাসিক পত্রে 'অজয়সিংহের কুঠী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া নিঃশেষিত হইলে, শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকতা করিবার সময় উহার দ্বিতীয় সংস্করণ আমার নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনিই তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ঐ সংস্করণের সহিত আমার কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ ছিল না, অল্পদিনেই নিঃশেষিত হইয়াছিল।

কিছু দিন বাসের পর রজনী বাবু আমাকে তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত একত্র বাসের জন্য অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহার সহিত সাহচর্য্যে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত অনেক দিন পরম সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র কোর্টে যাইতাম, একত্র ফিরিতাম এবং অবসরকাল একত্র কাটাইতাম। সেই সময় আমি সাহিত্যের ও ভারতীর নিয়মিত লেখক ছিলাম; রজনী বাবু তখন গান রচনা করিতেন। এই সময় তাঁহার 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছিল। রজনী বাবু রাজসাহীতে ওকালতী করিতে করিতে দুই তিনবার নাটোর ও নওগাঁ মহকুমায় মুন্সেফের একটিনী করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকালের জন্য কোথাও মুন্সেফীর একটিনী করিতে হয় নাই। হাকিমী করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি যেন হাঁপাইয়া পড়িতেন। মনে হইত, হাকিমীতেও তাঁহার তেমন অনুরাগ ছিল না। একবার তিনি হাকিমী করিয়া রাজসাহীতে ফিরিয়া হাকিমী সম্বন্ধে একটা হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। আর একবার রাজসাহীর (অধুনা পরলোকগত) কোন স্ত্রৈণ প্রবীণ উকীলের দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি অনুরাগের পরিচয়স্বরূপ একটি গান রচনা করিয়া বন্ধুবর্গের নিকট তাহা গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহার প্রথম লাইনটি এখনও স্মরণ আছে—

'বাজার হুদ্দো কিনে আন্যে ঢেলে দিছি পায়,'

এই গান শুনিয়া সকলেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

রজনী বাবুর রচিত 'বেহায়া বেয়াই' শীর্ষক হাসির গানটিও অতি চমৎকার ; বিশেষতঃ এই বেহায়া যখন মেয়ের বাপের সম্মুখে বসিয়া বরপণের ফর্দ্দ দাখিল করিতে করিতে নিজের নিস্পৃহতা ও স্বার্থ-বিমুখতা প্রদর্শনের জন্য বলিল,—

"তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন,
আর দু'দিন পরে আমি মুদ্‌বো দু'নয়ন—"

তখন এরূপ ভঙ্গী করিয়া এরূপ কণ্ঠে রজনী বাবু গানটি গাহিতেন যে, অতি গম্ভীরপ্রকৃতি লোকেরও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত। রজনী বাবুর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল ; তিনি দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। ওকালতীতে তাঁহার পসারও মন্দ ছিল না, কিন্তু তিনি এই ব্যবসায়ের অনুরাগী ছিলেন না। তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতেরই অনুরাগী ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গান করিয়াও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। যত দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, কোন দিন গৃহ-সুখের অভাব অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সময়ের কিছু দিন পরে আফিসের উপরওয়ালার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইলাম যে, চাকরীর উপর ঘৃণা হইল, এবং সেই দিন হইতে রাজসাহী-ত্যাগের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, সে কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তখন রাজসাহীর সেই জজ আমারই মুরুব্বী মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

(১৬)

জজ আদালতের চাকরী কেবল একঘেয়ে নহে, অন্য বিড়ম্বনাও অল্প ছিল না। যাঁহারা সে-কালে সেখানে অল্প বেতনের কেরাণীগিরি করিতেন, তাঁহাদিগকে শুধু যে প্রধান মনিব অর্থাৎ খোদ জজ সাহেবেরই মনোরঞ্জন করিয়া 'দিনগত পাপ ক্ষয়' করিতে হইত, এরূপও নহে ; এক এক বিভাগের মাথায় যিনি বসিয়া থাকিতেন, তিনিও মনিব,—ছোট মনিব। সেরেস্তাদার মহেন্দ্র বাবু সে-কালের গ্র্যাজুয়েট, সুশিক্ষিত ভদ্রলোক এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন, তিনি কোন কেরাণীকে তাঁহার পদের প্রভাব বুঝিতে দিতেন না ; কিন্তু হেড কেরাণী, নাজীর, সবজজের সেরেস্তাদার, রেকর্ডকিপার প্রভৃতি ছোট মনিবগণের মনোরঞ্জনের ত্রুটি হইলে তাহাদের গোঁফ ফুলিয়া উঠিত, এবং মুখ প্যাঁচার মুখের মত গম্ভীর হইত। কিন্তু মিঃ পালিত রাজসাহীর জজ হইলে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা দয়া করিয়া আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেন না, তাহার কারণ, তাঁহারা জানিতেন, মিঃ পালিতই ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের নিকট আমার চাকরীর জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সুপারিশেই আমার চাকরী ; সেই পালিত এখন রাজসাহীর জজ, সুতরাং তাঁহার 'পেয়ারে'র আমলা তাচ্ছিল্যের যোগ্য নহে। কিন্তু মিঃ পালিত আমাকে কিরূপ 'পেয়ার' করিতেন, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। সে কথা পরে বলিতেছি।

মানব-চরিত্র দোষগুণে বিজড়িত। মিঃ পালিতের গুণ ছিল অনেক, কিন্তু দোষ ছিল না, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। তিনি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতেন, পেয়াদা কন্‌ষ্টেবলগুলোকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেন কি না, বুঝিতে পারিতাম

না। স্মরণ হইতেছে, একবার আমি ও অবিনাশ রায় উভয় বন্ধুতে তাঁহার সঙ্গে মালদহে সেসন্‌স করিতে গিয়াছিলাম। এক দিন সেসন্‌স কোর্টের মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোর্টে আসামী, ফরিয়াদী, উকিল সকলেই উপস্থিত ; এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু জজ মিঃ পালিত তখনও অনুপস্থিত। আসামীর কাঠরায় কয়েক জন আসামী দণ্ডায়মান। কাঠরার দুই ধারে বেটনধারী লাল-পাগড়ী বিহারী কন্‌ষ্টেবলরা আসামীদের পাহারা দিতেছিল। দীর্ঘদেহ, নিবিশ্মশ্রু উকীলসরকার হরিনাথ পালিত মহাশয় কালো চাপকানের উপর সাদা চাদর বক্ষঃস্থল পেঁচাইয়া কাঁধে ফেলিয়া, তীর্থের কাকের মত চেয়ারে উপবিষ্ট। অবিনাশ পেস্কারের চেয়ারে বসিয়া কানে ষ্টিলপেন গুঁজিয়া এক একবার তর্জ্জনী রসনা-রসসিক্ত করিতেছেন ও নথির পাতা উল্টাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইতেছিল, আমি তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া মামলার 'একজিবিট'গুলি এজলাশের টেবলে সাজাইয়া রাখিতেছিলাম, কিন্তু জজের তখনও দেখা নাই। অন্য দিন তিনি মামলা আরম্ভের সময় সেসন্‌স কোর্টের পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া এজলাসে প্রবেশ করিতেন ; কিন্তু সে দিন তিনি কি কাজে জানিতাম না, ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে গিয়াছিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় তিনি একটা কালো লম্বা চুরুট মুখে গুঁজিয়া, সার্কিট হাউসের সদর দেউড়ি পার হইয়া সিঁড়িতে উঠিলেন। সেই সময় এক জন কন্‌ষ্টেবল সার্কিট হাউসে এজলাসের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিশাল দেহে মুক্ত দ্বার অবরুদ্ধপ্রায় ; তাহার দৃষ্টি এজলাসের পার্শ্বস্থিত আসামীর কাঠরার দিকে প্রসারিত। কোন আসামী কাঠরা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া, কাঠরা-সন্নিহিত পাহারাওয়ালাদের হাত ছাড়াইয়া সেই দ্বার দিয়া পলায়ন করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যেই দ্বার-সম্মুখস্থ কন্‌ষ্টেবলের দৃষ্টি আসামীর কাঠরায় ন্যস্ত ছিল। আসামীদিগকে যখন এজলাসে আসামীর কাঠরায় স্থাপন করা হয়, তখন তাহাদের হাতে হাতকড়ি থাকে না—ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন, দুর্দ্দান্ত আসামীরা এই সুযোগে কখন কখন আসামীর কাঠরা হইতে পলায়নের চেষ্টা করে, এরূপও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। যে কন্‌ষ্টেবল দ্বার জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার তখন পশ্চাতে চাহিবার অবসর ছিল না ; এজন্য জজ সাহেব সেই দ্বার দিয়া প্রবেশোদ্যত হইয়াছেন, ইহা সে জানিতে পারে নাই। কেহ তাহাকে সতর্ক করিবার পূর্ব্বেই মিঃ পালিত দ্বারের নিকট আসিয়া পড়িলেন। কন্‌ষ্টেবল বেচারাকে দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রভুর চিত্ত বোধ হয় জ্বলিয়া উঠিল ; তিনি তাহাকে অনায়াসেই সরিয়া দাঁড়াইবার আদেশ করিতে পারিতেন, এবং সে যদি বুঝিতে পারিত, জজ সাহেব তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে সে সেই মুহূর্ত্তেই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু পালিত তাহাকে সতর্ক হইবার অবসর না দিয়াই তাহার হাঁটুর বিপরীত দিকে, পায়ের তলার বুটের এমন এক ঠোক্কর মারিলেন যে, সে দরজা হইতে দুই হাত সম্মুখে সরিয়া গিয়া উপুড় হইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, এবং এক পাশে দাঁড়াইয়া এরূপ দৃষ্টিতে মিঃ পালিতের দিকে চাহিল যে, সাধ্য হইলে সে যেন চক্ষু হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিত। কিন্তু মিঃ পালিত তাহার দিকে একবারও না চাহিয়া, বা এই কার্য্যের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া, কদমের চালে এজলাসে উঠিয়া বসিলেন। বিচারকের এই ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আমার মত নিরীহ কেরাণীর অন্তরাত্মাও যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মানুষের প্রতি মানুষের—সদ্বংশীয় উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর এ কি ব্যবহার! পদগৌরবে তিনি এতটুকু সামাজিক শিষ্টাচারও অনাবশ্যক মনে করিলেন? পদের মর্য্যাদা ও মানের দর্প কি এই ভাবেই প্রকাশ করিতে হয়? শিক্ষিত যুবকের এ কিরূপ শিক্ষা?

সেই দিন অপরাহ্নে কোর্টের কাজ শেষ হইলে, সেই পদাহত কনষ্টেবল আমাকে ও অবিনাশকে বলিল, 'বাবু, সাহেবের আক্কেল দেখিলেন ? হইলেনই বা উনি জজ, উনি ত হিন্দু, কায়স্থের ছেলে, আমি কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ, আমাকে উনি জুতা মারিলেন । আমার ইচ্ছা হইয়াছিল—আমি সাত টাকার কনষ্টেবল, আমার না হয় নক্রি যাইত, না হয় আমি জেল খাটিতাম, কিন্তু আমার লাথি খাওয়ার কলঙ্ক উনি জীবনে মুছিতে পারিতেন ? দেখুন, ভগবান সকলের দেহেই বর্ত্তমান আছেন, উনি আমার অপমান করিয়া আমার দেহস্থ ভগবানের অপমান করিলেন। আমি আর কি বলিব ? ভগবান যেন ইহার বিচার করেন।"—ভগবান বিচার করিয়াছিলেন কি না, জানি না ; কিন্তু আমরা মিষ্টবাক্যে সেই কনৌজিয়া ব্রাহ্মণকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম, "সাহেবের তমো বেশী, তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর, ক্ষমার অধিক ধর্ম্ম নাই, বিশেষতঃ তুমি ব্রাহ্মণ।" সে বিকৃতস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, আমি অক্ষম ব্রাহ্মণ ; ক্ষমা করা ভিন্ন অক্ষমের আর কি উপায় আছে ? উনি জজ, পরের অপরাধের বিচার করেন, নিজের অপরাধ দেখিতে পান না।"

মিঃ পালিত আমার মুরুব্বী ছিলেন ; বিশেষতঃ, বহুদিন পূর্ব্বে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভবতঃ আমার অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ; কিন্তু এই জীবন-সায়াহ্নে আমি আমার অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত কোনও কথা গোপন করিব না স্থির করিয়াই সে-কালের স্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি। ইহাতে জীবিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ মর্ম্মাহত হইয়া আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বিবেকের নিকট আমি সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত আছি।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে আমার ছোট কাকার মৃত্যু হয়। আমার পিতাঠাকুর সংসারে উদাসীন ছিলেন। বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া তিনি সংসারের খোঁজ-খবর রাখিতেন না। তিনি বড় কাকার মহিষাদলের বাসায় বাস করিতেন। ছোট কাকাও মহিষাদলের রাজসংসারে চাকরী করিতেন। তাঁহারা দুই ভাই জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দেবতার মতই ভক্তি করিতেন। এরূপ ভ্রাতৃভক্তি একালে বিরল। বাবা জলধর বাবুকেও কনিষ্ঠ সহোদরে মত দেখিতেন, এবং একত্র বাস করিয়া জলধর বাবুও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠাগ্রজের মত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এই বার্দ্ধক্যে রায় বাহাদুরের সে কথা স্মরণ থাকিতে পারে। বাবা দিবসে ও রাত্রিকালে দীর্ঘকাল ভগবানের উপাসনা করিতেন। অবশিষ্ট সময় সাহিত্যালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। মহিষাদলের কয়েক মাইল দূরে মধ্যহিংলি নামে একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু মিত্র পরিবারের একটি বৃহৎ পুস্তকাগার ছিল ; যোগেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার অধিকারী ছিলেন। সেই পুস্তকালয়ে যতপ্রকার পুস্তক ছিল, বাবা সমস্তই আনাইয়া পাঠ করিতেন।

বার্দ্ধক্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি হাঁপের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন ; কিন্তু দুই কাকা তাঁহার পরিচর্য্যার ত্রুটি করিতেন না। তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হইত। বড় কাকার মহিষাদলের সংসারে তাঁহার উমেদার শ্যালক ও বৃদ্ধ শ্বশুর প্রতিপালিত হইতেছিলেন। ভগিনীর সংসারে তাঁহার ভাশুর পান করিবেন এক সের দুধ, আর গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভাগ্যে আধ সের দুধ—ইহা সেই মামাবাবু অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে করিতেন। মামাবাবুই যে সেই সংসারের কর্ত্তা, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি ছিল না। ছোট কাকার সঙ্গে এজন্য মধ্যে মধ্যে 'ঠুকাঠুকি' বাধিত। জলধর বাবু রহস্য করিয়া তাঁহাকে ব্রজসুন্দর না বলিয়া 'নরসুন্দর' বলিতেন। অন্য সকলে 'মামাবাবু' বলিত। মামাবাবু 'নরসুন্দর' নামটি গরপছন্দ করিয়া এক দিন বড় কাকীর নিকট অভিযোগ করিলেন, বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয় আমাকে নাপিত বলে, তোমার এখানে আর আমার

থাকা হয় না।" গড়াঢরচন্দ্র বাঙ্গালায় একটিই ছিল না।

কাকী আমাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হ্যারে, তোদের মাষ্টার মশায় দাদাকে নাপিত বলেন কেন ? আমার দাদা কি নাপিত ? তোরাও তবে নাপিত ?" আমি বলিলাম, "মামাবাবুর কথা শোন কেন ? মাষ্টার ওঁকে নাপিত বলবেন কেন ? বলেন—'নরসুন্দর'। নর মানে মানুষ, আর সুন্দর হচ্ছে কি না সু-চেহারার লোক। তা' মামাবাবু হচ্ছেন নরের কি না মানুষের মধ্যে সুন্দর—অর্থাৎ সু-পুরুষ ; তাই তাঁকে আদর ক'রে বলেন 'নরসুন্দর'। মাষ্টার মশায় কি তোমার পূজনীয় দাদাকে নাপিত বলতে পারেন। আচ্ছা, তোমার দাদা যে সুপুরুষ, তা কি তুমি অস্বীকার কর ? ও রকম 'কার্ত্তিকের' মত চেহারার লোক এখানে আর কেউ আছে ?"—আমার অকাট্য যুক্তি শুনিয়া কাকী খুসী হইয়া বলিলেন, "সে ত সত্যি কথা। ও-কথায় দাদার রাগ করা অন্যায়।" পাছে মাষ্টার মহাশয় লজ্জা পান, এজন্য অন্দরমহলে মামাবাবুর অভিযোগের কথা কোন দিন বলি নাই।

মামাবাবুর কর্ত্তৃত্বের আর একটা পরিচয় ছিল—হাট করা। আমাদের বাসার সম্মুখস্থ প্রশস্ত আঙ্গিনায় সপ্তাহে দুই দিন—শনি-মঙ্গলবারে হাট বসিত। মামাবাবু কাকার খানসামা উমেশকে সঙ্গে লইয়া হাটে-মাছ-তরকারী কিনিতেন ; কিন্তু তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান, হাটের দোকানদারদের ইহার পরিচয় না দিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না ; কিন্তু তাহার ফল হইল বিপরীত। আট পয়সার একটি 'বৈতাল' (সূয্যি কুমড়ো) কিনিয়া পাঁচ পয়সার বেশী দাম দিতেন না। এক সের বেগুন কিনিয়া চারি পয়সার পরিবর্ত্তে তিন পয়সা দাম দিতেন, এবং আধ সের ফাউ না লইয়া ছাড়িতেন না। মেছুনীর সঙ্গে তাঁহার কলহ লাগিয়াই থাকিত ; কেহ জোর করিয়া আপত্তি করিলে মামাবাবু তাহাকে হাট হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেন। গরীব হাটুরেরা কিছু দিন মুখ বুজিয়া এই প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া এক দিন ছোট কাকার কাছে মামাবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল ; বলিল, "আপনি এটার একটা বিহিত করেন ছোট বাবু, তুশ্চু কথা মেনেজার বাবুকে বল্‌তে সরম লাগে।"—ছোট কাকা এক দিন মামাবাবুকে সতর্ক করিতেই মামাবাবু সরোষে বলিলেন, "তুমি বল্‌বার কে হে ! তোমার খাই না পরি ? বাজার করি আমার বোনের পয়সায়, তুমি যে মুখ নেড়ে আমাকে দশ কথা শুনুতে এসেছো ?"

পরদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া বড় কাকা ও ছোট কাকা পুষ্করিণীর অন্দরের ঘাটে স্নান করিতে করিতে নানা সাংসারিক কথার আলোচনা করিতেছিলেন ; সেই সময় ছোট কাকা হাটুরেদের অভিযোগের কথা বড় কাকার নিকট প্রকাশ করিলেন। সকল কথা শুনিয়া বড় কাকার মুখ শ্রাবণ-সন্ধ্যার মেঘের মত গম্ভীর হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি কাছারী হইতে ফিরিয়া মামাবাবুকে মিষ্ট ভাষায় দুই একটি হিতোপদেশ দিলেন ; বলিলেন, "আমি এত বড় এষ্টেটের ম্যানেজারী করি, কিন্তু কাল যদি আমার চাকরী যায়, তবে সপরিবারে আমাকে উপোষ করতে হবে। আমি কারও কাছে একটি পয়সাও নিইনে, আর তুমি গরীব হাটুরেদের মূলো-বেগুনের লোভ ছাড়তে পার না, এতে দুর্নাম হবে কার ? তোমার, না আমার ?"

অপদার্থ অক্ষম ব্যক্তির অভিমান প্রবল হইয়া থাকে। মামাবাবু অভিমান করিয়া বাসা ছাড়িলেন, এবং কাকার বন্ধু সব্‌রেজিষ্ট্রার কালী বাবুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুই কাকার ও মাষ্টার মশায় জলধর বাবুর নিন্দা প্রচার করিলেন। এই ব্যাপারের সহিত জলধর বাবু কোন সংস্রব ছিল না ; কিন্তু তিনি যে বিদ্রূপ করিয়া মামা বাবুকে 'নরসুন্দর' বলিতেন, তাঁহার সেই অপরাধ মামাবাবু ক্ষমার অযোগ্য মনে করিতেন। যাহা হউক, অবশেষে ছোট কাকা

এবং জলধর বাবুই মামাবাবুকে সাধ্য-সাধনা করিয়া সব্‌রেজিষ্ট্রার কালী বাবুর বাসা হইতে ধরিয়া আনিলেন। তবে জলধর বাবুর বিবাহে মামাবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বরযাত্রী হইয়াছিলেন, যেন তিনি বরকর্ত্তা!

বাবা মহিষাদলেই প্রাণত্যাগ করেন, কোন রোগভোগ না করিয়া হঠাৎ বিনা কষ্টে তাঁহার মৃত্যু হয়, জলধর বাবু তখন মহিষাদলে। তিনিই আমাকে মেহেরপুরে বাবার মৃত্যুসংবাদ সর্ব্বাগ্রে প্রদান করেন। আমি পিতৃহীন হইয়া কাকাদের স্নেহে পিতার অভাব কোন দিন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বাবাই যেন তাঁহার পুণ্যময় জীবনের প্রভাবে সমগ্র পরিবারটিকে অক্ষয় কবচের ন্যায় রক্ষা করিতেছিলেন। বাবার মৃত্যুর অল্পকাল পরে কলিকাতায় মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে বড় কাকার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘকাল জ্বরে ভুগিতেছিলেন, সেই কাল-ব্যাধি আর আরোগ্য হইল না। মহিষাদলের রাজা বাহাদুর তাঁহার সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত ম্যানেজারের প্রাণরক্ষার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। জলধর বাবু তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। কাকাকে ফেলিয়া আমি কোথাও যাইতাম না। কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া কাহাকেই বা রাখিতে পারিলাম! সকলকে হারাইয়া, নিজে সর্ব্বহারা হইয়া আজ জীবন-সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ প্রবাসে দুঃখময় অতীতস্মৃতির রোমন্থন করিতেছি।

একটি বৃহৎ সংসার অনাহারে মারা যাইবে ভাবিয়া কাকা শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন নাই। সংসার তখন প্রায় অচল। কাকা সুনাম ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! আমি মহিষাদল হইতে পরিবারবর্গকে বাড়ীতে রাখিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে রাজসাহী ফিরিলাম।

এই দুর্ঘটনার অল্পদিন পরে ছোট কাকাও মেহেরপুরের বাড়ীতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বড় কাকার মৃত্যুর পর তিনি মহিষাদলে অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই; যাঁহারা বড় কাকার কৃপাকটাক্ষের ভিখারী ছিলেন, তাঁহারাই বড় কাকার মৃত্যুর পব ছোট কাকাকে মহিষাদল হইতে তাড়াইয়াছিলেন। জলধর বাবু তাঁহাকে নানাভবে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু সামান্য স্কুল-মাষ্টারের চেষ্টা-যতেন ও আগ্রহে তাঁহার দুঃখ-কষ্ট প্রশমিত হয় নাই। ছোট কাকা বাড়ী ফিরিয়া বেকার অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কেবল মেজকাকা মেহেরপুর স্কুলের ত্রিশ টাকার মাষ্টার, আমি তাঁহাকে রাজসাহী হইতে অতিকষ্টে কুড়ি টাকা পাঠাইতাম, এই পঞ্চাশ টাকায় বৃহৎ সংসার যে ভাবে চলিতে পারে, সেই ভাবে চলিত। ভগবান কোথা হইতে কোথায় টানিয়া আনিলেন, ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতাম। কিন্তু তাঁহার বিচারের নিন্দা করিতে কখনও প্রবৃত্তি হয় নাই। ইহাই জগতের নিয়ম।

রাজসাহীতেই ছোট কাকার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম; তখন আমি হরকুমার বাবুর বাসায় ছিলাম। হরকুমার বাবুর স্ত্রী—সেই করুণাহৃদয়া মহীয়সী মহিলা আমার ন্যায় নগণ্য দরিদ্র অতিথির জন্য বেলা দশটার মধ্যে হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া দিতেন,—পাছে আমার আফিসে যাইতে বিলম্ব হয়। অথচ আমি কত ক্ষুদ্র, কিরূপ নিরূপায়, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; মেঘই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া রৌদ্রদগ্ধ ধরাতল স্নিগ্ধ, সরস ও শীতল করে। ইহা মেঘের অযাচিত করুণা।

রাজসাহীতে বহুকাল হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার নাম 'তমোঘ্ন যন্ত্র', এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রেসের নামটিতে সনাতনী গোঁড়ামীর গন্ধ পাওয়া যায় সে-কালের তরুণরাও প্রেসের এই দুর্নাম রটাইতেন; এ-কালের তরুণ ও তরুণীদের ত

কথাই নাই। এই প্রেসটি দুবলহাটীর কোন জমীদার ধর্ম্মসভাকে দান করিয়াছিলেন। এই প্রেস হইতে বহুদিন যাবৎ 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে ; সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাজসাহী বহুকাল হইতেই হিন্দুসমাজের প্রধান দুর্গ। ইহা বরেন্দ্রভূমির শীর্ষস্থান। যে স্থানে এত অধিকসংখ্যক খাঁটি হিন্দুর বাস, সেখানে বারাঙ্গনার সংখ্যা কেন যে এত অধিক, তাহা কোন দিন বুঝিতে পারি নাই। সুরসিক রজনী বাবু এক দিন আমার প্রশ্নের উত্তরে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "উহারা হিন্দু সমাজের সেফটি ভাল্‌ব।" হয় ত তাঁহার কথা সত্য ; কিন্তু রাজসাহীর তরুণেরা সচ্চরিত্র, এইরূপই আমার ধারণা ছিল।

রাজসাহীতে নারী-শিক্ষার যেরূপ সুবন্দোবস্ত আছে, অনেক জেলায় সেরূপ নাই, স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর বিদ্যোৎসাহী জমীদার ছিলেন ; তাঁহার জমীদারীর আয় হইতে ছাত্রগণের ও ছাত্রীগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, অনেক জেলাতেই সেরূপ নাই। মুর্শিদাবাদ এক সময় বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শিক্ষার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, বাঙ্গালা দূরের কথা, ভারতের অন্য কোনও জমীদার সেরূপ করেন নাই। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় রাজসাহীর স্থান বহরমপুরের অনেক উর্দ্ধে ; রাজসাহীর নারীসমাজ পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের অনেক জেলা অপেক্ষা প্রগতির পথে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। রাজসাহীর যত যুবক কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিল, নিকটস্থ অন্য কোন জেলায় তত নহে।

রাজসাহীর 'তমোঘ্ন যন্ত্র' যে সময় স্বর্গীয় হরকুমার বাবুর তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে এই প্রেসের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় ইহার দুর্গতির সীমা ছিল না। ভাঙ্গা হরফে এবং অতি অপকৃষ্ট কাগজে হিন্দুরঞ্জিকা প্রকাশিত হইত। ধর্ম্মসংক্রান্ত দুই একটি মামুলি প্রবন্ধ ও নীলামী ইস্তাহার ভিন্ন তাহাতে বিশেষ কিছু প্রকাশিত হইত না। মার্কামারা কোন কোন ধার্ম্মিক ইহার মুরুব্বী ছিলেন ; তাঁহাদের এক জন শুনিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় একাদশী করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বয়স পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর এক দিন তাঁহার স্মরণ হইল—তিনি এক জন বিখ্যাত ধার্ম্মিক, অথচ একাদশীটা গোড়া হইতেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে ; সুতরাং তিনি এক দিন ঘোষণা করিলেন, কাল একাদশী, কাল হইতে মাসে দুই দিন একাদশী করিতে হইবে। তদনুসারে একাদশীর দিন তাঁহার জন্য দুই সের ময়দার লুচি প্রস্তুত হইল, তাহার পর ডাল তরকারী প্রভৃতি তাহার অনুরূপ পরিমাণে তাঁহাকে একাদশী করিতে দেওয়া হইল। একটা বড় বাটিতে দুই সের ক্ষীর, গণ্ডদশেক কাঁচাগোল্লা, এবং আরও দশগণ্ডা রসগোল্লা, প্রভৃতি দ্বারা তিনি পরম পরিতোষ সহকারে একাদশী করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পুণ্যের পরিমাণ এরূপ গুরু হইয়া উঠিল যে, তাহা বরদাস্ত করিতে না পারিয়া শেষরাত্রি হইতে তাঁহাকে পায়খানাটিকেই বৈঠকখানায় পরিণত করিতে হইল। প্রথমে 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সার' খুলিয়া দুই তিন প্রকার ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া গলাধঃকরণ করিলেন ; কিন্তু উদর-দেবতা তাহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে ভেদ ও বমনের আতিশয্যে স্বর্গের দ্বার অর্গলমুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া. অগত্যা ডাক্তার কেদারনাথ আচার্য্য মহাশয়কে ডাকিতে হইল। স্বর্গীয় আচার্য্য মহাশয় সুচিকিৎসক ছিলেন ; নাটোর, দিঘাপতিয়া প্রভৃতির রাজবাড়ীতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের সুলেখক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য রায় সাহেব হইয়া এখন বারাকপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ব্রতী আছেন। পূজনীয় ডাক্তার আচার্য্য তাঁহারই পিতা। কেদার বাবুর অশেষ চেষ্টায় ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ একাদশীর কবল হইতে রক্ষা পাইলেন ; কিন্তু সেই একাদশীর

ছ্যাপায় তাঁহার ৭২৸৶ আনা ব্যয় হইল। অতঃপর আর কোন দিন একাদশীর নাম ওষ্ঠাগ্রে আনেন নাই। শুনিয়াছি, কয়েকটি সেবাদাসী পুণ্যার্জ্জনে তাঁহার সহায়তা করিতেন। যখন তিনি ঢিলা ইজের ও আলখাল্লায় সজ্জিত হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ ললাটে সুদীর্ঘ চন্দনের তিলক ধারণ করিয়া শিখা আন্দোলিত করিতে করিতে কাছারী যাইবার জন্য পথে বাহির হইতেন, তখন দুষ্ট ছেলেরা তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া বক দেখাইত।

এই সকলধার্ম্মিক লোকের কবল হইতে তমোঘ্ন প্রেস উদ্ধার করিয়া হরকুমার বাবু তাহার পঙ্কোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নানাপ্রকার নূতন টাইপও আনীত হইল। এই সময় ১৩০২ সালে আমার সর্ব্বপ্রথম গল্প 'বাসন্তী' প্রেসে পাঠাইবার ইচ্ছা হইলে হরকুমার বাবু অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা তমোঘ্ন প্রেসে মুদ্রিত করিতে পারি। 'বাসন্তী' রামপুর বোয়ালিয়ার তমোঘ্ন প্রেসেই ছাপা হইল। হরকুমার বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাহা তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার রোপিত সাহিত্য-তরুর প্রথম ফল আমার ভালই লাগিয়াছিল। আর একটি কারণে আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল। হরকুমার বাবুর পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র যদু বাবু (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্‌সেলার সার যদুনাথ সরকার) তখনকার কালের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক মিঃ এন ঘোষের সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেশানে' বাসন্তীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজে নেশানের তখন অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। সরকারের পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও নেশানের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ যদু বাবু নেশানের প্রধান লেখকগণের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু এ সংবাদ তখন সাহিত্যসমাজের অবিদিত ছিল; এবং যদু বাবু সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া লেখনী চালনা করিতেন।

পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর এক দিন আমার দুর্ম্মতিক্রমে আমার মুরুব্বী, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়বন্ধু এবং বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম সেবক মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে একখানি পুস্তক উপহার প্রদানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইল। অবিনাশ বলিলেন, আফিসে না দিয়া সাহেবের কুঠীতে গিয়া দেওয়াই ভাল।

একদিন অপরাহ্নে মিঃ পালিতের সহিত তাঁহার কুঠীতে দেখা করিলাম। পুস্তকখানি তাঁহাকে দিলে তিনি তাহা খুলিয়া দেখিয়া টেবলে ফেলিয়া রাখিলেন, এবং ঈষৎ অসন্তুষ্টভাবেই বলিলেন, আমি আফিসের পোষাকে তাঁহার কুঠীতে উপস্থিত হই নাই কেন? তিনি ইহা চাহেন না যে, তাঁহার আফিসের কোন আমলা ধুতি-জামা পরিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করে।

হউন তিনি সিভিলিয়ান এবং জেলার জজ, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী, আমিও বাঙ্গালী; কুলী-শ্রেণীর লোকও নহি, তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, তিনি আমাকে বসিতে বলিবেন না? সিভিলিয়ানরা কি অর্থ ও পদগৌরব দ্বারা শিষ্টাচার প্রদর্শনের পরিমাণ নির্দ্ধারিণ করেন? অথবা তাঁহার ধারণা, যেহেতু আমি তাঁহার আফিসে কেরাণীগিরি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, অতএব আমি ও অলি আর্দ্দালী তাঁহার দৃষ্টিতে সমান? হয় ত তাঁহার এরূপ ধারণার একটু কারণও ছিল। আমরা আফিসে তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিতাম, তাহা মনুষ্যত্বের সহিত ঠিক খাপ খাইত কি না সন্দেহের বিষয়। পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিয়াছি, জজ সাহেব কোর্টে আসিয়া এজলাসে প্রবেশের পূর্ব্বে খাস কামরায় বসিলে, তাঁহার ছোট বড় অধিকাংশ কেরাণী পর্দ্দা ঠেলিয়া তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে আভূমি-নত মস্তকে অভিবাদন করিতেন; তাহার পর যাঁহার যাহা সহি করাইবার থাকিত, কলের পুতুলের মত নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া সহি করাইয়া আবার সেলাম দিয়া

সিংহ-বিবর হইতে বাহির হইতেন। আমাদিগকে মানুষ বলিয়া যাঁহাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই, তাঁহাদের বাড়ীতে আমরা দৈবাৎ দেখা করিতে যাইলে শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহারা বসিতে বলিবেন না ? সুতরাং তিনি বসিতে না বলায় তাহা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হয় নাই ; কিন্তু আমি আফিসের চোগা-চাপকান পরিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম না কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় আমার আত্মসংবরণ করা একটু কঠিন হইল। আমি খুব নরম সুরেই বলিলাম, "আপনি সার, আমার উপরওয়ালা, আর আমি আপনার নগণ্য কেরাণী, এ সম্বন্ধ বিচার করিয়া আপনার বাসায় দেখা করিতে আসিতে হইবে, ইহা বুঝিতে পারি নাই। আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্ভ্রান্ত লেখক, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ; আমার গুরুস্থানীয় কবিবরের বন্ধু ; আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের নগণ্য লেখক। বঙ্গসাহিত্যের এক জন শ্রেষ্ঠ সেবকের নিকট এক জন দীন সেবক আসিয়াছে, তাহাকে আফিসের খোলসে না আসিতে দেখিয়া যদি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বেয়াদপি মাফ করুন। আর কখন আপনার বাংলোতে আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব না।"—তিনি আমার কথায় কি ভাবিলেন, জানি না ; কিন্তু পুনর্ব্বার বলিলেন, "উপরওয়ালার সহিত দেখা করিতে হইলে সর্ব্বদা আফিসের পোষাকে যাইবে।"

আমি মিঃ পালিতকে সেলাম ঠুকিয়া বাহিরে আসিলাম, তাহার পর যত দিন তিনি রাজসাহীতে ছিলেন, কোন দিন তাঁহার বাংলোতে যাই নাই ; কিন্তু সেই দিন হইতে কেরাণীগিরির প্রতি বিতৃষ্ণা হইল। সুখ-দুঃখের বন্ধু অবিনাশকে এ কথা বলিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দুঃখ করিয়া কি করিবে, ভাই ? ঐ রকমই দস্তুর ! ইংরাজ সিভিলিয়ান জজদের যেটুকু সহানুভূতি পাই, আমাদের দেশী সিভিলিয়ানদের নিকট অধীন কেরাণীদের তাহাও পাইবার আশা নাই ; উহারা আমাদিগকে শিয়াল-কুকুরের সমান মনে করে।"

ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই দিনই চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাই ; কিন্তু সে সময় আমার সাংসারিক অস্বচ্ছলতা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া নিরুৎসাহচিত্তে চাকরী করিতে লাগিলাম। কিন্তু সুযোগ পাইলেই সরিয়া পড়িব, এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম। কিছুকাল পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজসাহী হইতে সুদীর্ঘ পাড়ি—ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গুর্জ্জরের মরুভূমি ! ব্যবধান, সমগ্র ভারতবর্ষের বিশাল বিস্তার, কত নদ, নদী, গিরি কান্তার।

(১৭)

বহুদিনের কথা, কোন্ সাল ঠিক স্মরণ নাই ; কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও এই দেবদুর্লভ চাকরীতে বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি বরোদাপতি মহারাজা সয়াজি রাও গায়কবাড়ের আগ্রহে বরোদা সরকারের চাকরী লইয়া বরোদায় আসিয়াছিলেন এবং বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মিঃ লিটলভেন ছুটী লইয়া স্বদেশে যাত্রা করায় তিনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া বরোদা কলেজে অধ্যাপনাকার্য্যে রত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ য়ুরোপের বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও, এমন কি, সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় য়ুরোপের একাধিক ভাষায় 'রেকর্ড মার্ক' পাইলেও তিনি মাতৃভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি শৈশবকালে পিতামাতার সহিত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং বরোদা সরকারের চাকরী লইয়া যৌবনকালে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ডে প্রবাস-জীবন

অতিবাহিত করায় তিনি মাতৃভাষায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তিনি ও তাঁহার মেজ দাদা সুকবি স্বর্গীয় মিঃ এম, ঘোষ (পরে ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক) দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পিতা সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে তাঁহাদিগকে কিরূপ অর্থ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দের নিকট তাহার বিবরণ শুনিয়াছিলাম। অনেকেই বোধ হয় জানেন না, শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে ছিলেন, তখন তিনি মিঃ এ, এ, ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি চাকরী গ্রহণ করিয়া বরোদায় আসিলেও তাঁহার বহু চিঠিপত্রের লেফাফায় 'এ, এ, ঘোষ' এই নাম দেখিয়াছি। অরবিন্দ নামের পূর্ব্বে অতিরিক্ত একটি 'এ' অক্ষর সংযোগের কারণ কি, তাহা তাঁহাকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নাই। স্মরণ হইতেছে—শুনিয়াছিলাম, ঐ 'এ' শব্দটি 'একর বেডের' সংক্ষিপ্ত সার। এই সাহেবী উপনামটি ব্যবহারের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এ কালে কেহ না কেহ বলিতে পারেন। সম্ভবতঃ তাহা তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান্ বারীন্দ্রকুমারের ও তাঁহার পূজনীয় মেসোমহাশয় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং তাঁহার পরিজনবর্গের জানা থাকিতে পারে।

যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। শ্রীযুত ঘোষ নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যিনি য়ুরোপের বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, মাতৃভাষায় পারদর্শিতা লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। দীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে যখন তিনি সুদূর গুর্জ্জর হইতে দেওঘরে মাতামহালয়ে আসিতেন, তখন তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের আলোচনার সুযোগ ঘটিত, কারণ, তাঁহার মাতামহালয় বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেকালে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান লেখকগণের অন্যতম ছিলেন, তাঁহার মাতুল যোগেন্দ্রবাবু ও মুনীন্দ্রবাবুও বঙ্গসাহিত্যের সুলেখক ছিলেন। তাঁহার মেসোমহাশয় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র আজীবন বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অথচ চাকরী উপলক্ষে তাঁহাকে বৎসরের অধিকাংশকাল বাঙ্গালীবর্জ্জিত বরোদায় বাস করিতে হইত বলিয়া তিনি সেখানে বঙ্গভাষার আলোচনার সুযোগ পাইতেন না, এই জন্য একবার গ্রীষ্মাবকাশে দেওঘরে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল. বঙ্গভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে এক জন শিক্ষককে বরোদায় লইয়া যাইবেন। তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার জন্য এরূপ এক জন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন,—যিনি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তাঁহাকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতে পারেন। বঙ্গসাহিত্যের কোন লেখক এই কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন বলিয়াই যোগেন্দ্রবাবুর ধারণা হইয়াছিল। রাজসাহীর জজ আদালতের চাকরীতে কি কারণে আমি বীতস্পৃহ হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আমি সেই চাকরী ত্যাগের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কেবল পারিবারিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া সেই চাকরী ত্যাগ করিতে পারি নাই। তখন আমাদের সাংসারিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, চাকরী ছাড়িয়া উপার্জ্জনহীন অবস্থায় এক দিনও আমার বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। যোগেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম, শ্রীযুত ঘোষের সহিত আমি বরোদায় যাইতে সম্মত আছি। সে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় বি, এ, এম, এ-র এত ছড়াছড়ি ছিল না, এবং এক জন শিক্ষকের শিক্ষকতা করিবার জন্য কোন বাঙ্গালী উমেদার ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে সহজে সম্মত হইতেন কি না, জানি না। তবে অন্য কোন বাঙ্গালী যুবক যে এই চাকরীর জন্য চেষ্টা করেন নাই, এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না,

এবং আমি তাহা কোনও দিন জানিবারও চেষ্টা করি নাই। যদি আমি মফঃস্বলের আদালতের এক জন নগণ্য কেরাণী, এই সম্বলটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া এই চাকরী লাভের চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আমার চেষ্টা সফল হইত না, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। কিন্তু আমার অন্য পরিচয়ও একটু ছিল, এবং তাহাই বোধ হয় আমার প্রধান সুপারিশ হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পূজনীয় কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বড় দাদা পূজনীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল বাঙ্গালার প্রাচীনতম মাসিক পত্রিকাগুলির অন্যতম 'ভারতী'র সম্পাদকীয় ভার বহনের পর সেই ভার তাঁহার ভগিনী স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীকে প্রদান করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেও, 'ভারতী'র সেই সময়ের লেখকগণের নাম তাঁহার ও তাঁহার পরম বন্ধু স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অজ্ঞাত ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের যে সকল লেখক তখন 'ভারতী'র সেবা করিতেন, এই ক্ষুদ্র লেখকের নাম সেই সকল লেখকের নামের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। আমার অকিঞ্চিৎকর রচনা সে সময় নিয়মিতভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইত। আমার রচিত একটি 'হেঁয়ালী নাট্য' সেই সময় 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইলে সেই সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' বিদ্রূপ কশাঘাতে আহত হইয়া পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীকে কিরূপ ইতর ও অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিল, এবং সেই আক্রমণে শিক্ষিত সমাজে কিরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, এত কাল পরে কোনও বৃদ্ধের তাহা স্মরণ আছে কি না, জানি না ; কিন্তু স্মরণ আছে, একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র সেই কদর্য্য রুচির পরিচয় পাইয়া সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালা সংবাদপত্রকে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল 'Should be horse-whiped before the public gaze.'—ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে বিরত রহিলাম। সেই 'হেঁয়ালী নাট্যে' লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত থাকিলেও লেখকের নাম ভারতীর অন্তরঙ্গ আত্মীয় দলের অজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রধানতঃ কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও নেতৃত্বে বাঙ্গালার সেই সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি কবিবরের নিকট যে সকল পল্লীচিত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা তিনি সাদরে 'সাধনা'য় প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার এতই প্রীতিকর হইয়াছিল যে, তিনি 'পল্লীচিত্র' প্রসঙ্গে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা দেশের হৃদয় হইতে আনন্দ ও শান্তি বহন করিয়া আনিয়া আমাকে উপহার দিয়াছেন।'

এই সকল রচনা প্রকাশের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে বঙ্গসাহিত্যের কোন নবীন লেখক বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য মৎস্য-নারীর ভাষায় দেবদুর্লভ গালি বর্ষণ করিলেও গুণগ্রাহী যোগেন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যের এই অযোগ্য লেখককেই শ্রীযুত ঘোষের বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক হইবার যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। এত কাল পরে যাঁহারা আমাকে গালি দিয়া লেখনীধারণ সার্থক মনে করিয়াছেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন তাঁহারা দিগম্বর বেশে চুষিকাটী লেহনেই নিরুদ্বেগ শৈশব অতিবাহিত করিতেছিলেন ; নতুবা যোগেন্দ্রবাবুর মত পরিবর্ত্তিত হইত কি না, কে বলিতে পারে ? যাহা হউক, ভগবান আমাকে শ্রীযুত ঘোষের শিক্ষকতার গৌরবে বঞ্চিত করিলেন না। জজ আফিসের এক জন নগণ্য কেরাণীকেই তিনি এই দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন।

কিন্তু জজ আফিসে আমি যে চাকরী করিতেছিলাম, তাহার ছুটী লইয়া গোল বাধিল। দায়রা বিভাগের অফিস সংক্রান্ত সকল কার্য্যভার আমার হস্তে অর্পিত ছিল, এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদেশের বিরুদ্ধে যে সকল ফৌজদারী আপীল হইত, রাজসাহী ও

মালদহ এই দুই জেলার ফৌজদারী আপীলের বিচার রাজসাহীর সেসন্‌স জজকেই করিতে হইত। এ কালের মত সে-কালে জেলায় জেলায় সহকারী বা অতিরিক্ত সেসন্‌স জজ নিযুক্ত হইতেন না। এ-কালে অনেক বহুবর্ষী সব জজকে সহকারী সেসন্‌স জজের ক্ষমতা প্রদান করা হইতেছে, তাঁহারা দেওয়ানী মামলার আপীলের ন্যায় ফৌজদারী আপীলের এবং দায়রার মামলার বিচার নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং কিছু দিন পরে তাঁহারা অতিরিক্ত সেসন্‌স জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, যদি বহুমূত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চাকরী বজায় রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা পেন্সন গ্রহণের কিছু কাল পূর্ব্বে কায়েমীভাবে জেলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সে-কালে মুন্সেফী হইতে ক্রমোন্নতির ফলে পাকা জেলা জজ ও দায়রা জজের পদে কায়েমীভাবে নিযুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ছিল, অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান বিড়ালের ভাগ্যেই শিকা ছিঁড়িত। রাজসাহীর সে-কালের জেলা জজ ও দায়রা জজ স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সিভিলিয়ান না হইলেও ঐরূপ জজ ছিলেন। শীল সাহেব রাজসাহী ত্যাগ করিলে ষ্টীনবার্গ, পালিত, ষ্টেলী প্রভৃতি অনেক সিভিলিয়ান জজ রাজসাহীতে জজিয়তী করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজসাহী ও মালদহের ফৌজদারী আপীল ও দায়রার বিচারকার্য্যে তাঁহারা কোন সহকারী বা অতিরিক্ত জজের সহায়তা পাইতেন না। রাজসাহীতে এক জন মাত্র সবজজ ও দুই জন মুন্সেফ ছিলেন, মালদহের দেওয়ানী আদালতে কেবল মুন্সেফই ছিলেন, সবজজ পর্য্যন্ত ছিলেন না।

রাজসাহীর সেসন্‌স জজকে রাজসাহী ও মালদহের দায়রার মামলা করিতে হইত, এবং দুই জেলার সমুদয় ফৌজদারী আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইত। এজন্য ফৌজদারী আপীলের সংখ্যা অল্প ছিল না, এতদ্ভিন্ন রাজসাহী ও মালদহের জেলখানা হইতেও অনেক কয়েদী আপীল করিত, তাহাদের অনেকেই আত্মসমর্থনের জন্য উকীল নিযুক্ত করিতে পারিত না। জজসাহেব নিম্ন আদালতের নথিপত্র তলপ করিয়া এক তরফা বিচার করিতেন। শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, রাজসাহীর জজ আদালতের ট্র্যান্‌শ্লেটার ছিলেন। তাঁহাকে অনেক দেওয়ানী মামলার ও দায়রার মামলার নথিপত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইত। মামলার সংখ্যা এরূপ অধিক ছিল যে, এই সকল নথির অন্তর্ভুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, প্রথম এত্তেলা প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া ফৌজদারী আপীলের কাগজ-পত্রের অনুবাদ করা তাঁহার অসাধ্য হইত, এজন্য ঐ সকল কাগজ-পত্রের অনুবাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন মালদহের সার্কিট হাউসে দায়রার মামলা করিতে যাইবার সময় জজসাহেব পেস্কার স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায়কে ও আমাকেই সঙ্গে লইতেন, এজন্য মালদহের দায়রার মামলার নথি-পত্রের অধিকাংশের অনুবাদ আমাকেই করিতে হইত। এই জন্য অনুবাদ-কার্য্যে আমি কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলাম, এবং উত্তরকালে যখন সাহিত্যসেবাই আমার উপজীবিকা হইয়াছিল, তখন, বিশেষতঃ শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গভাষায় শিক্ষাদানকার্য্যে এই অভিজ্ঞতায় আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। আমার অনুবাদ জজদের মনোরঞ্জন করিতে পারিত কি না, তাহা কোন্ দিন জানিতে পারি নাই, কিন্তু সেই অনুবাদ পাঠে তাঁহাদিগকে কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখি নাই, এবং ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম। তথাপি সকল কথা অনুবাদে ঠিক বুঝাইতে পারিতাম, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটক পড়াইতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে 'মামীর পিরীতে মামা হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ'—কবিতার এই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া বুঝাইতে পারি নাই, এ কথা বোধ হয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সেইরূপ 'জয়লাল আমার হেতো ব্যাটা'—দায়রা মামলার প্রাথমিক বিচারকালে এক জন সাক্ষীর জবানবন্দীর এই অংশও

অর্থাৎ 'হেতো ব্যাটা' এক কথায় অনুবাদ করা আমার অসাধ্য হইয়াছিল।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই 'হেতো ব্যাটার' গল্পটি লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বহুকালের কথা, রাজসাহী কি মালদহ কোন্ আদালতের দায়রার মামলার কথা, স্মরণ নাই। এক জন নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেছিল। বলিয়াছি, ইংরাজী অনুবাদে এক কথায় 'হেতো ব্যাটা'র প্রতিশব্দ লিখিতে পারি নাই। জজসাহেব কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সাক্ষীকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সরলপ্রকৃতি সাক্ষী সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া যে ব্যাখ্যা করিল, সিভিলিয়ান ইংরাজ জজ সাহেব তাহা বোধ হয় কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সাক্ষী জজ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হেতো ব্যাটা কারে কয় বুঝ্‌লি না সায়েব ! ধর, তোর একটা ম্যাম (মেমসাহেব=পত্নী) আছে, আর সেই ম্যামের প্যাটের এক ছাওয়াল (পেটের ছেলে) আছে। তা, তুই হেকিমী (হাকিমী) কত্তি কত্তি শিঙে ফুক্‌লি। তোর ম্যাম আঁড় (রাঁড়=বিধবা) হলেন। মুই (আমি) তোর সেই আঁড় ম্যামকে নিকে (বিবাহ) করনু। তোর ম্যামের সেই ব্যাটা আমার ঘরে আস্যে আমারে বাপ্‌জান্ বুলে ডাক্‌বি তো ? সে হ'লো গিয়ে ত্যাখোন আমার হেতো ব্যাটা।"

তাহার এই সুস্পষ্ট ব্যাখায় জজ সাহেব কিরূপ আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু এজলাসের সকল লোকের ওষ্ঠে হাসির বিদ্যুৎঝলক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অনেক বাঙ্গালা শব্দের যথাযোগ্য ইংরাজী অনুবাদে আমি আনাড়ীত্বের পরিচয় দিলেও আমার আশা ছিল জজ আদালতের ট্র্যানশ্লেটার যদি কোন দিন উচ্চতর পদে প্রমোশন পান, তাহা হইলে হাতে কলমে যখন এত দিন কায করিলাম, তখন আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করিলে, আমার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইতেও পারে। জজকোর্টের ট্র্যানশ্লেটারের পদ সে-কালে সম্ভ্রমের চাকরী বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল ; এবং সেই পদ হইতে হেড্‌ক্লার্ক, নাজীর বা সেরেস্তাদারী লাভের আশা, দুরাশা বলিয়া গণ্য হইত না। সুতরাং আমার কর্ম্মজীবনের ভবিষ্যৎ কেবল যে নিরাশার নিবিড় মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, এ কথা বলা যায় না, সেই মেঘস্তর মধ্যে মধ্যে আশার বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইত। কিন্তু তাহা কেরাণীগিরির লাঞ্ছনার মধ্যে আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। এই জন্য সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া একটা তুচ্ছ অস্থায়ী চাকরী অবলম্বন করিয়া শস্য-শ্যামলা, নদী-মেখলা, তরুচ্ছায়া শীতলা, স্নেহ-বিহ্বলা, শৈশবের ক্রীড়াকুঞ্জ, যৌবনের আনন্দনিকেতন সোনার বাঙ্গালা হইতে বহুদূরে গুর্জ্জরের মরুবক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। কিন্তু ঘরে-বাহিরে নূতন নূতন বাধা দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় আমাকে পরিবেষ্টিত করিল। আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিলেন। আফিসে সেরেস্তাদারবাবু আমার পরম হিতৈষী ছিলেন, তিনি আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আভাস দিলেন, এবং চিরজীবনের অবলম্বন কায়েমী সরকারী চাকরী ও বার্দ্ধক্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল পেন্সনের আশা ত্যাগ করিয়া একটা উঠবন্দী বাজে চাকরী লইয়া অত দূরদেশে—বরগীর মুলুকে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমাকে চাকরীত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, ইস্তফানামা দাখিল না করিয়া ছয় মাসের ছুটী লইয়া যাওয়াও মন্দের ভাল। বিনা বেতনে ছুটী, যদি নূতন চাকরীতে মন বসে, তাহা হইলে পরে আরও ছয় মাসের ছুটী পাওয়া তেমন কঠিন হইবে না—ইত্যাদি।

আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেরেস্তাদার মহাশয়ের উপদেশে জজ সাহেবের নিকট বিনা বেতনে

ছয় মাসের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিলাম ; মনে হইল, সেই দূদূর প্রবাসে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত সমাজে দীর্ঘকাল বাস করিবার ইচ্ছা না হইলে ছয় মাসের মধ্যেই দেশে ফিরিব, আর যদি শ্রীঅরবিন্দের সহিত একত্র বাস করিয়া আনন্দ লাভ করি, দেশে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল না হয়, তাহা হইলে পরে আরও ছয় মাসের ছুটী লইব। বিনা বেতনে ছুটী মঞ্জুর করিতে জজ সাহেবের আপত্তি না হইবারই কথা। সেরেস্তাদার মহাশয়ও আমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া, আমার ছুটীর দরখাস্তে অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। দরখাস্তখানি আফিসের দস্তুর অনুসারে সেরেস্তাদার মহাশয় তাঁহার ফাইলের অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত পেশ করিবার জন্য নিজের নিকট রাখিলেন। প্রতিদিন সাহেব এজলাসে বসিবার পূর্ব্বে খাস-কামরায় বসিয়া আফিস-সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম শেষ করিতেন, সেরেস্তাদার-প্রদত্ত কাগজপত্রও স্বাক্ষরিত করিতেন। পরদিন সাহেব কোর্টে আসিয়া তাঁহার খাস-কামরায় বসিলে, সেরেস্তাদার মহাশয় 'ফাইল' হাতে লইয়া সাহেবকে সেলাম দিতে চলিলেন। তিনি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া আনিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিবেন, এই আশায় আমার আফিস-কক্ষে আমি বসিয়া রহিলাম।

সেরেস্তাদার মহাশয় সাহেবের কামরা হইতে তাঁহার আফিসে ফিরিয়া টেবিলের উপর সামলা নামাইয়া রাখিয়া আমাকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সাহেব তোমার ছুটী মঞ্জুর করলেন না। বিনি মাইনেয় ছ'মাসের ছুটী চেয়েছ, আমিও তোমার ছুটীর জন্য 'রেকমেণ্ড' করেছি ; কিন্তু সাহেবের কি গোঁ, বল্লেন, অত লম্বা ছুটীর দরকার হয়, সে চাকরীতে 'রিজাইন' দিতে পারে।" আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। সেরেস্তাদার মহাশয় কাহারও ছুটীর জন্য সুপারিশ করিলে, সাহেব তাহা কোনও দিন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এরূপ একটা দৃষ্টান্তও মনে পড়িল না।

তখন রাজসাহীর জজ কে ছিলেন, তাহা এতকাল পরে আমার ঠিক স্মরণ নাই। মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত রাজসাহী হইতে বদলী হইলে কয়েক জন জজ অল্পদিন থাকিয়াই পর পর রাজসাহী হইতে বদলী হইয়াছিলেন। আমি যে সময় ছুটী প্রার্থনা করি, সেই সময় মিঃ ষ্টেলী বোধ হয় রাজসাহীর জজ ছিলেন। আমি ও পেস্কার অবিনাশ তাঁহার সঙ্গে একাধিকবার দায়রার বিচার উপলক্ষে মালদহে গিয়াছিলাম। আমার কোনও কার্য্যে তাঁহার বিরাগ বা বিরক্তির পরিচয় পাই নাই।

সেরেস্তাদার মহাশয় সাহেবের খাস-কামরা হইতে ফিরিবার কয়েক মিনিট পরে নাজীর নন্দগোপালবাবু, হেডক্লার্ক কৃষ্ণলালবাবু, ট্র্যান্‌স্লেটার শরৎবাবু, মহাফেজ গদাধরবাবু, হেড কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক মোহিনীবাবু প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মাথা সাহেবকে সেলাম দিয়া ফিরিলেন, এবং স্ব স্ব সেরেস্তায় প্রবেশ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে সাহেবের চাপরাসী অলি আমার আফিস-কক্ষে আসিয়া বলিল, "সাহেব এখনও খাস-কামরায় ব'স্যা আছে, আপনারে সেখানে যাতি বুল্‌লে।"

সাহেব খাস-কামরায় ডাকিয়াছেন। আর কোনও দিন আমার এরূপ সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। বুঝিলাম, আমার ছুটী সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন। বলা বাহুল্য, আমি আমার দরখাস্তে এ রকম কথা লিখি নাই যে, আমি স্থানান্তরে চাকরী পাইয়াছি, চাকরীটা ভাল লাগিবে কি না পরীক্ষার জন্য ছুটী চাই।—আমি লিখিয়াছিলাম, কোনও প্রয়োজনে আমাকে দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে যাইতে হইবে, এজন্য আমি বিনা বেতনে ছয় মাস ছুটীর প্রার্থী।

আমি খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া, "গুড্‌ মর্নিং সার !" বলিয়া তাঁহার টেবলের নিকট

দাঁড়াইতেই, তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, "বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটী চাহিয়াছ কেন ?"

সাহেবের প্রশ্নে উৎকট সমস্যায় পড়িলাম। যেরূপেই হউক, রাজসাহী ত্যাগ করিব, এ সংকল্প স্থির ছিল ; এবং নূতন চাকরী উপলক্ষে ছুটী লইতেছি, এ কথা স্বীকার করিলে কোন অপরাধ হইত না, ইহাও সত্য ; কিন্তু চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই হউক, আর সত্য কথা বলিবার সাহসের অভাব বশতই হউক, কথাটা মুখে বাহির হইল না। বোধ হয়, হাতের পাঁচের মায়া ত্যাগ করিতে না পারাই ইহার কারণ। কিন্তু মিথ্যা কথাও ত বলা যায় না। এই জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "অতি অল্পদিনের মধ্যে বাবাকে এবং দুই কাকাকে হারাইয়াছি, জীবন অবলম্বনহীন। একবিন্দু সুখ-শান্তি নাই, মন অত্যন্ত চঞ্চল, কিছুকাল দেশভ্রমণ, তীর্থদর্শন এই সকল করিব,—আপাততঃ গুজরাট অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা ; দ্বারকাতীর্থ তাহার নিকটে অবস্থিত।"

সাহেব বলিলেন, "তোমাদের দেশের লোক বুড়া বয়সে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য যে কার্য্য করেন, তুমি যৌবনেই তাহা শেষ করিয়া রাখিতে চাও। কিন্তু তীর্থদর্শন করিতে ত ছয় মাস লাগে না। তোমার আর্থিক অবস্থা কি এরূপ সচ্ছল যে, তুমি বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটী লইয়া এ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ্ করিতে পারিবে ? মন খারাপ করিয়া লাভ নাই ; ও খেয়াল ত্যাগ কর। মালদহের সেসন্সের সময় হইয়াছে ; যাও, কাগজপত্র 'রেডি' করিয়া সে জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমার ছুটী মঞ্জুর করি নাই।"

বুঝিলাম, আমাকে ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। সে সময় চারি পাঁচ জন উমেদার চাকরীর আশায় জজ কোর্টে শিক্ষানবিশী করিতেছিল। আমি চাকরী ছাড়িলে প্রার্থীর অভাব হইবে না ; তথাপি আমি চলিয়া যাই—সাহেবের ইহা অনভিপ্রেত। কোনও সিভিলিয়ান হাকিম, তাঁহার আফিসের একটা ক্ষুদ্র, নগণ্য কেরাণী তাঁহার আফিসে থাক বা যাক—এ বিষয়ে উদাসীন নহেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে হয় ত বিরল ছিল না ; কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় নিম্নপদস্থ কেরাণীরা জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট কীটপতঙ্গ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হইতেন, ইহা আমার জানা ছিল না।

আমি দুই এক মিনিট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ভাবিয়া দেখিবার জন্য এক দিন সময় লইয়া সরিয়া পড়িলাম।

আমার সহকর্ম্মী স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র রায় রাজসাহীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনেক জজের পেস্কারী করিয়াছিলেন। ইংরাজ জজবা কোনও দিন তাঁহার প্রতি মৌখিক স্নেহ্ বা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি কোন দিন তাহার প্রমাণ পান নাই ; কিন্তু এক জন স্বল্পভাষী, উগ্র প্রকৃতির জজ (তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি) রাজসাহী হইতে নদীয়ায় (কৃষ্ণনগরে) বদলী হইবার কিছুদিন পরে, নদীয়ার জজের নাজীরের পদ খালি হইলে, তিনি অবিনাশকে নদীয়ায় লইয়া গিয়া নাজীরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবিনাশ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই চাকরী করিয়াছিলেন। আমরা স্বজাতি-প্রেমের খাতিরে ইচ্ছা করি, মুন্সেফরা কার্য্যদক্ষতা-গুণে প্রমোসন পাইয়া সব্ জজের পদ হইতে সহকারী জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, এবং অবশেষে পাকা জেলা জজ ও সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হউন ; কিন্তু কোন মুন্সেফ-জজ যতই সহৃদয় হউন, তিনি এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলী হইয়া, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব পেস্কারের কার্য্যদক্ষতার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ভিন্ন জেলা হইতে আনাইয়া নিজের আদালতের নাজীরের পদে নিযুক্ত করিতেন না ; পরের উপকারের জন্য অতখানি করিতে হয় ত তাঁহার সাহসেও কুলাইত না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি, ষ্টীনবার্গ, পালিত, ষ্টেলী প্রভৃতি সিভিলিয়ান জজরা সেকালে তিন

চারিটি জেলা ঘুরিয়া, ই, আই, রেলের রাজমহল ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া, এবং চতুর্দ্দশ ক্রোশ পথ পাল্কীবেহারার ঘাড়ে চাপিয়া মালদহে সেসন্স করিতে যাইতেন ; আমাদিগকেও সঙ্গে লইতেন ; কিন্তু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার শীল পাকা জজ হইয়াও, দায়রা উপলক্ষে কোনও দিন মুলুক ঘুরিয়া মালদহে যাইতে সাহস করেন নাই, পাছে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল এই ঘুরো পথের পাথেয় মঞ্জুর করিতে আপত্তি করেন, এবং অবশেষে টাকাটা নিজের পকেট হইতে বাহির করিতে হয়। দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিতে হয়। বিলাতী আই, সি, এস্‌দের ইস্পাতের কাঠামোর নিস্পরোয়া নির্ভীকতা ও অদম্য দৃঢ়তা তাঁহারা কোথায় পাইবেন ? আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম। তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি বিন্দুমাত্র উৎসুক নহি। কিন্তু তাহাদের 'মেণ্টালিটী' "চাচা, আপনা বাঁচা ;"—তা তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন।

যাহা হউক, এক দিন পরেই আমি চাকরীর ইস্তফানামা দাখিল করিলাম। আমার পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর হইল। আমি সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া রাজসাহী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সজল-নেত্রে যে সকল বন্ধুর নিকট বিদায় লইলাম, তাঁহাদের অধিকাংশেরই সহিত ইহলোকে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কেহ কেহ সুস্থ দেহে মোটা পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

(১৮)

জীবনের অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় অতীত স্মৃতির স্তিমিত আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছে, আসন্ন বিভাবরীর তিমির-গর্ভে তাহার বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রবল হইলেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই ; এই জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহালয় দেওঘর হইতে বরোদা গমনের সময়ের ঘটনাগুলি এখনও বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয় নাই। স্মরণ হইতেছে, শ্রীঅরবিন্দ সেই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে সাহিত্যরস উপভোগ ও কবি চর্চ্চার জন্য তাঁহার মাতামহালয়ে—দেওঘরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বড় মামা স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথবাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন, ছুটী ফুরাইলে শ্রীঅরবিন্দ যে দিন বরোদায় যাত্রা করিবেন, তাহার দিন দুই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে সংবাদ দিবেন। তদনুসারে কয়েক দিন পরে আমি দেওঘরে যাত্রা করিলাম। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাত্রা করিতে হইলে নিত্য-ব্যবহার্য্য যে সকল সামগ্রী সঙ্গে লইবার প্রয়োজন হয়, তাহার কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না। লোটা-কম্বল সঙ্গে থাকিলে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতাম, এবং একখান ডায়েরী যোগাড় করিয়া লইতে পারিলে, চক্ষু মুদিয়া গুর্জ্জরের ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে পারিতাম ; কিন্তু ভাণ্ডে যে পরিমাণ তৈল থাকিলে মুরুব্বীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের কৃপায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ঘাড়ে সেই কেতাব চাপাইয়া দিয়া, পরস্মৈপদে কিঞ্চিৎ রসসঞ্চয় করিয়া, ভবিষ্যতের সংস্থান ও সাহিত্যিকবৃন্দের নির্জ্জলা স্তুতিবাদ উপভোগ করিতে পারিতাম, ভাঁড়ে তাহার অভাব থাকায় সাহিত্য-দিক্‌পালদের মহাজনীর অনুসরণ করিতে সাহস হয় নাই। যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগ সংগ্রহের উচ্চ আদর্শ তখনও বাঙ্গালার মেকি সাহিত্যিকদের ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় প্রদানের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই।

যথাসময়ে দেওঘরে আসিয়া অরবিন্দের মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার সারস্বত নিকেতনে 'ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী-ফোয়ারা' শ্রীঅরবিন্দের সহিত সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি আমার মনে আশানুরূপ অনুকূল ধারণা উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে পারি নাই ; কিন্তু সেই প্রথম দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার কুঞ্চিত ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার, সরল দৃষ্টিতে প্রতিভার, অরুণ-কিরণ-সমুদ্ভাসিত হৃদয়ের কোমলতার এবং পার্থিব জগতের বহু উর্দ্ধস্থিত কল্পলোকের স্বপ্নময় ভাবের সহিত তাহার মিলন-মাধুর্য্যের প্রগাঢ়তা অনুভব করিলাম। সে সময় আমার মত সদ্য-পরিচিত 'মাছিমারা কেরাণী' সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা আমাব অসাধ্য হইয়াছিল। মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ, ইহা আমার বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই, এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম—বৈচিত্র্যবহুল কর্ম্মজীবনের বহু যুদ্ধে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন, আত্মসমাহিত-চিত্ত সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর যুবক সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখে অবিচলিত ও সম্পূর্ণ উদাসীন। পরবর্ত্তী জীবনে যে নিস্পৃহতা ও নির্লিপ্ততা তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তসংযমের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূলতায় তাঁহাকে সাধারণ মানবের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বহু উর্দ্ধে ধ্যানমগ্ন যোগীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাঁহার সেই উচ্ছ্বাসবিহীন ও চাপল্য-সংস্রব-বিরহিত, ব্রহ্মচর্য্যরত যৌবনের অনাগত মধ্যাহ্নে তাহার সুস্পষ্ট আভাষ হৃদয়ঙ্গম করিতে দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় নাই। যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমি তাহা গ্রহণের এবং বহনের যোগ্য কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করিতে না দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, এ কথা সত্য ; কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং দুই একটি কথায়, মানুষের সংস্কারসঞ্জাত অন্তর্নিহিত ভাব আয়ত্ত করিবার যে অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সুতীব্র অনুভূতিকে প্রতারিত করে নাই, ইহা আমি পরে অভিজ্ঞতা-সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু সেই গম্ভীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাষী, বিলাসলালসা-বর্জ্জিত, আপনার ভাবে আপনি-বিভোর, আত্মসমাহিত যুবককে কোন দিন সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও ছিল না।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণবাবুকে জীবনে সেই প্রথম দেখিলাম। শুভ্র দাড়ি-গোঁফ, জীবনের উপান্তোপনীত রোগক্লান্ত শয্যাশায়ী বৃদ্ধ, কিন্তু কি সৌম্যমূর্ত্তি! রোগ-যন্ত্রণা যেন তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত। জীবনে কখন যোগি-ঋষি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই ; কিন্তু সংসারে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত তপস্বীর আদর্শ যেন তাঁহাতেই দেখিতে পাইলাম বলিয়া মনে হইল এবং তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহারই ন্যায় শিক্ষাদানব্রতে উৎসর্গীকৃত-জীবন আর এক জন বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল। তিনি স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী। স্বর্গীয় রসরসিক নাট্যকার দীনবন্ধু সরলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভগবদ্ভক্ত এই সাধুর প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সহবাসে পাপাসক্ত মন সাত দিন পবিত্র থাকে। রাজনারায়ণবাবুর সম্বন্ধেও এই উক্তি তুল্যরূপে প্রযোজ্য বলিয়াই আমার ধারণা হইল। মনে হইল, রতনেই রতন চেনে ; নতুবা কি তাঁহার ন্যায় সমপ্রকৃতির স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইত? বহু দিন পরে এক দিন অরবিন্দ প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দাদামহাশয় (রাজনারায়ণবাবু) তাঁহার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে যখন হাসেন, তখন তাঁহাদের হাসির গর্‌রায় ঘরের ছাদ উড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়!' এ অনেক দিন পরের কথা ; কিন্তু সেই প্রথম দিন কথায় কথায় তাঁহার যে হাসি দেখিয়াছিলাম, সেরূপ শিশুর ন্যায় সরল হাসির উচ্ছ্বাস অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তির

মুখে উচ্ছ্বসিত হইতে দেখি নাই। মন শিশুর মনের ন্যায় সরল ও পবিত্র না হইলে মানুষ ওভাবে হাসিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, নামযশোহীন সাহিত্যসেবকের নাম পূর্ব্বে কোন দিন তিনি শুনিয়াছিলেন কি না, জানিতাম না, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশেরও সাহস হয় নাই ; কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনিই বক্তা, আমি নির্ব্বাক্ শ্রোতা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-প্রসঙ্গে তিনি কত কথা বলিলেন, এত কাল পরে তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু তাঁহার একটি কথা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। চণ্ডীদাসের অমৃতমধুর পদাবলী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, সেরূপ কামগন্ধলেশহীন আদর্শ-প্রেমের কবিতা বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর কোথাও তিনি খুঁজিয়া পান নাই। সে কালের এক জন অত্যুৎসাহী ব্রাহ্মের মুখে চণ্ডীদাসের কবিতাগুলির এই প্রকার প্রশংসা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম ; বিশেষতঃ, যখন মনে পড়িল—তিনি ডিরোজিওর সেই সকল ছাত্রের অন্যতম, যাঁহারা মদ্যপানকে হিন্দুর কুসংস্কারের প্রতিবাদ বলিয়া মনে করিতেন, এবং প্রতিবেশীর গৃহে নিষিদ্ধ মাংস-সংলগ্ন অস্থি নিক্ষেপ করা পৌরুষের কার্য্য মনে করিয়া সেই কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন।

রাজনারায়ণবাবুর সহিত বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে স্মরণ হইল—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে মাইকেল রাজনারায়ণবাবুর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও পরম প্রীতিভাজন সতীর্থের অভিমত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ; তাঁহার এই অনুরোধে স্পষ্টভাষী রাজনারায়ণবাবু এই কাব্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের জটাবাকলের ফাঁক দিয়া কোট-পাণ্টলুন দেখা যাইতেছে। এত অল্প কথায় মাইকেল-অঙ্কিত রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রের বিশেষত্ব আর কোন সমালোচক প্রদর্শন করিতে পারিতেন কি না, তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই ; কিন্তু এই সুসংযত ইঙ্গিতের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাহা শুনিয়া তিনি আমোদ বোধ করিয়া, হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই খোলা প্রাণের সরল হাসি। মনে হইতেছে, তিনি যেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—তাঁহার বন্ধু রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় কবিগুরু বাল্মীকির অনিন্দ্য-সুন্দর মহান্ আদর্শ গ্রহণ করেন নাই ; তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার সেই আদর্শ গ্রহণের বিরোধী ছিল,—যদিও মাইকেলের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ ছিল, এবং তাঁহার সেই প্রেমের অভিব্যক্তি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' পরিপূর্ণরূপেই পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং এখনও তাহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমি পূজনীয় রাজনারায়ণবাবুর নিকট একটি আমোদপ্রদ গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি বোধ হয়, সে কালের সাহিত্যামোদী পাঠকগণের অনেকেরই সুবিদিত ; তবে এ কালের যে সকল শিক্ষিত যুবক মধুসূদনের কাব্য ও কবিতাদি পাঠের অযোগ্য মনে করেন, সেকেলে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকেও যাঁহারা আমোল দিতে চাহেন না, অথচ যাঁহারা কথায় কথায় সেলী, বায়রন, কীট্স্, সুইনবর্ন প্রভৃতির নাম শুনিয়াই 'আহা এই শ্রীমাটীতেই শ্রীখোল হয়', বলিয়া ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া গড়াগড়ি পাড়েন, তাঁহাদের নিকট গল্পটি হয় ত নূতন ; এই জন্য এখানে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহ হইতেছে।

তখন ব্রজাঙ্গনা কাব্য সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এ কালের মত তখন মফস্বল দূরের কথা, কলিকাতাতেও ছাপাখানার ছড়াছড়ি ছিল না, এবং বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন

গ্রন্থকারের কাব্য-নাটকাদি প্রকাশিত হইলে, সেই সকল পুস্তক একালের মত অল্পদিনে মফস্বলের সাহিত্যানুরাগী পাঠক-সমাজে প্রচারিত হইত না। তখনও বঙ্গদর্শনের যুগ আবির্ভূত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তখন অমর ঔপন্যাসিকের কল্পনালোকেই বিরাজিত ; রমেশচন্দ্র তখন পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হন নাই ; তাঁহার বঙ্গ বিজেতা রচনার কল্পনা ত দূরের কথা। তারকনাথের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণলতা সেই সময়ের অনেক পরে রাজসাহী হইতে প্রকাশিত সে-কালের শ্রেষ্ঠ মাসিক-সমূহের অন্যতম 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে কত কাল পূর্ব্বের কথা! সেই সময় মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হইবার পর তাহার এক খণ্ড নবদ্বীপের কোনও সাহিত্যরসজ্ঞ সেকেলে পণ্ডিত (তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম,—এবং তিনি বিদ্যারত্ন, কি ন্যায়-পঞ্চানন উপাধিধারী ছিলেন, তাহাও এত দিন পরে আমার স্মরণ নাই) মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পাঠে তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ব্রজাঙ্গনার কবি যে প্রকৃত সাধক ও প্রেমিক, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

এই সূত্রে সেকালের ও একালের পাঠকগণের চরিত্রগত ও রুচিগত বিশেষত্বেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে। সে-কালের পাঠকরা কোন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা পাঠে মুগ্ধ হইতেন ; তাহা পাঠে উপকৃত হইলেন মনে করিতেন, লেখকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। তাঁহারা প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। আর এ-কালের শিক্ষাভিমানী পাঠকগণের অধিকাংশই সমালোচক, তাঁহাদের সেই সমালোচনায় রসের উপভোগস্পৃহা অপেক্ষা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টাই অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; সাহিত্যরস বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া তাঁহারা যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, তাহার ভিতর হইতে যে দম্ভ ও অহমিকা আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে অশোভন স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না এবং সেই পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত সমালোচনা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—সমালোচক তাঁহার বিশ্লেষণ-শক্তির সাহায্যে পাঠক-সমাজে লেখককে পরিচিত করিয়া যেন ধন্য করিলেন। কিন্তু সে-কালের সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকরা সাহিত্যরস উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন ও আপনাকেই ধন্য মনে করিতেন। তাঁহারা গ্রন্থকার বা লেখককে ধন্য করিলেন, এরূপ প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না।

এই জন্যই নবদ্বীপের সেই রসগ্রাহী ভক্ত পণ্ডিতের হৃদয় এরূপ শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল যে, তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিকে একবার দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপ হইতে কলিকাতার দূরত্ব অল্প নহে, এবং সেকালে নদীপথে কলিকাতায় যাত্রা করা ভিন্ন স্থলপথে কলিকাতায় উপস্থিত হওয়াও সহজসাধ্য ছিল না। এই জন্য তাঁহাকে নৌকোযোগে কলিকাতায় আসিতে হইল।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তিনি মধুসূদনের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার ঠিকানা জানিবার চেষ্টা করিলেন। মধুসূদন তখন খিদিরপুরে বাস করিলেও বৌবাজারে সংস্থাপিত "ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসে" প্রায় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন, এবং একটি কক্ষে বসিয়া তাঁহার পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

মধুসূদন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসে উপস্থিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রুফ দেখিতেছিলেন ; সেই সময় নবদ্বীপের পণ্ডিত ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসের ভবনে প্রবেশ করিয়া কোনও কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, মধুসূদন কোথায়? আমি একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

প্রেসের কর্ম্মচারী বিস্মিতভাবে বলিল, "মধুসূদন! আপনি কোথা থেকে আসছেন

ঠাকুর ?"

ঠাকুর বলিলেন, "শ্রীধাম নবদ্বীপে আমার নিবাস, আমি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবি—বৈষ্ণবচূড়ামণি, কবিশ্রেষ্ঠ পরম ভক্ত মধুসূদনের সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

কর্ম্মচারী বলিল, "ও, আপনি মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে চান ? তাই বলুন। ভিতরে যান, সম্মুখের কুঠুরীতে তাঁকে দেখ্তে পাবেন।"

ঠাকুর আশ্বস্ত-হৃদয়ে প্রেসের সম্মুখস্থ কক্ষের ভিতর অগ্রসর হইলেন : তিনি নবদ্বীপ হইতে বহু পরিশ্রমে ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া পরম ভক্ত কবি মধুসূদনকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ; এত দিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে, নয়ন-মন সফল হইবে। মনের আনন্দ ও উৎসাহ গোপন করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

কিন্তু নির্দ্দিষ্টকক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটা জোয়ান মরদ মেটে ফিরিঙ্গী সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কাগজে কি লিখিতেছে!

ঠাকুর সেই মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিলেন ; মধুসূদনকে দেখিবার আশায় ভ্রমক্রমে তিনি এ কোন্ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন ? ফিরিঙ্গীটা তাঁহার অনধিকারপ্রবেশ মার্জ্জনা করিবে কি ? তিনি দুই এক মিনিট হতভম্বভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগের উপক্রম করিতেই সেই গালপাট্টা-নিবিড়-কৃষ্ণ-গুম্ফধারী ফিরিঙ্গী কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন, এবং পদ্মপলাশনেত্রে আগন্তুক ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া, স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি এখানে কি চান ?"

ব্রাহ্মণ অপ্রতিভভাবে কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "আমি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মহাকবি, পরমভক্ত, সাধক মধুসূদনকে দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিতে আসিয়াছি ; কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রমক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। তিনি এই ছাপাখানায় আছেন শুনিয়াছি। একবার তাঁহাকে দেখিব—এই আশায় বহুদূর নবদ্বীপ হইতে আসিতেছি। কোন্ কক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব, দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন কি ?"

মধুসূদন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, প্রশংসমান নেত্রে সেই দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতমস্তক, শিখাধারী ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় বুঝিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন, "ঠাকুর, আমিই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের লেখক মধুসূদন দত্ত।"

ঠাকুর গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া নির্ব্বাকভাবে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাহার পর মধুসূদনকে বলিলেন, "বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট!"

অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ; কিন্তু সহস্র কথা বলিলেও তদ্দ্বারা মধুসূদনের চরিত্রগত বিশেষত্ব অধিকতর পরিস্ফুটরূপে বুঝাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

যে দুই এক দিন দেওঘরে ছিলাম, শ্রীঅরবিন্দের উভয় মাতুল যোগীন্দ্রবাবু ও মুনীন্দ্রবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। যোগীন্দ্রবাবু সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল ; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশের কোন অধিকার ছিল না। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দূরে দূরে ভ্রমণ করিতেন ; মুনীন্দ্রবাবু পালোয়ান ছিলেন, কুস্তির নানাপ্রকার কসরৎ তাঁহার জানা ছিল। বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি সুলেখক ছিলেন। সেকালের পাঠকরা 'সঞ্জীবনীতে' তাঁহার রচিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলি পাঠে আনন্দ লাভ করিতেন। এই শান্তিপূর্ণ, সন্তোষ ও পবিত্রতাবেষ্টিত ভবনে দুই এক দিন

অতিবাহিত করিয়া বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম। অরবিন্দের এক কাকা সেখানে সরকারী আফিসে চাকরী করিতেন। পিতৃবংশীয় আত্মীয়গণের সহিত অরবিন্দের বা তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অধিক ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, অরবিন্দ সুদূর প্রবাসে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কাকার সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার মেজ দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে আকস্মিক পিতৃবিয়োগে দারুণ অর্থকষ্টে যখন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছিলেন, এবং মাইকেল সুদূর প্রবাসে অর্থাভাবে বিপন্ন হইলে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণ নেত্রের সদয় দৃষ্টি যেমন তাঁহার কাতর মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে বর ও অভয় প্রদানে উৎসাহিত করিত, পিতৃবংশের কাহারও সেইরূপ স্নেহ-কোমল দৃষ্টি, সেই সুদূর প্রবাসে তাঁহাদের উদ্বেগ-কাতর মুখের দিকে প্রসারিত না হইলেও, পিতৃব্যের প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু তাঁহাদের পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত প্রকাশের অধিকার নাই।

বাঁকিপুরে আমাদের দুই এক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। আমি সেখানে সেই অল্পসময়ের জন্য কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই ; অবশেষে পিতৃবন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস, মহাশয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়িল। পরেশ কাকা তখন বাঁকিপুরে চিকিৎসাব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ইহারা দুই ভাই, জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরে কোনও জমীদারের এষ্টেটে চাকরী করিতেন ; কনিষ্ঠ পরেশনাথ বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় কিছুকাল স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি—তাহার অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি বাঁকিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুচিকিৎসকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহারা আবাল্য মেহেরপুরের অধিবাসী ছিলেন, এবং ইঁহাদের সহিত আমাদের পরিবারের আত্মীয়তাবন্ধন যেরূপ সুদৃঢ় ছিল, নিজের পরিবারের বাহিরে আর কাহারও সহিত আমাদের সেরূপ নিবিড় আত্মীয়তা ছিল না। ইঁহারা দুই ভাই আমার পিতৃদেবকে ঠিক জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, এবং 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন। আমিও তাঁহাদিগকে 'কাকা' বলিতাম এবং সেইরূপ ভয় ও ভক্তি করিতাম। বাবার এবং বড় কাকার সহিত তাঁহাদের যেরূপ বন্ধুত্ব ছিল, সেরূপ নিঃস্বার্থ প্রীতির আদান-প্রদান একালে অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। আমি যখন নিতান্ত শিশু, সেই সময় হরি কাকা মেদিনীপুর-মহিষাদলের রাজার পরিচালিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, তিনিই বড় কাকাকে তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। সে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা ; তখন স্বর্গীয় রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ মহিষাদলের জমীদার ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই স্কুল এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। কাকা স্কুলের চাকরী করিতে করিতে কুমারদের গৃহশিক্ষক হইয়াছিলেন ; পরে তিনি চরিত্রগুণে ও কার্য্যদক্ষতাবলে জমীদারীর ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হরি কাকাকেই তাঁহার উন্নতির মূল বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

হরি কাকা ও পরেশ কাকার জীবন সাধারণ পল্লীবাসীদের জীবনের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিতভাবে অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহারা যখন কলিকাতা-প্রবাসী, সেই সময় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময় যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ব্যক্তিগত প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এই চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা

কেশববাবুর সমাজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং উপবীত বিসর্জ্জন দিয়া মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিলে, ব্রাহ্মণ-সমাজ-পরিচালিত মেহেরপুরে যে ভীষণ আন্দোলন-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমার শৈশবকালে সংঘটিত সেই সকল ঘটনা যৎসামান্য মনে পড়ে ; তথাপি মনে হয়, সমাজের সেই সময়ের অবস্থার সহিত একালের সমাজের তুলনা চলে না। হরি কাকা ও পরেশ কাকা যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা তাঁহাদের পৈতৃক বাসভবন নহে ; সেই বাড়ীর প্রকৃত মালিক ছিলেন তাঁহাদের মাতামহ-বংশীয়রা ; এবং তাহা মেহেরপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী, মুখোপাধ্যায়বংশীয়া স্বর্গীয়া সখীমণি দেবীর অধিকারভুক্ত ছিল। হাইকোর্টের একটি মামলার ফলে, সখীমণি দেবীর মৃত্যুর পর এই সম্পত্তিতে হরি কাকা ও পরেশ কাকা বেদখল হইয়া যান, এবং মুখোপাধ্যায়-বংশের অন্য এক সরিক তাঁহাদের আজন্মের বাসভবন অধিকার করিলে, মেহেরপুরে তাঁহাদের আর মাথা রাখিবার স্থান রহিল না। তাহার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় হিন্দু-সমাজের সহানুভূতিতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। এই সময় মেহেরপুরের মুখোপাধ্যায় জমীদার-পরিবার বহু সরিকে বিভক্ত হওয়ায় হীনবল হইলেও, 'বড়' ও 'ছোট' উপনামে পরিচিত দুই দীননাথ মুখোপাধ্যায় মেহেরপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের শক্তিশালী পরিচালক ছিলেন। মেহেরপুর-সমাজের ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ তেমন সুশিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন না হওয়ায়, তাঁহারা 'মুকুয্যে বাবুদের' ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতেন। বাবুদের কাহারও সেকাল-সুলভ কোন গোপনীয় দোষ বা চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ছিল না, এ কথা বলা যায় না ; কিন্তু হরিবাবু ও পরেশবাবু চরিত্রের পবিত্রতায় ও নানা সদ্‌গুণে শিক্ষিত সমাজের গৌরবস্বরূপ হইলেও, তাঁহাদের উপবীতত্যাগের অপরাধ সমাজ মার্জ্জনা করিতে পারে নাই। ইহার ফলে তাঁহারা চিরদিনের জন্য মেহেরপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরেশ কাকার স্ত্রী লক্ষ্মী কাকী (স্বর্গীয়া মহালক্ষ্মী দেবী) তেলিনীপাড়ার জমিদার-বংশের দুহিতা ; কিন্তু তিনিও এই ঘটনার পর পিতৃগৃহে অভিনন্দিতা হইয়াছিলেন, ইহা কোন দিন শুনিতে পাই নাই। হরি কাকা ও পরেশ কাকা মেহেরপুর ত্যাগ করিয়া বিহারে (তখন বিহার বাঙ্গালার ছোট লাটেরই শাসনাধীন ছিল) আশ্রয় গ্রহণ করিলেও আমরা তাঁহাদের স্নেহে বঞ্চিত হই নাই। বড় ভাই যেমন ছোট ভাই-এর সংসারে বাস করেন, পিতৃদেব সেইরূপই অসঙ্কোচে দীর্ঘকাল তাঁহাদের প্রবাসভবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভ্রাতৃ-বন্ধন কোন দিন শিথিল হয় নাই।

সুতরাং আমি যে দিন বরোদার পথে বাঁকিপুরে পরেশ কাকার প্রবাস-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সে দিন কাকার ও কাকীমার স্নেহে, আদরে, যত্নে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কয়েক দিন প্রবাসের যে কষ্ট কাঁটার মত বুকে বিঁধিতেছিল, তাহা তাঁহাদের মমতা-ভরা আবেষ্টনের ভিতর আসিয়া অদৃশ্য হইল : মনে হইল, দেশের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

কথায় কথায় কাকীমাকে বলিলাম, "এখানে যে তোমার নূতন বেশ দেখ্‌ছি, কাকীমা! মেহেরপুরের বাড়ীতে তুমি, কুসুম কাকী, (তাঁহার বড় জা, হরি কাকার স্ত্রী) মা—সকলে এক জায়গায় ব'সে যখন সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করিতে, তখন কোথায় ছিল তোমার জ্যাকেট, সেমিজ, আর কোথায় বা ছিল ঐ জুতো, মোজা! এখানে এসে তোমার রুচি বদ্‌লিয়ে গিয়েছে! এখন বেশ সভ্য-ভব্য দেখাচ্ছে তোমাকে, কাকীমা!"—কাকীমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সেকালের সঙ্গে এ কালের তুলনা দিস্‌নে বাবা। পল্লীগ্রামের সেই সমাজের সঙ্গে এখানকার সমাজের তফাৎ বিস্তর। যে সমাজে মিশ্‌তে হচ্ছে, সেই সমাজের প্রথা, রুচি ও রীতি-নীতি না মান্‌লে কি চলে? তবে বেশভূষার সঙ্গে যাদের মনের গতির

পরিবর্ত্তন হয়, তাদের মনের দুর্ব্বলতার প্রশংসা করতে পারি নে। শিক্ষা ও সংস্কারে মন যদি উঁচু না হয়ে, বৃথা অহঙ্কার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তা হ'লে শিক্ষা, সংস্কার বা সৎসঙ্গের প্রভাব সে মনের দৈন্য ঘুচাতে পারে না, বাবা! যে সব মেয়ে লেখাপড়া শিখে—ধর বি-এ পাশ-টাশ ক'রে মনে ক'রে, 'আমরা এত লেখাপড়া শিখেছি, আমরা হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেল্‌ব? এক রাশ বাসন মাজতে বসব,' লেখাপড়া শিখলেও সে শিক্ষার সাফল্য তারা লাভ করতে পারেনি।" কাকী-মা যাহাই বলুন, সেকালে, সেই প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, কাকীমার বেশভূষার পরিবর্ত্তন আমার অনভ্যস্ত চক্ষুতে একটু বেমানান দেখাইতেছিল। কারণ, যে সমাজে আমি পালিত ও বর্দ্ধিত, সেই সমাজের প্রথার সহিত তাহার সামঞ্জস্য ছিল না। কাকীমাকে আর কোন কথা বলিলাম না বটে, কিন্তু রাজসাহীতে বাসকালে আমার সুরসিক বন্ধু সুকবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের একটি গল্প মনে পড়িল। সেকালে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের মহিলা-সমাজে রুচির যৎসামান্য পরিবর্ত্তন গৃহস্থ বধূদের কিরূপ সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিত, গল্পটিতে তাহারই আভাস ছিল। রজনীবাবু এই প্রসঙ্গেই এক দিন বলিতে ছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ পল্লীর এক যুবক স্বগ্রামের স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পাশ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া কোন কলেজে এল, এ পড়িতেছিল। এল-এ পড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার অভিভাবকরা একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের গৃহস্থের মেয়ে, সভ্যতার সংস্পর্শবিহীন আর এক পল্লীতে আসিয়া, শ্বশুর-গৃহে শাশুড়ী, পিসেস, ননদ প্রভৃতি পাঁচ জনের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। তাহার স্বামী কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত, থিয়েটার দেখিত, বেথুন কলেজের অশ্বযুগলবাহিত লম্বা গাড়ীতে, কানে দুল-পরা, আলুলায়িত-কুন্তলা, সুবেশধারিণী বালিকা ও কিশোরীদের কলেজে যাতায়াত করিতে দেখিত। একালের প্রগতির যুগ তখনও আরম্ভ হয় নাই; তথাপি পথে ঘাটে কোন কোন তরুণীকে সঙ্গিনী সহ অসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিত। দেশের বাড়ীতে সজীব পুঁটলীরূপিণী স্ত্রীটি আধ হাত দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ-চন্দ্র আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার সহিত এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বাকভাবে গুরুজনের আদেশ পালন করিতেছিল, এই দৃশ্য মনশ্চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়া সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিত। নারীদের এইরূপ পল্লীসুলভ জড়তা ও অস্বাভাবিক লজ্জা তাহার হৃদয়কে এই কদর্য্য দেশাচার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল। সে আলোক পাইল।

অবশেষে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পল্লীগ্রামের সেই শিক্ষার্থী পদ্মাপারবর্ত্তী স্বগ্রামে চলিল। তাহার পোর্টম্যাণ্টোতে নবীনা পত্নীর জন্য কত রকম সৌখীন দ্রব্য উপহার লইল, তাহা অপ্রেমিক জনের অনুমান করা অসাধ্য; কিন্তু সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে কানের একজোড়া দুল ছিল। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা, সে আদর করিয়া স্বহস্তে সেই দুল জোড়াটি তাহার আদরিণী পত্নীর উভয় কর্ণে দুলাইয়া দিবে। কিন্তু দুল পরিয়া পল্লীবাসিনী বর্ষীয়সীগণের সম্মুখে বাহির হওয়া পল্লীবধূর কিরূপ নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার পরিচয়, সেই যুবকের তাহা জানা ছিল না। সেই পল্লীর গৃহিণী সমাজ মনে করিতেন, এরূপ নির্লজ্জতা কেবল নর্ত্তকী (নটী)-দেরই শোভা পায়! গৃহস্থ ঘরের ঝি-বৌ দুল পরিয়া বেহায়াপনা প্রকাশ করিবে? ভদ্রঘরের ঝি-বৌর কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? গৃহিণীরা বধূদের সহবতের প্রাত সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

যুবক গভীর রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে পত্নীর দেখা পাওয়ায়, দুলজোড়াটি পরম সমাদরে তাহার কানে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, তরুণী অসম্মত হইয়া তাহাতে বাধা দানের জন্য

যথাসাধ্য চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দুলজোড়াটা তাহাকে পরিতেই হইল। ইহাতে সে এতই লজ্জিত হইল যে, লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারিল না, তাহার দুর্জ্জয় অভিমানও ভঙ্গ হইল না। ছি, ছি ! কি করিয়া প্রভাতে সে গুরুজনকে মুখ দেখাইবে ? অথচ দুল খুলিবারও উপায় নাই ; স্বামী তাহাকে দিব্য দিয়াছেন—স্বেচ্ছায় সে দুল খুলিলে, তাহাকে তাহার স্বামীর মরামুখ দেখিতে হইবে।

প্রত্যূষে স্বামী শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করিলে, তরুণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিল এবং কাহাকেও মুখ দেখাইতে সাহস না হওয়ায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল। নয়নে অশ্রুধারা।

বেলা ক্রমশঃ অধিক হইল, পুরাঙ্গনারা সকলেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলেন, কিন্তু নূতন-বৌ দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল না ; কাহাকেও সাড়াও দিল না। অবশেষে তাহার ননদ—সেই এল, এ পড়া যুবকের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল,—"বৌ, তোমার কেমন আক্কেল ? এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম ! দুয়োর খুলে শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো।"

বিস্তর ডাকাডাকিতে বধূ সাড়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, "আর কি আমার বাইরে যাওনের মুখ আছে ? তোমার ভাই আমার সব্বোনাশ কইরা গেছে ; আমারে নটী সাজাইছে !"

যেকালে গৃহস্থ বধূকে দুল ব্যবহারের জন্য এইরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, সেই কালে ভদ্রমহিলারা সেমিজ-ফ্রকে সজ্জিত হইয়া, জুতা পায়ে দিয়া পাঁচ জনের সম্মুখে বাহির হইলে পল্লীসমাজে তাঁহাদিগকে কিরূপ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, কাকীমার তাহা অজ্ঞাত ছিল না ; সুতরাং এই দুলের গল্পটি সে সময় আমার স্মরণ হইলেও, আমি জিহ্বা সংযত করিলাম।

পরেশ কাকা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরম ভক্ত ছিলেন। কেশব বাবু স্বরচিত বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কুচবিহারে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং প্রত্যাদেশের আরোপ করিয়া এই কার্য্যের সমর্থন করায় অনেকেই তখন কেশববাবুর অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ নববিধান সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেকে কেশববাবুর প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থিত নববিধানী মন্দিরে উপাসনায় বিরত হইয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ-মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"স্বর্গ যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব দাও।"—এই প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থাতেও পরেশ কাকা নির্ভীক সেনানীর ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কেশববাবুর পতাকা বহন করিয়াছিলেন। কেশববাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ কেশববাবুর পুত্র করুণাকুমারের নামের অনুকরণে তিনি তাঁহার পুত্রেরও করুণাকুমার নাম রাখিয়াছিলেন। এই করুণাকুমারই কলিকাতার স্বনামধন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার কে, কে, চ্যাটার্জ্জি। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির পরিচয় দিতে গিয়া আমি মৃৎপ্রদীপের আলোকের সাহায্যে মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল দিবাকরকে দেখাইবার চেষ্টায় হাস্যাস্পদ হইবার ইচ্ছা করি না।

আমি বরোদার পথে বাঁকিপুরে যখন পূজনীয় পরেশবাবুর প্রবাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করি, সে সময় করুণাকুমার যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট। এক দিন তিনি য়ুরোপে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বদেশীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে বরণীয় আসন অধিকার করিবেন, 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং

পুণ্যলক্ষণম।' শাস্ত্রকারের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার গৌরব বর্দ্ধন করিবেন, ইহা কি তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন ? এখন প্রায় সেই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের তাঁহাদের কথা মনে পড়ে—যাঁহারা পরেশবাবুকেও মেহেরপুর হইতে বিদায় করিয়া আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণের অনেকে ডাক্তার করুণাকুমারের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দান করা শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় মনে করেন, এবং তাঁহার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত থাকেন। ভাগ্য-দেবতার বিধান এই রূপ বিচিত্র !

(১৯)

পরিচ্ছদের পারিপাট্যের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের কোনও দিন লক্ষ্য ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদ দূরের কথা, নিত্য ব্যবহার্য্য জুতা জামা কাপড় সম্বন্ধে এরূপ ঔদাসীন্য বিলাত-ফেরতদের মধ্যে আর কাহারও কখন দেখি নাই ; তবে মহাত্মা গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা কোনও সুযোগে একবার বিলাতের মাটী স্পর্শ করেন, তাঁহাদের অনেকেরই বাহ্যাড়ম্বরের চটকে চক্ষু ধাঁধিয়া যায় ! অরবিন্দ বাল্যকাল হইতে বিলাতফেরত পিতা-মাতার গৃহে প্রতিপালিত ; যৌবনকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ইংরাজ সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াও, হিন্দুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি ত্যাগ করেন নাই। ইহা মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়াই মনে হইত। অরবিন্দ স্বদেশীয় মিলের সাধারণ মোটা ধুতিই ব্যবহার করিতেন। জামাও সেইরূপ। তাঁহাকে কোন দিন শিমলা-ফরাসডাঙ্গার সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যে শয্যায় তিনি শয়ন করিতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত, নিতান্ত সাধারণ শয্যা, লৌহ-খট্টাও তদ্রূপ। বরোদায় যাত্রা করিবার সময় তাঁহার সঙ্গে নিত্য-ব্যবহার্য্য সাধারণ ধুতি-জামা ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ ছিল না। সঙ্গে যে কয়েকটি ট্রাঙ্ক ছিল, তাহা নানা ভাষার পুস্তকে পূর্ণ। তাঁহার লট-বহর দেখিয়া মনে হইল, কোনও আত্মসমাহিত ব্রহ্মচারী পারমার্থিক ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাত্রা করিয়াছেন। এই সকল মালপত্রসহ এক দিন প্রভাতে তিনি বোম্বের ভিক্টোরিয়া টারামিনস ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। আমার সঙ্গে যে সামান্য বিছানাপত্র ও পোর্টম্যাণ্টো ছিল, তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গেই বোম্বের একটি বৃহৎ সাহেবী হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই হোটেলের একটি কক্ষে আমরা উভয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর আমরা বোম্বের কোলাবা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, বোম্বে বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া (বি, বি, সি, আই, আর) রেল-পথের একটি ট্রেনে আরোহণ করিলাম। সেই ট্রেনে আমরা বরোদার টিকিট গ্রহণ করিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময় সেই ট্রেন কোলাবা ষ্টেশন ত্যাগ করিল। পরদিন অতি প্রত্যূষে তাহা বরোদা ষ্টেশনে পৌঁছিবার কথা। মনে হইল, আমরা শিয়াশদহ ষ্টেশনে ঢাকা মেলে উঠিয়া গোয়ালন্দ যাত্রা করিলাম। ঢাকা মেলও পরদিন অতি প্রত্যূষে গোয়ালন্দের ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দের দূরত্ব অপেক্ষা বোম্বে হইতে বরোদার দূরত্ব অনেক অধিক ; তথাপি আমাদের ডাক-গাড়ী সারারাত্রি চলিয়া যখন বরোদা ষ্টেশনে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিল, তখন উষালোকে চতুর্দ্দিক উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল মাত্র, সূর্য্যোদয়ের তখনও অনেক বিলম্ব ছিল।

প্রত্যূষে বরোদা ষ্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিতেই এক অভিনব দৃশ্য আমার বিস্ময়াকুল নেত্রে প্রতিফলিত হইল। চতুর্দ্দিকের অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই লোহিতাভ, তাহাদের ঢালু ছাদ লোহিতবর্ণ টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। পথে নানা প্রকার শকট, কিন্তু

অধিকাংশই গো-যান। ঘোড়ার গাড়ীর চাকার মত চাকাগুলি স্প্রিং-এর উপর সংরক্ষিত। অধিকাংশ গাড়ী পাল্কী-গাড়ীর মত আচ্ছাদিত, পশ্চাৎস্থিত দ্বার দিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু গাড়ীর বলদগুলি যেন ঐরাবতের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাহাদের বিশাল শৃঙ্গগুলির অধিকাংশই রৌপ্য ও পিত্তলাদি ধাতুর পাত দ্বারা মণ্ডিত। শ্রেণীবদ্ধ পিতলের ঘণ্টা দ্বারা তাহাদের কণ্ঠ পরিবেষ্টিত।

আমরা প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিতেই এক জন রাজকর্ম্মচারী আমাদের নামধাম, বরোদার ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন। মিঃ ঘোষ গায়কবাড় সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী, কে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে ? তাঁহার বন্ধু লেফটেনাণ্ট মাধব রাও যাদব ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘোষকে সঙ্গে লইয়া নগরে চলিলেন ; আমি অন্য গাড়ীতে তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

মস্তকে প্রকাণ্ড রঙ্গীন পাগড়ী ও কর্ণে কুণ্ডলধারী মারাঠা শকটচালক ফতুয়ায় দেহ আবৃত করিয়া বৃহৎ বলীবর্দ্দ-যুগলবাহিত শকট চালাইয়া, বরোদা নগরের সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া গন্তব্য স্থলে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে দেখিলাম, কোথাও সুরঞ্জিত বস্ত্র-পরিহিতা, যুবতী বালিকা মহারাষ্ট্রীয়া মহিলা শ্রেণীবদ্ধভাবে, সুললিত ভঙ্গীতে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন ; কাছা থাকায় আমার অনভ্যস্ত চক্ষুতে তাঁহাদিগকে পুরুষভাবাপন্ন দেখাইতেছিল। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী রবিবর্ম্মার অঙ্কিত উর্ব্বশী, মেনকা, দ্রৌপদী, সুদেষ্ণা ও শকুন্তলার সুরঞ্জিত চিত্রগুলি মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। কোনও স্থানে সুরঞ্জিত ঘাগরা-ধারিণী স্থূলাঙ্গী গুর্জ্জরীদের দলবদ্ধভাবে জটলা করিতে দেখিলাম। পশ্চিম-ভারতের মহিলা-সমাজের অবগুণ্ঠন বর্জ্জিত বদনমণ্ডল, আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া অসঙ্কোচে পাদচারণ বাঙ্গালী যুবকের চক্ষুতে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করিল। দেখিয়া মনে হইল, বাল্যকাল হইতে তাঁহারা এই স্বাধীনতার সম্মান রক্ষায় অভ্যস্ত হইয়াছেন। প্রকাশ্যপথে তাঁহাদের ব্যবহারে জড়তার চিহ্নমাত্র নাই।

শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু খাসে রাও যাদবের বাসভবন নগরের প্রকাশ্য স্থলে অবস্থিত। লোহিতবর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকা 'ঘোষ সাহেবের' বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি তাঁহার অতিথি, সুতরাং আমাকেও সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অন্য লোক হইলে দুই চারি দিন পরে আমাকে হয় ত' দেখিয়া-শুনিয়া একটা বাসা ঠিক করিয়া লইতে বলিতেন ; কিন্তু সহৃদয় ও মানব-হৃদয়জ্ঞ অরবিন্দ আমার অসুবিধা এবং নবীন প্রবাসীর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমি মারাঠী, গুজরাটী ভাষায় অনভিজ্ঞ ; বঙ্গালীবর্জ্জিত সেই সুদুর প্রবাসে আমি কাহাকেও চিনি না ; কোথায় বাসা পাইব, কি খাইব, সাংসারিক কার্য্যে কাহার সাহায্য গ্রহণ করিব, কিরূপে কাহার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিব, কিছুই জানি না। এই সকল কারণে অরবিন্দ আমাকে ত্যাগ করিলেন না। সেই অট্টালিকায় আমার জন্য স্বতন্ত্র একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। অরবিন্দ তাঁহার সোদর তুল্য স্নেহভাজন বন্ধুর গৃহে বাস করিবেন, হয় ত' তাঁহার সে জন্য কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু আমার অবস্থা স্বতন্ত্র। আমি কোন্ অধিকারে তাঁহার বন্ধুর গৃহে বাস করিব, তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিব ? কিন্তু আমার সঙ্কোচ, কুণ্ঠা নিষ্ফল হইল ; আমি তখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। দেখিলাম, এই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে কোনও প্রকার অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। কোন উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উদার বাঙ্গালী-পরিবারে ও এই মারাঠা-পরিবারে কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে প্রবাসের বেদনা স্থায়ী হইল না।

সমগ্র বরোদা রাজ্যে এই যাদব-পরিবারের ন্যায় গায়কবাড় মহারাজার হিতৈষী সুহৃদ আর কেহ ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই নাই। শুনিয়াছিলাম, মহারাজ আবাল্য নানা বিপদে সঙ্কটে ইঁহাদের প্রাণপণ সেবায় ও সাহায্যে উপকৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের রাজভক্তি পরীক্ষিত, অথচ তাহা মো-সাহেবী নহে। ইঁহারা মহারাজের প্রিয়জন হইলেও তাঁহার প্রসাদলোলুপ ছিলেন না; মানসিক তেজ, স্বাধীনতা ও বিবেকের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া আত্মমর্য্যাদার সহিত রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আমি কোন দিন বরোদায় দেখিতে পাই নাই; শুনিয়াছিলাম, রাজ্যের কোন 'প্রান্তে' তিনি পুলিসের অধ্যক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় খাসে রাও যাদব মহারাজের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি বিলাতের কৃষি-কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, আমাদের দেশের সেকালের 'কালা সিভিলিয়ান' স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন প্রভৃতির ন্যায় বরোদা রাজ্যের 'সিভিল সার্ব্বিসে' প্রবেশ করেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি বরোদা রাজ্যের আম্‌রেনী অথবা কাড়ি 'প্রান্তের' সুবা অর্থাৎ কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের দেশে জেলা বলিতে যাহা বুঝায়, বরোদা রাজ্যে 'প্রান্ত' বলিতে তাহাই বুঝায়। কিছু দিন পরে আমি বরোদায় থাকিতে থাকিতেই তিনি বরোদায় বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং 'সার সুবা' অর্থাৎ 'রেভিনিউ কমিশনরের' পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব রাও যাদব বিলাতের সামরিক কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরোদা রাজ্যের সেনা-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি লেফ্‌টেনাণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অরবিন্দের সমবয়স্ক, এবং তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। অরবিন্দ অত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; কিন্তু লেফটেনাণ্ট মাধব রাওর সহিত যখন তাঁহার গল্প চলিত, তখন সেই গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইত। দুই জনেরই হাসির গর্‌রা উঠিত। অরবিন্দের সেই পরিহাস-রসিকতা, মজলিসী গল্প করিবার অদ্ভুত কৌশল, বাহিরের কোনও লোক কল্পনাও করিতে পারিতেন না; যেন বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে রসের ফল্গু প্রবাহিত হইত! তাহা নির্ম্মল, স্বচ্ছ, উপভোগ্য। আমি যে সময় প্রথম বরোদায় যাই, সে সময় মহারাজের পরলোকগতা প্রথমা মহিষীর পুত্র প্রিন্স ফতে সিং রাও গায়কবাড় ইংলণ্ডের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। তিনিই মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পৈতৃক গদীর উত্তারাধিকারী ছিলেন; কিন্তু সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া নবযৌবনেই তাঁহাকে পরলোকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। সে কালে এরূপ রূপবান্, গুনবান্ রাজপুত্র ভারতের সামন্ত রাজবংশে দুর্লভ ছিল। কিন্তু মহারাজকেও যৌবনে পুত্রশোক পাইতে হইয়াছিল। 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!' —প্রাচীন বয়সেও মহারাজকে অন্য এক পুত্রের অকাল-বিয়োগে শোক পাইতে হইয়াছিল। মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিলে এত দিন প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিতেন। বরোদার মহারাজ সার সয়াজি রাও গায়কবাড় ভারতীয় সামন্ত নরপতি-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। সম্প্রতি তাঁহার ষাট বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ায়, মহারাজের রাজত্বকালের 'হীরক জুবিলী' উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষে এই উৎসব সুসম্পন্ন হইবে। লর্ড নর্থব্রুক যখন ভারতের বড়লাট, সেই সময় মল্‌হর রাও গায়কবাড় সিংহাসনচ্যুত হইলে বর্ত্তমান মহারাজ বরোদার রাজগদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বরোদা রাজ্যে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বরোদা রাজ্য নবভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরোদা সামন্ত নরপতিগণের শাসিত রাজ্যসমূহের আদর্শস্থানীয়। প্রাচীন মারাঠা যুগের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বরোদায় বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। ইহা মহারাজের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফল।

বরোদায় উপস্থিত হইয়া এক জন সঙ্গী সহ নগরদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। যেমন ধূলা, তেমনই মাছি! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথগুলি সঙ্কীর্ণ, ধূলিবহুল ও অপরিচ্ছন্ন। দরিদ্র গুজরাটী পরিবারগুলি অত্যন্ত নোংরা। শুনিলাম, অনেকের পরিহিত বস্ত্রাদি ধৌত করিবার অভ্যাস নাই! পল্লীর বহু গৃহ পরিত্যক্ত দেখিলাম; নির্জ্জন, দরজা তালাবন্ধ। শুনিলাম, প্লেগের ভয়ে পল্লীবাসীরা গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়াছে। সেবার প্লেগ সংক্রামক মূর্ত্তিতে বোম্বে প্রদেশে জনক্ষয় আরম্ভ করিয়াছিল। কোনও পরিবারে প্লেগ দেখা দিলে, রোগীকে 'সিগ্রিগ্রেসন্ ক্যাম্পে' লইয়া যাওয়া হইতেছিল। মাতৃক্রোড় হইতে পুত্র, স্ত্রীর ক্রোড় হইতে রুগ্ন স্বামী বিচ্ছিন্ন হইতেছিল; তাহার পর সব শেষ! এই ব্যবস্থার ফলে বোম্বে প্রদেশে অশান্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরই র‍্যাণ্ড ও লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্টের হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দামোদর ও হরি চাপেকার নামক দুই জন ব্রাহ্মণ যুবক প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-সমাজকে বোম্বে সরকারের প্রসন্নতায় বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

এ সময় কংগ্রেসের শৈশবাবস্থা। কংগ্রেস তখন বাঙ্গালার সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া জীবনশক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, লালমোহন, আনন্দমোহন, কালী বন্দ্যো, উমেশচন্দ্র, যাত্রামোহন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সেবায় তাহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিতেছিলেন। একালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল নেতা কংগ্রেসের মোড়লী-ভাব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের অস্তিত্বও ছিল না। অন্যের কথা দূরে থাক, মহাত্মা গান্ধীর সহিতও তখন কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ ছিল না; তিনি তখন সবেমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; তখনও তিনি 'মহাত্মা' হইতে পারেন নাই, এবং বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেও পরিচিত ছিলেন না। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কলিকাতা-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি যুবক ব্যারিষ্টার। কংগ্রেসের দেহে পরবর্ত্তী যুগে যিনি নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই দেশবন্ধু মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন তখন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারী-ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং ব্যারিষ্টারী অপেক্ষা সাহিত্য-সমাজে তাঁহার কবিত্বেরই খ্যাতি প্রচারিত হইতেছিল। চিত্তরঞ্জন তখন 'মালঞ্চের' কবি।

আনন্দ চার্লু প্রভৃতি কয়েক জন স্বদেশপ্রেমিক মাদ্রাজী তখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন; শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তখন কবিযশঃপ্রার্থিনী, রাজনীতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না। পঞ্জাব তখনও নিদ্রাগত—লালা লাজপত রায়ের ভেরীমন্দ্র তখন পঞ্চনদের কূলে কূলে ধ্বনিত হইয়া, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মাতৃভূমিতে দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ ও মদনমোহন মালব্য তাঁহাদের অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় স্বদেশবাসীর নিদ্রালস নেত্র হইতে তন্দ্রাঘোর অপসারিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং সুদূর বোম্বের সমুদ্রতটে বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরোজী যে স্বদেশী মন্ত্র প্রচারিত করিতেছিলেন, সার ফিরোজ শা মেটা, মহাপ্রাণ গোখলে প্রভৃতি কয়েক জন মনস্বী তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, স্বরাজসাধনায় বৃদ্ধ দাদাভাইকে সাহায্য করিতেছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসকে জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া, তাহাতে শক্তিসঞ্চারের জন্য আকুলকণ্ঠে স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন। মুসলমান-সমাজের অলঙ্কার বদরুদ্দীন তায়েবজি তখনও হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। বিচারপতি রাণাডের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানে

এবং গভীর নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বোম্বে প্রদেশের হিন্দু-সমাজ গভীর নিশীথিনীর অবসানে যেন নবজীবনের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; এবং সকলের উর্দ্ধে দক্ষিণ-ভারতের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডস্বরূপ বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র মহারাষ্ট্র খণ্ডে জাতীয় দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সুবিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্রভূমে ছত্রপতি শিবাজীর অনুসৃত জাতীয়তার অমরবাণী বিঘোষিত করিতেছিল। বস্তুতঃ মহাপ্রাণ বালগঙ্গাধর তিলকই তখন দক্ষিণ-ভারতের অদ্বিতীয় নেতা। দক্ষিণ-ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নামও তখন প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার পরম মিত্র মুসলমান-সমাজের অলঙ্কার আব্বাস তায়েবজি এখন কংগ্রেস-সেবক বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি সুবিখ্যাত বিচারপতি বদরুদ্দীন তায়েবজির ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা, তিনি সেই সময় বরোদার 'বরিষ্ঠ আদালতের' (হাইকোর্টের) অন্যতম বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তিনি যুবক ; কংগ্রেসের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল কি না, কেহ জানিতেন না ; বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

এই সময় তিলকই সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালিত 'কেশরী' তখন দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় পত্রিকা। দক্ষিণ-ভারতের ঘরে ঘরে 'কেশরীর' আদর ছিল। ইহা এক দিকে যেমন স্বদেশী মন্ত্র প্রচারিত করিতেছিল, অন্য দিকে সেইরূপ সনাতন ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময় তিলকের ইঙ্গিতে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত ; এজন্য দক্ষিণ-ভারতের তিলকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবারও লোকের অভাব ছিল না ; কিন্তু তাঁহার স্বদেশসেবার গতিরোধ করা সহজ হয় নাই। এই ব্রহ্মণ্যশক্তির পুনরুত্থানে ও ব্যাপকতায় ইংলণ্ডের কোন কোন চিন্তাশীল 'ভারতহিতৈষীর' মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; তন্মধ্যে সার ভ্যালেণ্টাইন চিরলের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-ভারতের এই ভাবধারার পরিপুষ্টি ও পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য রাজনীতির ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে ; এখানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দক্ষিণ-ভারতে তিলকই কংগ্রেসের প্রধান বান্ধব ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এক দিন সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। এজন্য তিনি সর্ব্বদা কংগ্রেসের সমর্থন করিতেন। এরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানের নানা দোষ-ত্রুটি এখনও আছে, সেকালেও ছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি সাধারণতঃ সে দিকে আকৃষ্ট হইত না ; অনেকে সে সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিতেন।

আমার বরোদা গমনের পূর্ব্বে, অরবিন্দ গায়কবাড় সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর কতকগুলি ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বোম্বে অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজ জানিতেন, অরবিন্দ কবি, তিনি সুনিপুণ অধ্যাপক ; কিন্তু তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধ-হস্ত, 'ইংলিস চ্যানেলের' এধারে তাঁহার ন্যায় ইংরাজী যে অতি অল্প লোকই লিখিতে পারে, এ সংবাদ সে কালের শিক্ষিত সমাজের অতি অল্প লোকেরই বিদিত ছিল। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, আমি কলিকাতায় আসিয়া সাপ্তাহিক 'বসুমতী'তে যোগদানের পর, অরবিন্দ মাতৃভূমির আহ্বানে গায়কবাড় সরকারের সকল বন্ধন, বৈষয়িক উন্নতির সকল প্রলোভন ত্যাগ করিয়া 'বন্দে মারতমে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। তখনই দেশের লোক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। আমাদের দেশের এ কালের অন্যান্য বাঙ্গালী নেতার ন্যায় কংগ্রেসের বিভিন্ন ত্রুটিরও সমর্থন করিবেন,

অরবিন্দের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ, তেজস্বী স্বদেশসেবকের নিকট তাহা আশা করা যায় না। আমার বরোদা-গমনের পূর্ব্বেই অরবিন্দ বোম্বের তৎকাল-প্রচলিত 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালীর কঠোর সমালোচনা করায়, চতুর্দ্দিকে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সুপণ্ডিত তিলক পর্য্যন্ত অরবিন্দের অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেসের প্রতিকূল আলোচনায় বিরত থাকেন ; নতুবা সমগ্র ভারতের এই অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হইবে, সেই ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবে না। অরবিন্দ তিলকের ভক্ত ছিলেন ; তাঁহার অনুরোধে তিনি লেখনী সংবরণ করেন ; কিন্তু তাহার পর যত দিন তিনি বরোদায় ছিলেন, তাঁহাকে কংগ্রেসের সমর্থন করিতে দেখি নাই, বা কংগ্রেসের কোনও অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন নাই। দেশের নেতৃত্ব করিবার উচ্চাভিলাষ কোন দিন তাঁহার ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও কবিতা রচনাই যেন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি আহারাদির পর কয়েক ঘণ্টার জন্য কলেজে যাইতেন, এবং অধ্যাপনা-শেষে বাসায় ফিরিয়া টেবলের ধারে লিখিতে বসিতেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইত। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার তেমন অধিকার না থাকিলেও, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তির অভাব ছিল না, এবং তিনি মূল রামায়ণ-মহাভারতের ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহাকে কোন দিন রামায়ণ-মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে দেখি নাই। তাঁহার বাঙ্গালা পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উপর্য্যুপরি পাঁচ সাত দিন তাঁহাকে কোন বাঙ্গালা পুস্তক স্পর্শ করিতেও দেখিতাম না ; অবশেষে এক এক দিন অপরাহ্নে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস, দীনবন্ধুর কোন নাটক, অথবা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ লইয়া বসিতেন। দুই এক পৃষ্ঠার পাঠ শেষ না হইতেই হয় ত' পুস্তকের সমালোচনা আরম্ভ হইত। আমি তাঁহার সাহিত্যরসজ্ঞতার এবং সাহিত্যসমালোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম। এই ভাবে তাঁহাকে যাহা শিখাইতাম, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিতাম। আমাদের উভয়ের কে শিক্ষক, কে ছাত্র, তাহা স্থির করিতে পারিতাম না। কখন কখন মনে হইত, আমি তাঁহাকে কি কতটুকু শিখাইতেছি ? এবং যদি তাঁহাকে ঐটুকু সাহায্য না করিতাম, তাহা হইলেই বা তাঁহার কি ক্ষতি হইত ? বস্তুতঃ আমি তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলাম না, এবং মাসের অধিকাংশ দিন তাঁহার জন্য আমাকে কিছুই করিতে হইত না। আমরা স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করিতাম।

কলেজের বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্ররা কোন কোন দিন অরবিন্দের কাছে পড়িতে আসিত। তাহারা বলিত, মিঃ ঘোষ সেলী, মিল্‌টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সেক্সপীয়র প্রভৃতি যেমন পড়াইতেন, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কলেজের কোন ইংরাজ অধ্যাপক তেমন চমৎকার পড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের অনুরূপ উক্তি, তিনি যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশের সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত বলিয়া, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে, এবং ছাত্রগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ অরবিন্দের এ দেশে আসিবার অনেক পরে 'ভারতীয় এডুকেশনাল সার্ভিসে' প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যামন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি অরবিন্দের ন্যায় ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, জানি

না। তবে এ কালের বিশ্বপাণ্ডিতগণের মধ্যে যে সকল সাহিত্যের 'ডক্টর' সাহিত্যানুশীলনে নানাভাবে বিদ্যা জাহির করিয়া খ্যতি অর্জ্জন করিতেছেন, অরবিন্দের আজীবনের সাধনালব্ধ জ্ঞানের তুলনায়, তাঁহাদের অনেককে 'হাতুড়ে ডাক্তার' বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু গভীর জ্ঞান-সমুদ্রের তলস্পর্শ করিবার জন্য অনন্যব্রত অরবিন্দের যে কঠোর সাধনা—তাঁহার যে সাধনার পরিচয় পাইয়া রবীন্দ্রনাথ এক দিন শ্রদ্ধাভরে লিখিয়াছিলেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'—সেই সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়াছেন, 'নামকা ওয়াস্তে' আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকী জ্ঞানের পশরাই যাঁহাদের সম্বল, তাঁহারা বিদ্যাদানে অরবিন্দের সমকক্ষ হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

কিন্তু নূতন নূতন ভাষা শিক্ষায় অরবিন্দের উৎসাহের অভাব বা ক্লান্তি ছিল না। তিনি য়ুরোপের প্রধান প্রধান ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও, কার্য্যোপলক্ষে গুর্জ্জরে বাস করিতেছিলেন ও তাঁহাকে মারাঠা জাতির সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল বলিয়া মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, তিনি 'মোরী' ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শুনিয়াছিলাম, ঐ অঞ্চলের দলীলপত্রাদি উক্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই ভাষার সহিত মারাঠী ভাষার কি পার্থক্য, তাহা জানিবার জন্য কোনও দিন আমার আগ্রহ হয় নাই ; কিন্তু এই ভাষার অক্ষরের সহিত দেবনাগরী অক্ষরের সাদৃশ্য ছিল না। বলা বাহুল্য, মারাঠী ভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দেবনাগরী অক্ষরেই লিখিত হইয়া থাকে ; কিন্তু 'মোরী' ভাষায় লিখিত হরফগুলি অন্যপ্রকার। গুজরাটী ভাষার হরফের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহাও কোন দিন জানিবার চেষ্টা করি নাই।

অরবিন্দ যাঁহার নিকট এই শ্রুতিকঠোর, উৎকট ভাষা অসীম ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার নাম—মিঃ ফাড়্‌কে। তাঁহার পূর্ণ নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহার নাম এত কাল পরেও সম্ভবতঃ অরবিন্দের স্মরণ আছে। মিঃ ফাড়্‌কে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ—যাহাকে আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মারাঠী ব্রাহ্মণ বলি। তিনি পরম নিষ্ঠাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; গৌরবর্ণ, খর্ব্বকায়, দোহারা গঠন। সে সময় তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। দাড়িবর্জ্জিত মুখে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় গোঁফ, মস্তকের হ্রস্ব কেশের মধ্যে তরমুজের বোঁটা অপেক্ষা স্থূলতর সুদীর্ঘ টিকির গোছা। মুখ প্রফুল্ল, সদা হাস্যময় ; প্রদীপ্ত নেত্রের দৃষ্টি সরল। সনাতন ধর্ম্মের ও স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি দেওয়ানের আফিসে অর্থাৎ 'বরোদা সেক্রেটেরিয়েটের' কোন-এক বিভাগে চাকরী করিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের কোন সরকারী আফিসের সাধারণ কেরাণী, মুহুরী অপেক্ষা তিনি উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়াই মনে হইত। মারাঠী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্যালোচনায় তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হইত। তিনি নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের' অনুবাদ করিতেছিলেন। অনুবাদকার্য্য তখন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কোন কোন স্থান বুঝিতে না পারিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি সাধু ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তিনি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন, এবং বলিতেন, সাধু ভাষায় রচিত বাঙ্গালা পদগুলি সংস্কৃতমূলক বলিয়া বিশুদ্ধ মারাঠী ভাষার সহিত তাহার সাদৃশ্য এতই অধিক যে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি বলিতেন, 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের' ন্যায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস তিনি অল্পই পাঠ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজার চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকার অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। ছত্রপতি শিবাজীর চরিত্রের আদর্শ, গ্রন্থকারের মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণগুণে কোনও স্থানে ক্ষুন্ন হওয়া দূরের কথা, তাঁহার লেখনীর ইন্দ্রজাল-কৌশলে ছত্রপতির মহান্ চরিত্র অপূর্ব্ব বর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে ! মিঃ ফাড়্কে বঙ্গসাহিত্যের এই যশস্বী লেখককে দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সুখের বিষয়, কিছু দিন পরে তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। পরে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মারাঠী ভাষায়, বিশেষতঃ গুজরাটী ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস অনুবাদিত হইয়াছিল। আমি মিঃ ফাড়্কেকে তাঁহার অনুবাদকার্য্যে সাহায্য করিলে, তিনি দয়া করিয়া আমাকে মারাঠী ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। মারাঠী-ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আমারও একটু আগ্রহ হইয়াছিল। 'প্রথম শিক্ষার' কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, বাঙ্গালার সহিত ইহার অনেক শব্দই সাদৃশ্যমূলক, কিন্তু 'মাজারু' অর্থাৎ (মার্জ্জার) বিড়ালের 'সহনাপণা' অর্থাৎ 'সেয়ানাপণা' বা বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের গল্প পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই আমার উৎসাহস্রোতে ভাটা পড়িল। আমি 'দুত্তোর' বলিয়া মহারাষ্ট্র-ভাষা শিক্ষার কেতাব বন্ধ করিলাম ; কিন্তু অরবিন্দের মকরন্দ-লোলুপ চিত্ত সেই উৎকটভাষার কন্টকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, দিনের পর দিন মহা উৎসাহে গুঞ্জন করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, বাঙ্গালাদেশের সাধারণ লোক ইহাকেই বলে—"সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয় !"

ধর্ম্মাত্মা ফাড়্কের সহিত আমার সাহিত্যালোচনা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সমাজনীতি, স্থানীয় রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা সমান উৎসাহে চলিতে লাগিল। তাহাতে যোগদান করিবেন, অরবিন্দের সেরূপ উৎসাহ বা অবসর ছিল না। আমি ফাড়্কেকে বলিলাম, এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ঘুসিতে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সে-কালের বর্গীরা এ-কালে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে ; নতুবা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে ভাস্কর পণ্ডিতের দল বাঙ্গালা লুঠ করিয়া, কত শত গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। সেই অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করিয়া বাঙ্গালার মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়াইবার সময় এখনও সুর করিয়া বলে, "খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুল, বর্গী এ'ল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?" মনে হইতেছে, ফাড়্কে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ভাস্কর পণ্ডিত চৌথ আদায় করিত, কিন্তু প্রজা নবাবকে 'দামামা' বাজাইয়া সাহায্য করিত না এবং বুলবুল ধান খাইয়া প্রজাকে নিঃস্ব করিত না ; কারণ, বুলবুল শুকজাতীয় পক্ষীর ন্যায় ধান্য ভক্ষণ করে না। তোমার ও-ছড়ার আগাগোড়াই অর্থহীন প্রলাপ ! আমি বলিলাম, বাঙ্গালা ভাষায় তোমার চমৎকার দখল হইয়াছে ; 'খাজনা' ও 'বাজনা' তোমার কাছে অভিন্ন জিনিস ! বুলবুল ধান খায় কি না জানি না, কিন্তু বর্গীর অত্যাচারে প্রজার অসহায় অবস্থার ছবি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। ফাড়্কে সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, তোমাদের শিশু-সাহিত্য হইতে যুবা ও বুড়ার সাহিত্যে কেবল নিদ্রা, চুম্বন, আর 'হেমকুম্ভ জিনি' পয়োধরযুগলের বর্ণনা ! মা ছেলেদের ঘুম পাড়াইতেছে—ঘুম পাড়াইবার ছড়া বলিয়া, স্ত্রী স্বামীকে ঘুম পাড়াইতেছে—স্তনচ্ছায়ায় শয়ন করাইয়া, স্নেহাঞ্চলের বাতাস দিয়া, আর বুড়ো-বুড়ীর ত কথাই নাই। তোমাদের জয়দেবের 'দেহি মে পদপল্লবমুদারং' হইতে বাঙ্গালার কাব্যাকাশের নবোদিত অরুণ রবীন্দ্রনাথের ; "যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস, মম হৃদয়-নীরে" অথবা "বাঞ্ছা ঘোরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে, লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা মুদিত পদ্মের কাছে"—সর্ব্বত্রই এক সুর, এক ভাব ! তোমাদের প্রেমের কবি চণ্ডীদাস বা প্রতিবেশী মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির প্রেমের ঢলাঢলি না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আমি বলিলাম, "ভাল হ'তে মন্দটুকু নিয়ে, বন্ধু, তব বৃথা

এ রোদন ।" প্রেমের কবিতায় বাঙ্গালা সাহিত্য জগজ্জয়ী। তোমাদের মারাঠা সাহিত্য-কাব্য কোন দিন আমাদের জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইতে পারিবে, সে আশা অল্প। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যের সহিত প্রতিযোগিতায় যে স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই স্থান হইতে তাহাকে অপসারিত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জ কেবল কি প্রেমের সুমোহন বেণুর মধুর স্বরেই প্রতিধ্বনিত ? পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি নাই ?

"সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্ত-কোটিভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,
কে বলে মা তুমি অবলে ?"

এ সঙ্গীত বাঙ্গালীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে। 'বন্দে মাতরমে'র ন্যায় জাতীয় সঙ্গীত ভারতের আর কোন্ ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছে ? পাঠকগণের স্মরণে থাকিতে পারে—'কে বলে মা তুমি অবলে ?' এই ছত্রটি পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া লিখিত হইয়াছিল, 'কেন মা অবলা এত বলে ?' কিন্তু ইহাতে মূল সঙ্গীতের গৌরব-হানি হয় নাই। বাঙ্গালার কবি হেমচন্দ্র এক দিন মেঘমন্দ্র স্বরে গাহিয়াছিলেন,—

"যাও সিন্ধু-তীরে ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

ফাড়্কে আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না, তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, সমগ্র ভারত আজ মহামিলন-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে, অসাড় জাতীয় জীবনে প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। তিলক মহারাজা আমাদের জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত। সমগ্র ভারত রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত নবজীবনের বাণী শ্রবণ করিবে। নিশাবসানে সুপ্ত ভারতকে জাগাইবার জন্য তাহা বিহঙ্গ-কণ্ঠের প্রভাতী রাগিণী।

মনে হইতেছে, সে ১৩০২ সালেব কথা। তাহার পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমগ্র ভারত হইতে কোটি কণ্ঠে—নরনারীকণ্ঠে জাগরণের সাড়া পাইয়াছি ; কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্যপথে পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিয়াছি কি ?

(২০)

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যে কয় বৎসর বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে কয়েকবার আমাদিগকে বাসা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল ; তবে প্রথমবার বরোদা-প্রবাসকালে কয়েক সপ্তাহের জন্য আমাকে একটি কক্ষে নির্জ্জন-বাস করিতে হইয়াছিল। মিঃ খাসেরাও যাদবের বরোদার বাড়ীতে তাঁহার পরিবারবর্গ আসিলে আমি স্থানান্তরে বাস করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম। তদনুসারে অরবিন্দ তাঁহার বন্ধু লেফটেনাণ্ট মাধব রাও যাদবের সাহায্যে মহারাজার কলাভবন-সংলগ্ন একটি নির্জ্জন কক্ষে আমার বাসের ব্যবস্থা করিলেন। সেখানে আহারাদির কষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু সেখানে একাকী

থাকিয়া আমি নির্জ্জন কারাবাসের কষ্ট বুঝিতে পারিতাম। বন্ধুহীন অপরিচিত স্থান, একটি নির্জ্জন কক্ষে আমাকে একাকী দিবা-রাত্রি বাস করিতে হইত। কোন কোন দিন অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইয়া রেলষ্টেশন, বাজার প্রভৃতি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। রেল ষ্টেশনে গিয়া কোন কোন দিন দুই একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে দেখিতাম ; মারাঠী, গুজরাটী, পার্শি, ভাটিয়া, মাথায় পাগড়ী কত বিভিন্ন জাতীয় যাত্রী ট্রেন হইতে নামিত, উঠিত ; ট্রেনে বসিয়া সন্ধ্যাসমাগমে এক বৃক্ষে উপবিষ্ট নানা পক্ষীর ন্যায় বিচিত্র ভাষার কলরব করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনও অনাবৃতশির বাঙ্গালী দেখিতে পাইতাম না। সেই সুদূর প্রবাসে আমার কোনও এক জন স্বদেশবাসীকে দেখিবার জন্য প্রাণ আন্‌চান্ করিত ; তাহারা আমার কত আপনার জন, তাহা বুঝিতে পারিতাম। স্বদেশে থাকিতে কোন দিন অনুভব করিতে পারি নাই যে, স্বজাতি আমার এত প্রিয় ; স্বজাতির সহিত মিশিবার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীর মন এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে। মনে হইত, দেশে থাকিতে কত তুচ্ছ কারণে কত আত্মীয়বন্ধু, প্রিয়জনের সহিত বিরোধ হইয়াছে। প্রবাসে নিরবচ্ছিন্ন একক জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে সেই বিরোধেব বেদনা বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দনে যেন সজীব হইয়া উঠিত। তাহার পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; এই জীবন-সন্ধ্যায় প্রবাস-জীবনের সেই স্মৃতি চিত্তপটে অঙ্কিত আছে ; শত শোক-দুঃখের শেলাঘাতেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রথম জীবনের বেদনার স্মৃতি শেষ জীবনেও ভুলিবার নহে।

কিন্তু দীর্ঘকাল আমাকে একাকী এ ভাবে কাল-যাপন করিতে হয় নাই ; কিছু দিন পরে অরবিন্দ একটি মারাঠী পল্লীতে বাসা লইলে পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত একত্র বাসের সুযোগ লইল। এই বাসায় থাকিতে আমি একবার এরূপ কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম যে, আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, সেই সুদূর প্রবাসেই আমার ইহজীবনের অবসান হইবে ; বরোদার শ্মশানেই আমার পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইবে। ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার বাসভবন ; সেখানে আমার যে সকল প্রিয়জন বৎসরান্তে আমাকে দেখিবার আশায় দিনের পর দিন গণিতেছিলেন, আমার আকস্মিক পীড়ার সংবাদ পাইলে তাঁহাদের কেহ যে সেই দূরদেশে গমন করিয়া আমাকে দেখিয়া আসিবেন, পীড়িতের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া পরিচর্য্যা করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না ; সুতরাং তাঁহাদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া কোন লাভ নাই ভাবিয়া অরবিন্দ আমার বাড়ীতে এই সংবাদ প্রেরণ করেন নাই ; বিশেষতঃ, তিনি আমার পরিবারবর্গের কাহাকেও জানিতেন না। কিন্তু আমি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকায় উত্থানশক্তি রহিত হইলেও, অরবিন্দ যে ভাবে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরমাত্মীয়ের নিকটও সেরূপ আশা করা যায় না। অথচ তিনি আমার কে ? তিনি এই নিরাশ্রয়, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, মৃতকল্প স্বদেশীয় যুবককে অনায়াসেই স্থানীয় সরকারী হাসপাতালে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন ; কিন্তু সেইভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয় নাই। আমি যখন প্রবল জ্বরে অচেতন হইয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছি, সেই সময় অরবিন্দ আমার চিকিৎসক বরোদা সরকারের এক জন মিলিটারী ডাক্তারের উপদেশে দিনের পর দিন কি ভাবে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, আমার শয্যাপ্রান্তে কি ভাবে তাঁহার বিনিদ্র বিভাবরী অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা তিনি কোনও দিন কথা প্রসঙ্গেও আমাকে জানিতে দেন নাই। আমি এইমাত্র বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার পরিচর্য্যা ভিন্ন বাঁচিতাম না, দীর্ঘকাল পরে আমার জ্বরত্যাগ হইলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "রায়, এবার তুমি খুব বাঁচিয়া

গিয়াছ। এই 'বরোদা ফিভার' বড় সাংঘাতিক ব্যাধি ; ইহার কবল হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তাই ভাবিয়াছিলাম, এবার বুঝি তোমাকে বাঁচাইতে পারিলাম না"—কিন্তু আমার জীবনরক্ষার জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন, ঘুণাক্ষরেও তাহার উল্লেখ করিলেন না। কি বাক্যে, কি কার্য্যে এরূপ অদ্ভুত সংযম আমি আর কোন ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি কোন দিন তাঁহাকে কাহারও সেব' গ্রহণ করিতে দেখি নাই। শোক-দুঃখেও তিনি কখন অভিভূত হইতেন না। এই বাসা ত্যাগ করিয়া যখন আমরা বরোদা সরকারের অধিকার-সীমাবহির্ভূত 'বরোদা ক্যাম্পে' বাস করিতেছিলাম, সেই সময় এক দিন মধ্যাহ্নকালে একখানি টেলিগ্রাম অরবিন্দের হস্তগত হইল। স্মরণ হইতেছে, অরবিন্দ সেই সময় আহারান্তে সিগারেট-ধূমপান করিতে করিতে টেবলের উপর স্থাপিত একখানি খাতা খুলিয়া, তাঁহার স্বরচিত কবিতায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পাঠ করিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন ; মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রসন্ন মুখ বিবর্ণ হইল, নয়নপল্লব বাষ্পভারাক্রান্ত হইল। তিনি উভয় করতলে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া 'হা ঈশ্বর!' বলিয়া টেবলের উপর ললাট স্থাপন করিলেন।

আমি কিছু দূরে চেয়ারে বসিয়া একখানি নূতন বাঙ্গালা মাসিকের, সাহিত্য, কি ভারতী, স্মরণ নাই—পাতা উল্টাইতেছিলাম। সে সময় 'ভারতবর্ষ' বা 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি বহুজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা মাসিকগুলির অস্তিত্ব তাহাদের প্রকাশকবর্গের কল্পনাতেও স্থান পায় নাই, এবং তাঁহারা তখন শিক্ষাক্ষেত্র হইতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার মত বয়স ও অভিজ্ঞতাও লাভ করিতে পারেন নাই। 'প্রদীপ' তখনও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'প্রবাসী'তে পরিণত হয় নাই।

টেলিগ্রাম পাইয়া অরবিন্দের ঐ প্রকার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি আর কোন দিন কোনও কারণে তাঁহার এইরূপ বিচলিত ভাব লক্ষ্য করি নাই। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অরবিন্দের টেবলের নিকট গিয়া টেলিগ্রামখানির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, টেলিগ্রামের প্রেরক তাঁহার বড় মামা স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু। টেলিগ্রামে তাঁহার পিতৃদেব ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ! অরবিন্দ শৈশবকাল হইতে তাঁহার মাতামহ দেবকে কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না ; তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ের বন্ধন কিরূপ সুদৃঢ় ছিল, তাহাও জানিতাম। অরবিন্দের চরিত্রে তাঁহার সুপবিত্র, উদার চরিত্রের প্রভাব বড় অল্প ছিল না। অরবিন্দ যে বরোদা হইতে বৎসরে একবার বাঙ্গালা দেশে আসিয়া কয়েক মাস দেওঘরে বাস করিতেন, মাতামহের স্নেহের আকর্ষণই তাহার প্রধান কারণ। অনেকেই বোধ হয় জানেন না, অরবিন্দের জননী, চিকিৎসককুলভূষণ ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী রত্নগর্ভা ছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। সেই উন্মাদিনী কন্যা রাজনারায়ণবাবুর স্নেহে যত্নেই জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন। অরবিন্দের গভীর মাতৃভক্তি তাঁহার মুখের কথায় ব্যক্ত হইত না বটে ; তাঁহার দুর্ভাগিনী জননী তাঁহার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা অন্যের বুঝিবার উপায় না থাকিলেও কখন কখন তাঁহার দুই একটি কথায় তাঁহার মনের ভাব পরিস্ফুট হইত। এক দিন তিনি কি একটা কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি পাগল মায়ের পাগল ছেলে, আমার কাজে একটু বাতিকের ছিট থাকিবে না ?"—এইরূপ জননীনর আশ্রয়, পরম স্নেহময়, দেবচরিত্র মাতামহ সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অরবিন্দ হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেন বটে, কিন্তু সেই শোক ও বিহ্বলতা তিনি অল্পসময়ের মধ্যেই পরিহার করিয়া

দৈনন্দিন কার্য্যে যথারীতি মনঃসংযোগ করিলেন। সুগভীর শোকতাপ কোনও দিন তাঁহাকে সাধারণ লোকের ন্যায় বিচলিত ও বিহ্বল করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে অরবিন্দের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম, তাহা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে মহাশোক ও মানসিক সন্তাপের দহন-জ্বালার মধ্যে অবিচল ধৈর্য্য এবং প্রগাঢ় আত্মসংযমের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। আমি অরবিন্দকে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া একাল যাবৎ আরও অনেকে নানাভবে লাভবান হইতে পারেন নাই, এ কথা বলা যায় না। শিক্ষিত সমাজের কেহ কেহ ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে সপ্রমাণ করিতেছেন।

বরোদায় ইংরেজ সরকারের অধিকারভুক্ত বরোদা ক্যাম্পের এলাকায় অরবিন্দ বাংলো ভাড়া লইবার পূর্ব্বে আমরা কিল্লাদারের প্রাসাদ-সংলগ্ন একখানি বাংলোতে বাসা লইয়াছিলাম। তাহা কিল্লাদারের প্রাসাদের হাতার মধ্যে অবস্থিত। কিল্লাদারের সুপ্রশস্ত প্রাসাদের অদূরস্থিত এই বাংলোখানির ছাউনি খাপরেলের : প্রাচীরগুলি মৃত্তিকানির্ম্মিত। খাপরেলগুলি বহু পুরাতন ; জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছিল। এই বাংলোখানির জীর্ণসংস্কারের একান্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ীর মালিকের সে দিকে লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ এক অরবিন্দ ভিন্ন অন্য কোন পদস্থ ভদ্রলোক এই প্রকার জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, এবং আলোক ও বায়ুপ্রবাহের প্রাচুর্য্য-বিরহিত বাংলোয় বাস করিতে সম্মত হইতেন কি না—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বিশেষতঃ, অরবিন্দের পরম বন্ধু লেফটেনান্ট মাধব রাও যাদব কোন্ বিবেচনায় অরবিন্দের বাসের জন্য উহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, আমার তাহা ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। আমরা যে সময় কিল্লাদারের এই ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন কিল্লাদার জীবিত ছিলেন না। শুনিয়াছিলাম, তিনি বর্ত্তমান মহারাজা সার সয়াজি রাও গায়কবাড়ের প্রথমা মহিষীর সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহারাজার প্রথমা মহিষী তখন জীবিত ছিলেন না ; কিন্তু কিল্লাদারের বিধবা পত্নী তখন এই প্রাসাদে বাস করিতেন। কিল্লাদারের প্রাসাদে দুই এক জনের অধিক কর্ম্মচারী ছিল না। তাঁহার একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে ছিল। মেয়েটি কালো হইলেও সুশ্রী, এবং তাহার একটি প্রাচীন অভিভাবককে সর্ব্বদাই আমাদের বাংলোয় আসিতে দেখিতাম। কিল্লাদারের মেয়েটিও অনেক সময় আমাদের বাংলোয় বেড়াইতে আসিত। অরবিন্দের সহিত সে গল্প করিত, আমার সঙ্গেও গল্প করিবার চেষ্টা করিত ; কিন্তু আমি মারাঠী ভাষায় কথা বলিতে পারিতাম না বলিয়া আমাদের গল্প জমিত না। তাহার বৃদ্ধ অভিভাবকটি সর্ব্বদা পূজার্চ্চনা লইয়াই থাকিতেন। লোকটি গম্ভীরপ্রকৃতি, অল্পভাষী। তাঁহার স্বভাব রুক্ষ ছিল বলিয়াই আমার ধারণা।

লেফটেনান্ট মাধব রাও প্রায় প্রত্যহ, হয় সকালে না হয় বিকালে কিল্লাদারের প্রাসাদে আসিতেন, এবং সেখান হইতে আমাদের বাংলোয় আসিয়া অরবিন্দের সহিত গল্প আরম্ভ করিতেন। অরবিন্দ তাঁহার গল্পের সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলেন। পনের আনা কথা লেফটেনান্ট সাহেবই বলিতেন, অধিকাংশ কথাই তাঁহার মাতৃভাষায় বলিতেন, কখন কখন ইংরেজিতেও বলিতেন। অরবিন্দ যে এক আনা কথা বলিতেন, তাহা ইংরেজিতে। দীর্ঘকালে গুজরাটে মারাঠী রাজার রাজ্যে বাস করিয়া এবং মারাঠী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, অরবিন্দ মারাঠীদের মত অনর্গল ভাবে তাঁহাদের ভাষায় আলাপ করিতে পারিতেন না বলিয়াই আমার মনে হইত। লেফটেনান্টজীও বিলেত-ফেরত ; বিলেতের মিলিটারী কলেজ হইতে তিনি পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। এ জন্য অরবিন্দের সহিত তাঁহার ইংরেজিতে

আলাপ ভালই জমিত। তিনি আমাকে 'নভেলিষ্ট' বলিতেন, তাঁহার এই সম্ভাষণে বিদ্রূপের আভাস থাকিত কি না, বুঝিতে পারিতাম না ; তবে তিনি আমার সমবয়স্ক হইলেও আমার সহিত আলাপে যেন তাঁহার একটু মুরুব্বিয়ানা ফুটিয়া উঠিত, যাহাকে 'Patronising tone' বলে, সেইরূপ আর কি! তিনি অরবিন্দের বন্ধু, বিলেত-ফেরত, গায়কবাড়ের ফৌজের লেফটেনাণ্ট, সুতরাং তাঁহার বন্ধুর নিরীহ বাঙ্গালা শিক্ষকের উপর তাঁহার মুরুব্বিগিরি করিবার যথেষ্ট অধিকার ছিল। ইহা যে তাঁহার অহঙ্কারের নিদর্শন, এ কথা বলিতে পারি না ; বিশেষতঃ, তাঁহার উদারতা ও সহৃদয়তার অনেক নিদর্শন ছিল। তবে অরবিন্দের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, কবি ও দার্শনিকের সহিত গোরা মেজাজের 'মিলিটারীর' অকপট বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম। যাহা হউক, মিলিটারীও যে দার্শনিকের পক্ষপাতী এবং ভক্ত হইতে পারে, সে দিন তাহার পরিচয় পাইয়াছি। বর্ত্তমান যুগে ইটালীর মুকুটহীন রাজা—ইটালীয় জাতির অধিনায়ক ও পরিচালক, সেনর মুসোলিনীর মত বড় মিলিটারী য়ুরোপে দ্বিতীয় কেহ নাই! সেই মুসোলিনী রোম নগরে অল্পদিন পূর্ব্বে দর্শন-শাস্ত্রের এক আলোচনা-সভায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি অরবিন্দের রচিত দর্শনসম্বন্ধীয় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা পাঠ করিতেছেন! সুতরাং তিনি শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক তত্ত্বের পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহা কিরূপে অস্বীকার করি? বর্ত্তমান যুগের যে কোন দার্শনিক সেনর মুসোলিনীর এই গুণগ্রাহিতায় গৌরব অনুভব করিতে পারিতেন। তবে শ্রীঅরবিন্দের আসন এখন এই গৌরবের বহু ঊর্দ্ধে বিরাজিত। কিন্তু বাহুবলের সাফল্যেই যাহাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শ, মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা তাহাদের নিকট উপেক্ষিত, আমরা নিত্যই তাহার পরিচয় পাইতেছি, এবং এখানে তাহার একটা দৃষ্টান্তও আমরা প্রদর্শন করিতে পারি।

ভারতীয় নৃত্যকলায় সুদক্ষ সুবিখ্যাত উদয়শঙ্কর যখন সদলে ইটালী গমন করেন, তখন মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গে কোন ইটালিয়ান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, মহত্মা গান্ধী ইটালীতে উপস্থিত হইলে সেনর মুসোলিনী তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। সেনর মুসোলিনী কিরূপ উদারপ্রকৃতি, সদাশয়, ইহাই প্রতিপন্ন করা বোধ হয় সেই ইটালিয়ান ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্যে ছিল। সে কথা শুনিয়া মহাত্মার ভক্ত উদয়শঙ্কর তাঁহাকে বলেন, মহাত্মার সহিত করমর্দ্দন করিয়া মুসোলিনীই ধন্য হইয়াছিলেন, কারণ, যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক মুসোলিনীর জন্ম হইতে পারে, কিন্তু মহাত্মার মত লোক পৃথিবীতে কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে মহাত্মা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা এইরূপ উচ্চ। মহাত্মা বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহাদের এই ধারণা সত্য হইতেও পারে। কিন্তু যে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাধান্যে মহাত্মার প্রতি জগতের বহুসংখ্যক লোকের এই প্রকার মৌখিক সম্মান, জড় বিজ্ঞানের এই প্রাধান্যের যুগে, যে যুগে বাহুবল ও অর্থবলই সম্মানিত এবং যাহা মানব সমাজকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে—সেই যুগে মহাত্মার আধ্যাত্মিক বল কে গ্রাহ্য করিতেছে? তাঁহার উপদেশই বা জড়শক্তির প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া কে গ্রহণযোগ্য মনে করিতেছে? বর্ত্তমান যুদ্ধে মহাত্মা ইটালী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হাবসী জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করিয়াছেন, যে নিরুপদ্রব অসহযোগিতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, হাবসী জাতি কি রণবিজ্ঞানের ও অর্থবলের এই প্রাধান্যের যুগে তাহা গ্রহণ করিতে পারে? তাঁহার এই উপদেশের ফল কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, তাহা কি তাহাদের বুঝিবার শক্তি নাই? আর যে মুসোলিনীর ন্যায় বাহুবলদৃপ্ত

দাম্ভিক মানব দেশে দেশে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, জগতের বহু মনীষী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীকে বাহার সিংহাসনের বহু ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন, সেই মুসোলিনীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে আজ লক্ষ লক্ষ ইটালিয়ান গৃহসুখ—জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, সন্তান-বাৎসল্য ত্যাগ করিয়া আফ্রিকার মরুকান্তারে, গিরিদরীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ধাবিত হইয়াছে! সমগ্র য়ুরোপ আজ মুসোলিনীর রণ-হুঙ্কারে স্তম্ভিত। জাতিসঙ্ঘের নিরপেক্ষ বিধানকে আজ তিনি পদদলিত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। আর মহাত্মা তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির বলে ভারতের মুক্তির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহার কোনটা কি সফল হইয়াছে? তথাপি আমরা মহাত্মার শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিব না; তাঁহার ভ্রান্তিতে ভারতের জাতীয় কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইলেও তিনি আমাদেরই মহাত্মা। য়ুরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকরা তাঁহাকে মহাপুরুষের পদে স্থাপিত করিয়া, জড় শক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎকে পদানত করিয়া রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের উক্তির ও যুক্তির কোন সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। প্রহ্লাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিযোগিতা নিষ্ফল হইত, তাহার কঠোর নির্য্যাতনের কোন প্রতিকার হইত না, যদি ভগবানের ক্রোধ-পাশব শক্তির মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে দাম্ভিক অত্যাচারীর উদর বিদীর্ণ না করিত। যে সাধনায় ভগবানের সেই শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারা যায়, ব্যক্তিবিশেষের উপদেশে কোনও জাতি সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই; সেজন্য প্রহ্লাদের ন্যায় কঠোর আত্মত্যাগের, কুরুসভায় নিখিল বিশ্ববাসীর সম্মুখে অপমানিতা পাঞ্চালির ন্যায় ভগবানে নির্ভরের শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্ষমতাদর্পে ভগবানকে পর্য্যন্ত তাহার সিংহাসন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনার আদর্শ আমরা কোথায় পাইব?

বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে—সেকাল হইতে একালে আসিয়া পড়িয়াছি—এখন ফিরিতে হইবে। বলিতেছিলাম—বরোদার কিল্লাদারের প্রাসাদ-সংলগ্ন সেই পুরাতন জীর্ণ বাংলোর কথা। প্রবল বৃষ্টি হইলে সেই অনিন্দ্যসুন্দর বাংলোর কোন কোন অংশের খাপরেল ভেদ করিয়া ঘরের ভিতর ধারা বর্ষিত হইবার আশঙ্কা ছিল; কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ কোন দিন আমাদিগকে সেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, এবং বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই আমরা সেই বাংলো ত্যাগ করিয়া বরোদা ক্যাম্পের একটি অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

কিল্লাদারের বাংলোর চতুর্দ্দিকে অনেক গাছপালা ছিল। তাহার পাশ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথে নগরে যাওয়া যাইত। আমি সকালে সন্ধ্যায় সেই পথে বিচরণ করিতাম, এবং প্রায় প্রত্যহই দশ এগার বৎসর বয়সের একটি গুজরাটী বালককে সেই পথে স্কুলে যাইতে দেখিতাম; কিন্তু সে একাকী যাইত না, ষোল সতের বৎসর বয়সের একটি তরুণী সেই বালকের পাঠ্যপুস্তকগুলি বহন করিয়া তাহার অনুসরণ করিত। প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল, বালকটি যুবতীর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা; ছোট ভাইটিকে সঙ্গে লইয়া তাহার দিদি স্কুলে পৌঁছাইয়া দিতে যাইত। যুবতীর পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাহাকে সধবা বলিয়াই মনে হইত। যুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হওয়ায় অরবিন্দের ভৃত্য কেষ্টাকে (কিষণ) কি অন্য কাহাকে এত দিন পরে স্মরণ নাই—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, যুবতী সেই বালকটির স্ত্রী। দশ এগার বৎসর বয়সের বালকের সপ্তদশী যুবতী ভার্য্যা! পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, গুর্জ্জরে এরূপ বিবাহ বিরল নহে। এরূপ বিবাহের নৈতিক ফল কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এক দিন মিঃ ফাড়কেকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বাঙ্গালা দেশে ষাট বছরের বুড়ো পঞ্চম

পক্ষে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে দেখিলে যদি তাহাতে বিস্ময়ের কারণ না থাকে, তাহা হইলে এ দেশে সতের বৎসরের যুবতীর এগার বৎসরের স্বামী দেখিয়া বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিবার কি কোনও সঙ্গত কারণ আছে ? যস্মিন্ দেশে যদাচার ; নীতির দিক দিয়া কোন পক্ষই নিরাপদ নহে।"—বলা বাহুল্য, পণ্ডিতজীর এই যুক্তি অমোঘ।

গুর্জ্জর দেশে গ্রীষ্মের প্রকোপ অসহ্য। গ্রীষ্মকালে কিল্লাদারের বাংলোতে বাস করিয়া কিরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছিল, এত কাল পরেও সে কথা স্মরণ আছে। বাংলোখানি শাখাবহুল ও নিবিড়পত্র বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও বাংলোর ভিতর এক বিন্দু বাতাস পাইতাম না। মধ্যাহ্নে রৌদ্রের উত্তাপ এত অসহ্য হইত যে, ভিজা গামছা গায়ে জড়াইয়া বসিয়া থাকিতাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গামছা শুকাইয়া মড়মড় করিত ! কিন্তু অরবিন্দেরর কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা ! তিনি প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া ঈষবগুল-মিশ্রিত এক গ্লাস জল পান করিয়া সারাদিন এমন নিশ্চিন্ত থাকিতেন যে, মধ্যাহ্নেও তিনি গায়ের কাপড় খুলিতেন না ! গ্রীষ্মে তাঁহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইত, ইহা তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম না। কোন দিন তাঁহাকে তালবৃন্ত ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কিন্তু প্রভাতে ঈষবগুল-মিশ্রিত শীতল জল এক গ্লাস পান না করিলে তাঁহার চলিত না। এই সামগ্রী তিনি বারো মাস নিত্য ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রতিদিন রাত্রিতে এক মুঠা ঈষবগুল গ্লাসের জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। আরও দুইটি জিনিস তিনি প্রতিদিন ব্যবহার করিতেন। এক বাক্স ঈজিপ্সিয়ান সিগারেট সর্ব্বক্ষণ তাঁহার টেবলের উপর দেখা যাইত, ঐ জাতীয় সিগারেট ভিন্ন অন্য সিগারেট তিনি ব্যবহার করিতেন না। বরোদার বাজারে তাহার অভাব হইলে বোম্বাই হইতে আনাইয়া লওয়া হইত। স্নানের সময় তিনি "কুটিকুরা" সাবান ভিন্ন অন্য সাবান ব্যবহার করিতেন না। প্রতি মাসেই তিনি কতকগুলি পুস্তকের তালিকা করিতেন ; উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি কত রকমের এবং য়ুরোপের কত ভাষার পুস্তক, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি বোম্বের সুবিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা আত্মারাম রাধাবাই সেগুন্ (ঠিক এই নাম কি না স্মরণ নাই), থ্যাকার কোম্পানী প্রভৃতির দোকানে টাকা ও পুস্তকের তালিকা পাঠাইতেন। রেলপার্শেলে রাশি রাশি পুস্তক আসিত, আর সারামাস ধরিয়া তিনি তাহা পাঠ করিতেন। য়ুরোপীয় মহাকবিগণের সকল মহাকাব্যই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি হোমারের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন ; কিন্তু বলিতেন, জগতে বাল্মীকির তুলনা নাই। বাল্মীকির রামায়ণ জগতেব অতুলনীয় মহাকাব্য। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইংরেজি সাহিত্যে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইয়া বিদ্বজ্জনসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল ; অনেক ইংরেজ সাহিত্যিক তাহার সমালোচনায় মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাও করিয়াছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ রামায়ণ-মহাভারতের যে সকল উপাখ্যান মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইংরেজি কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ তাহার সহিত তুলনার যোগ্য নহে ! অরবিন্দের দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; তিনিও বিলাতে থাকিতে অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অরবিন্দ এক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, সেই সকল কবিতা ওদেশে পাঠক সমাজে সমাদৃত হইলেও ইংরেজি সাহিত্যে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। কিন্তু তাঁহার স্বরচিত কবিতা সম্বন্ধে কোন দিন তাঁহার মতামত শুনিতে পাই নাই। নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে তিনি সর্ব্বদাই কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন। অনেকের ধারণা ছিল, অরবিন্দের ন্যায় ইংরেজিনবীশ ইংলিশ চ্যানালের

এধারে এক আধ জনও দেখিতে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহের বিষয়। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের এক দিনের গল্প মনে পড়িতেছি। অরবিন্দ যখন বাঙ্গালার অগ্নিযুগের 'বন্দে মাতরম্' নামক পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন 'বন্দে মাতরমে' 'জাতীয়তার ধারা' সংক্রান্ত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে—উহা কাহার লেখনী-প্রসূত, এই কথা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। সে-কালের অনেক ইংরেজিনবীশ তরুণের ধারণা হইয়াছিল, উহা অরবিন্দেরই রচনা। ঐ প্রকার গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ আর কোন বাঙ্গালীর কলম দিয়া বাহির হইতে পারে না। অবশেষে কোন শ্রেষ্ঠ ইংরেজি দৈনিকের ইংরেজ সম্পাদক সেই প্রবন্ধের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, উহা অরবিন্দের লেখনী-প্রসূত নহে বলিয়াই তাঁহার ধারণা। ঐ প্রবন্ধে অরবিন্দের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অনুকরণের জন্য চেষ্টার যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও এবং সংবাদপত্রের যে সকল কৃতবিদ্য পাঠক অরবিন্দের রচনার বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহাদেরও উহা অরবিন্দের রচনা বলিয়া ধারণা হইলেও, উহা অরবিন্দের রচনা নহে ; কারণ, অরবিন্দের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে চিরন্তনের সাহিত্যের ধ্বনি—এই প্রবন্ধে তাহারই অভাব। পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারা যায়, পরবর্ত্তী যুগে যে চিন্তাশীল ও মনস্বী লেখক ইংরেজি দৈনিক 'বসুমতী'র সম্পাদকীয়-ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, উহা সেই সুপণ্ডিত স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচনা। বলা বাহুল্য, স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু একালের অনেক নোবেল প্রাইজধারী ভাবাবিদের ন্যায় অরবিন্দ কোন দিন আপনার নাম জাহির করিবার চেষ্টা করিলেন না। সার মনুভাই মেটা এত দিন বরোদা সরকারে অরবিন্দেরই সহযোগী থাকিয়া পরে বরোদার দেওয়ানী পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন ; আর অরবিন্দ বৈষয়িক উন্নতির সকল প্রলোভন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়া আজ পণ্ডিচেরীর আশ্রমে পরম সত্যের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন যোগী। পাগল মায়ের পাগল ছেলে আর কাহাকে বলে ?

(২১)

সে দিন একখানি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে, ইংলণ্ডের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য যে অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার কাহিনী পাঠ করিয়া সভ্যতাভিমানী ক্ষমতামদগর্ব্বিত মানবের রুচি ও প্রবৃত্তি কত দূর কলুষিত হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছিলাম। এ দেশের পাঠক-সমাজের নিকট সংবাদটি হয় ত নূতন নহে, তথাপি আশা করি, এখানে তাহার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় জানেন, নাট্যকার ও বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের নটশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে অনেকে 'বাঙ্গালার গ্যারিক' বলিতেন। এ দেশের কবি, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য য়ুরোপের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নাম ধার করা এক সময় এ দেশে একটা 'ফ্যাসান' হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য আমরা আমাদের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালার স্কট, মাইকেল মধুসূদনকে বাঙ্গালার মিল্টন, রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালার সেলী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতাম। আদিকবি বাল্মীকিকে কেহ ভারতের হোমার বলিয়া কোন দিন পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি না, জানি না। হেমচন্দ্রকে বোধ হয় বাঙ্গালার বায়রন বলা হইত। যাহা হউক, অতীত যুগে গ্যারিক বৃটিশ

রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছিলেন। গ্যারিকের নামানুসারে লণ্ডনে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাহার নাম 'গ্যারিক থিয়েটার'। এই থিয়েটারে একখানি নূতন নাটকের অভিনয় চলিতেছে বা শীঘ্র আরম্ভ হইবে। এই নাটকের নটনটীগণের ভূমিকায় একটি বালক-ভৃত্যের অস্তিত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে। নাটকে এই বালক-ভৃত্যটির নাম ছিল 'হিট্‌লার'। তাহাকে হিট্‌লার নামেই অভিহিত করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। এই নামরহস্যের সংবাদ লণ্ডনস্থিত জার্ম্মানি রাজদূতের কর্ণগোচর হইলে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের ধৃষ্টতায় ক্রোধ সংবরণ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। যে, হার হিটলার আজ জার্ম্মান জাতির অধিনায়ক ও পরিচালক, যে হিটলার নববলদৃপ্ত জাম্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা মুকুটহীন সম্রাট, যে হিটলারের অদৃশ্য শক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জাম্মনীর সর্ব্বপ্রধান বৈরী গ্রেট বৃটেন আজ তাঁহার সখ্যতালাভের জন্য লালায়িত, এবং তাঁহার মনোরঞ্জনের প্রয়াসী, লণ্ডনের একটা থিয়েটারে তুচ্ছ এক নাটকের অভিনয়ের জন্য জাম্মনীর রণদেবতা সেই হিটলারের বিশ্ববন্দিত নামে একটা নগণ্য ভৃত্যকে অভিহিত করা হইল ! জার্ম্মান রাজদূত ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া লর্ড চেম্বারলেনকে অভিনয়ের এই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ (আদেশ ?) করিলেন। লর্ড চেম্বারলেন দূতপ্রবরের দুর্দ্দমনীয় ক্রোধশান্তির জন্য তৎক্ষণাৎ গ্যারিক থিয়েটারের ম্যানেজারকে আদেশ করিলেন—"অবিলম্বে বালক-ভৃত্যের এই নাম বাতিল করহ।" থিয়েটারের ম্যানেজার বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে বিচলিত হইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাই ত ! এখন যে it is too late—অর্থাৎ সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে, এখন হঠাৎ কি করিয়া ঐ নাম খারিজ করা যায় ?" থিয়েটারের সম্ভ্রমের দিকে চাহিয়াই তাঁহাকে একটু আপত্তির সুর বাহির করিতে হইল। কিন্তু থিয়েটারের সম্ভ্রম বেশী, না জাম্মনীর রাষ্ট্রনায়কের নামের কদর বেশী ? এ কি ভারতের শিব যে, ও দেশের সিনেমার পটে তাহাকে বানর করিয়া গড়িয়া তুলিতেও কাহারও কণ্ঠ হইতে তাহার প্রতিবাদে একটি কথাও উচ্চারিত হইবে না ? এ যে জার্ম্মান দূতের আপত্তি—যাহার পশ্চাতে সমগ্র জার্ম্মান জাতির দুর্জ্জয় শক্তি কেন্দ্রীভূত ! লর্ড চেম্বারলেন থিয়েটারের ম্যানেজারের কোনও কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করিলেন না ; পুনর্ব্বার আদেশ হইল—'মুছে ফ্যালো, জলদি !' অগত্যা সেই বালকভৃত্যের নাম পরিবর্ত্তিত করিতে হইল। কিন্তু নূতন নামের ডগায় ইহুদীর একটু গন্ধ থাকায় জার্ম্মান দূতের ইঙ্গিতে সে নামও পরিবর্ত্তিত করিতে হইল। বিপন্ন ম্যানেজার পশ্চিম হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিতেই সে দিকে দেখিলেন, প্রাচ্যের এক বিরাট পুরুষ—মহাত্মা গান্ধী। তখন, "যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে, যথা, কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু-মিলনে", মহাহর্ষে থিয়েটারের ম্যানেজার নাটকের বালক-ভৃত্যের নাম রাখিল, "গান্ধী।"—এই ভাবে মহাত্মা গান্ধীর অপমান করিয়া হার হিট্‌লারের সম্মান রক্ষা করা হইল।

মুসোলিনী ও হিটলার জড় বিজ্ঞানের প্রচণ্ডবলের জীবন্ত প্রতীক। তাঁহাদিগকে খোঁচা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা কঠিন, জড় বিজ্ঞানের উপাসক, ইহ-সর্ব্বস্ব য়ুরোপের কোন্ জাতির তাহা অজ্ঞাত ? কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রাচ্যের আত্মিক বলের যুগাবতার বলিয়া প্রখ্যাত। য়ুরোপ এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে না, অথবা মুখে স্বীকার করিলেও হৃদয়ে তাহার প্রভাব অনুভব করে না। এই জন্যই য়ুরোপের বহু মনীষী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য দার্শনিক শ্রেষ্ঠ রোমা রোলাঁ হইতে মার্কিনের ধর্ম্মনীতি ও মনস্তত্ত্ববিশারদ বিশ্ববিখ্যাত পাদরীরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভজনালয়ের বেদীতে উপবেশন করিয়া 'সারমন' প্রদানকালেও মহাত্মা গান্ধীকে আত্মিক শক্তির আদর্শ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সে দিন বৃদ্ধ জাপানী কবি

নোগুচি ভারতের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ভারত আজ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও, অদূর-ভবিষ্যতে ভারত আধ্যাত্মিকতার আলোকে সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালিত করিবে। এই সকল পণ্ডিত লোকের বচন শুনিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি এবং আশ্বস্তও হই বটে ; কিন্তু জড় শক্তির প্রচণ্ড গুঁতায় আমাদের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া যায়, এবং যখন ঘরে বাহিরে প্রতিপদে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আমাদের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তখন কোন দিকে আমরা আলোকের ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গমাত্রও দেখিতে পাই কি ? আমরা এক দিন আধ্যাত্মিকতার আলোকে ইহসর্ব্বস্ব য়ুরোপ আমেরিকাকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতে পারিব, এই আশায় কত কাল নিগ্রহ ভোগ করিব জানি না, কিন্তু য়ুরোপে আধ্যাত্মিকতার স্থান কোথায়, লণ্ডনের গ্যারিক থিয়েটারের ম্যানেজার তাহা অভ্রান্তরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছে। তথাপি এ কথা সত্য যে, মনুষ্যত্বকে তাহার যোগ্য সম্মানে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না ; আমার বরোদা প্রবাসকালে এক দিনের একটি ঘটনায় তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, এবং ঘটনাটি তুচ্ছ হইলেও, এত কাল পরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাই বলিব।

আশ্বিনের শেষে কি কার্ত্তিকের প্রথমে স্মরণ নাই, তবে সে দিন বিজয়া-দশমীর পরদিন। মহারাষ্ট্রে বা গুর্জ্জরে আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় দশভুজার পূজা হয় না। কিন্তু বিজয়া-দশমীর পর দিন বরোদায় একটি রাজকীয় উৎসবের প্রথা প্রচলিত আছে, উহার নাম "একাদশীর সোয়ারী।" এই উৎসবের সহিত পূজার্চ্চনার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না ; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অথবা শান্তিপুরে রাসের সময় যেমন শোভাযাত্রা বাহির হয়, বিজয়ার পরদিন একাদশীতে বরোদায় সেইরূপ মহাসমারোহে রাজকীয় শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। তবে জনসাধারণের সহিত এই উৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা ইহার দর্শক মাত্র। পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণ বিজয়া-দশমীতে যেমন সসৈন্য দিগবিজয়ে যাত্রা করিতেন, এই উৎসবটি সেই অনুষ্ঠানের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।

সেই দিন বেলা প্রায় বারোটার সময় আমাদের ভাষা-শিক্ষক মিঃ ফাড়কেকে আমাদের বাসায় আসিতে দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দেওয়ান সাহেবের আফিসে অর্থাৎ "বরোদা সেক্রেটেরিয়েটে" চাকরী করিতেন ; এ জন্য মধ্যাহ্নে তিনি কোন দিন আমাদের বাসায় আসিতে পারিতেন না। সে দিন "একাদশীর সোয়ারী" বাহির হইবে বলিয়া বরোদার আফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সমস্তই বন্ধ ছিল। সে রকম ঘটার উৎসব আর নাই শুনিয়া মিঃ ফাড়কের সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি, রাজপথে নগরবাসিগণের কি বিপুল জনতা ! স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গুজরাটী, মারাঠী, পার্শি প্রভৃতি নাগরিকবর্গ উৎসবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া "লক্ষ্মীবিলাস" প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। বঙ্গদেশে বিজয়া-দশমীর দিন অপরাহ্নে প্রতিমার বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য নগর-প্রান্তবর্ত্তী নদীতীরে যেরূপ জনসমাগম হয়, সেই দিন মধ্যাহ্নে বরোদার রাজপথে সেইরূপ দৃশ্য লক্ষিত হইল। সকলেরই হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ। কিন্তু পূজা নাই, বিসর্জ্জন নাই, বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন নাই, তথাপি উৎসব ! কি উৎসব দেখিব, তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।

মিঃ ফাড়্কের সঙ্গে চলিতে চলিতে বরোদার সুবিস্তৃত সাধারণ পুস্তকালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে আমাদের গতিরোধ হইল ; সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, লাইব্রেরী-ভবনের উচ্চ প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম,

শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক সেই স্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ঔৎসুক্যভরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমরাও উভয়ে তাঁহাদের পার্শ্বে একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

শুনিয়াছিলাম, বরোদা সরকারের শক্তি ও সম্পদ এই শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হয় ; ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইলাম। উৎসবের যে সকল দৃশ্য শোভাযাত্রার সময় পর পর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এত কাল পরে তাহা আমার স্মরণ নাই ; এইমাত্র মনে পড়িতেছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে আমাদের সম্মুখ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে দুই ঘণ্টারও অধিক সময় অতীত হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত একখানি সাময়িক পত্রিকায় পৃথিবীর কয়েক জন সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী "মহাজনের" নাম দেখিয়াছিলাম। সেই তালিকায় ফোর্ড, ভাণ্ডারবিল্ড, রথচাইল্ড প্রভৃতি বহু কোটিপতিগণের নামের মধ্যে বরোদার মহারাজা গায়কবাড়ের নামও দেখিতে পাইয়াছিলাম। বরোদাপতি ব্যতীত ভারতে সামন্ত নরপতি আরও অনেকে আছেন, তাঁহাদের অধিকৃত এলাকা ও ঐশ্বর্য্য অল্প নহে ; কিন্তু সেই তালিকায় বরোদার গায়কবাড় ভিন্ন ভারত দূরের কথা, সমগ্র এসিয়ার অন্য কোনও অধিবাসীর নাম দেখিতে পাই নাই! যাঁহারা সেই তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ না জানিয়া, অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এরূপ সন্দেহের কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই সময় শুনিয়াছিলাম, বরোদার রাজভাণ্ডারে হীরা, জহরত, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, মরকত প্রভৃতি নানাবর্ণের ও নানা আকারের বহুমূল্য মণিমুক্তা নির্ম্মিত একখানি আসন আছে, কেবল তাহারই মূল্য চারি কোটি টাকা! অতি বিচিত্র তাহার শিল্পনৈপুণ্য।

"একাদশীর সোয়ারী" উপলক্ষে রাজভাণ্ডারের কোটি কোটি মুদ্রা মূল্যের ঐশ্বর্য্য শোভাযাত্রার সৌষ্ঠব সম্পাদন করে ; কিন্তু আরব্যরজনীর স্বপ্নতুল্য সেই বিরাট আড়ম্বরের পরিচয় যথাযোগ্য বর্ণনা দ্বারা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই। সে কালে, প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, সেকালের কোন বাঙ্গালা মাসিকে 'একাদশীর সোয়ারী' নামক একটি প্রবন্ধে তাহার একটি ক্ষীণ আভাস প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ কালে জৈন উৎসব পরেশনাথের রথ-যাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে শোভাযাত্রার আড়ম্বর অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন ; তাহা বরোদার এই রাজকীয় উৎসবের শতাংশের একাংশ বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। বরোদারাজের প্রাসাদ-সংরক্ষিত শত শত মণ বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত কামান রৌপ্যনির্ম্মিত শকটে, এবং ঐ প্রকার রৌপ্যনির্ম্মিত কামান পিত্তলনির্ম্মিত শকটে পরিচালিত হয়। সে সময় মোটর-শকট আবিষ্কৃত হয় নাই ; কিন্তু বরোদা সরকারের যত প্রকার বিভিন্ন আকারের যত শকট ছিল, তাহা শ্রেণীবদ্ধভাবে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিত। তাহার পর রাজকীয় হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতির শ্রেণী ; বরোদা সরকারের অশ্বারোহী ও পদাতিক সহস্র সহস্র সৈন্য তাহাদের অনুসরণ করিত। বরোদার রাজভাণ্ডারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরাজিও ঐ সঙ্গে প্রদর্শিত হইত।

কিন্তু এই প্রসঙ্গের প্রথমে যে কথায় সূচনা করিয়াছি, এখন তাহারই উল্লেখ করিব। শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত দল সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে, দুই জন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হইয়া তাহা পরিচালিত করিতে দেখিলাম। তাঁহারা উভয়ে তেজস্বী অশ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই যোদ্ধবেশ ; কিন্তু তাঁহাদের আকার-প্রকার ও বয়সের বিভিন্নতা সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট

করিল। এক জন নবীন যুবক, কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্, চোখে মুখে সাহস ও তেজস্বিতা প্রতিফলিত। তাঁহার বাম হস্তে অশ্বের বল্গা, দক্ষিণ হস্তে কোষমুক্ত তরবারি। দেখিয়া মনে হইল, এই যুবক সেনাপতি যেন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র সৈন্যদলকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মানসদৃষ্টিতে অতীত যুগের দুই জন রাজপুত যোদ্ধার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল। তাঁহাদের একজন বাদল, দ্বিতীয় পুত্ত। আমি এই সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘদেহ, ব্যায়ামপুষ্ট, দৃঢ়কায় মারাঠী যুবককে চিনিতাম। তিনি বরোদার বর্ত্তমান গায়কবাড় মহারাজা সার সয়াজী রাও—দেনা খাস্‌খেল সম্‌সের বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স ফতে সিং রাও গায়কবাড়। তিনি ইংলণ্ডের সমর-বিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করেন নাই। এই সময়ের কিছুদিন পরেই তাঁহার জীবন-কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিলে পৈতৃকগদীর উত্তরাধিকারী হইতেন ; কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ। এই প্রকার যোগ্যপুত্রকে হারাইয়া যৌবনকালে মহারাজকে কি শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা যে ভুক্তভোগী, সেই কেবল বুঝিতে পারিবে। মহারাজার দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভজাত অন্যান্য কুমাররা তখন বালকমাত্র। রাজকুমারী ইন্দিরা—পরে যিনি কুচবিহারের মহারাণী হইয়াছিলেন, তিনিও তখন বালিকা।

শোভাযাত্রার অগ্রগামী যুবরাজকে চিনিলাম বটে ; কিন্তু দ্বিতীয় অশ্বারোহীকে চিনিতাম না। পূর্ব্বে কোনও দিন তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হইল না। তিনি বৃদ্ধ ; বয়স অত্যন্ত অধিক হইলেও তিনি বীরপুরুষ, ইহা তাঁহার আকার-প্রকার দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। জরা সেই বয়সেও তাঁহার দেহে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আমি তাঁহাকে না চিনিলেও তিনি যে বরোদা রাজ্যের কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি, ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। তিনি যোগ্য ব্যক্তি না হইলে যুবরাজের পার্শ্বে ঐ প্রকার সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শোভাযাত্রার নেতৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইতেন না।

এই বৃদ্ধ বীরপুরুষের মুখ দাড়িগোঁফ-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহা তেমন অসাধারণ বলিয়া মনে না হইলেও আমি লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার বামপার্শ্বে কোমরবন্ধে তরবারির আবরণ (খাপ) আবদ্ধ থাকিলেও তাহাতে তরবারি ছিল না, এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তেও কোষমুক্ত তরবারি দেখিতে পাইলাম না।—তিনি নিরস্ত্র!

আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। তিনি কে, এই অভিযানে গায়কবাড়ের ফৌজের সকল কর্ম্মচারীই সশস্ত্র ; অথচ এই দীর্ঘদেহ যোদ্ধৃবেশধারী নিরস্ত্র কেন, ইহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ প্রবল হইল। মিঃ ফাড়্‌কে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বিরাট শোভাযাত্রা দেখিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পণ্ডিতজী, ঐ বৃদ্ধ অশ্বারোহী কে? উঁহার কোষে তরবারি নাই, হাতে অস্ত্রও নাই ; অথচ ফৌজের অন্য সকলেই সশস্ত্র। এই বৃদ্ধ অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই, ইহার কারণ কি?"

মিঃ ফাড়্‌কে বলিলেন, "প্রিন্স ফতেসিংজীর পার্শ্বে যাঁহার আসন, তিনি সাধারণ লোক নহেন। কিন্তু উনি হিন্দু কি মুসলমান—অনুমান করিতে পারেন?"

আমি যে কালের কথা বলিতেছি, সে কালে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের প্রায় সকলেরই দাড়ি-গোঁফ থাকিত, উহা তাঁহারা পৌরুষের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন ; সুতরাং অশ্বারোহী বৃদ্ধ 'মিলিটারী' হইয়াও যখন দাড়িগোঁফ-বর্জ্জিত, তখন তিনি মুসলমান হইতেই পারেন না, এইরূপ অনুমান করিয়া মিঃ ফাড়্‌কেকে বলিলাম, "আমার অনুমান, উনি হিন্দু। দাড়িগোঁফবর্জ্জিত ঐ প্রকার বৃদ্ধ মুসলমান এ দেশে আমি দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না।"

ফাড়কে হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু উনি মুসলমান, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় ; অর্থাৎ পথে ঘাটে যে সকল শ্রমজীবী মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর (পাতি ?) নহেন। উনি সাহসী বীর পুরুষ, এবং যৌবনকালে নিবিড় কৃষ্ণ দাড়ি-গোঁফে উঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন থাকিত।"

আমি বলিলাম, "এখন বুড়া হইয়া উঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় পৌরুষের নিদর্শন দাড়ি-গোঁফ বর্জ্জন করিয়াছেন ? কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশেও ঐরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যৌবনকালে যাঁহারা আহারে বসিয়া এক একটি ছাগশিশু দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন, এবং তাহার মুণ্ডটি পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইতেন, বার্দ্ধক্যে দন্তহীন হইয়া তাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, এবং মালপুয়া সার করিয়াছেন। মালসা-ভোগেই এখন তাঁহাদের রুচি।"

ফাড়কে বলিলেন, "উঁহার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না ; উঁহার দাড়ি-গোঁফ বর্জ্জনের একটু ইতিহাস আছে ; কিন্তু সকলে তাহা জানে না। তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত ! উঁহার মৃত্যুর পর উঁহার জীবনের সেই বিচিত্র কাহিনী ইতিহাসে স্থান পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই, মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের এরূপ কত কাহিনী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে।"

আমি সেই বিচিত্র কাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ফাড়কে বলিলেন, পথে দাঁড়াইয়া তাহা বলিবার কথা নহে ; তাহা তিনি সময়ান্তরে বলিবেন।

কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; তাহার পর এক দিন বরোদার ভূতপূর্ব্ব গায়কবাড় গদীচ্যুত মলহর রাওর বিলাসিতার প্রসঙ্গে ফাড়কে বলিয়াছিলেন, মলহর রাওই বহু লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে বরোদার 'লক্ষ্মী-বিলাস' প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। বরোদার ইতিহাস বিখ্যাত সোনার ও রূপার কামানও তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া ধনগর্ব্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের আমোলে বরোদার ইংরেজ রেসিডেন্টকে বিষদানে হত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব গায়কবাড় খাণ্ডে রাওর বিধবা মহিষী যমুনা বাঈ সাহেবা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পাইলে, বর্ত্তমান গায়কবাড় মহারাজা বরোদা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সে কালের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, স্বর্গীয় রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'হীরক চূর্ণ' নাটক বরোদা রাজ্যের এই ঘটনা অবলম্বনে রচিত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে বঙ্গ সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও নাটক রচিত হইয়াছে কি না, তাহা আমার জানা নাই।

মিঃ ফাড়কের নিকট জানিতে পারিলাম, ভূতপূর্ব্ব গায়কবাড় মলহর রাওকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইলে অসহায় মলহর রাও দশদিক অন্ধকার দেখিলেন ; কিন্তু তখনও যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, বরোদা ফৌজের সেনাপতি তাঁহাদের অন্যতম ; তাহার নাম আমার স্মরণ নাই, কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে 'একাদশীর সোয়ারী'র শোভাযাত্রায় যে দীর্ঘদেহ, দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত বৃদ্ধ অশ্বারোহীকে মিছিলের নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছিলাম, শুনিলাম, তিনিই সেই ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি। তিনি না কি মলহর রাওকে বলিয়াছিলেন, রাজার আদেশ পাইলে তিনি সসৈন্য তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ভারত সরকারের আদেশ পালনে তিনি বাধা দান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মলহর রাও এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন নাই। মলহর রাও জানিতেন যে বৃটিশ শক্তি ভারতে সু-প্রতিষ্ঠিত, যাহার সমরনিপুণ

সেনাদল 'মুদ্‌কি মুল্‌তান করি খান্ খান্, শিখগণে দিল দৃঢ় নিগড়,' যাহার প্রচণ্ড প্রতাপে সিপাহী বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, যাহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বরোদার নগর-তোরণে সমাগত হইয়া চক্ষুর নিমেষে বরোদা ধ্বংস করিতে পারে, সেনাপতি মুষ্টিমেয় ফৌজের সাহায্যে তাহাদের কার্য্যে বাধাদান কবিবেন, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন, ইহা যে উন্মত্তের প্রস্তাব, এ বিষয়ে মলহর রাওর সন্দেহ ছিল না। নিজের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য আগুন লইয়া খেলা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নাকি সেনাপতিকে বলিলেন. তাঁহার ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে. নিজের স্বাধীনতা ও সিংহাসন রক্ষার আশায় তিনি অন্য সকলের সর্ব্বনাশ হইতে দিবেন না।

সেনাপতি রাজার নিকট উৎসাহ পাইলেন না. রাজা সেনাপতিকে তাঁহার রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার অনুমতি দিলেন না। সেনাপতিও বুঝিতে পারিলেন, রাজার স্বাধীনতা ও সিংহাসন রক্ষার চেষ্টায় তিনি আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল। তথাপি তাঁহার শেষ চেষ্টা যখন বিফল হইল, মলহর রাও সেনাপতির সহায়তা গ্রহণে অসম্মত হইলেন, তখন সেই মুসলমান সেনাপতি ম্লানমুখে গৃহে ফিরিলেন।

সেনাপতি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। স্নানাহারের কথা বিস্মৃত হইয়া আকাশ-পাতাল কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন ; কিন্তু অতঃপর তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, রাজা তাঁহার কর্ত্তব্যসম্পাদনে বাধাদান করিলেন, ইহার অর্থ তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহার আর কিছুই করিবার ছিল না, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

সেনাপতিকে স্নানাহার ত্যাগ করিয়া কাতরভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধা জননী তাঁহার ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধার ধারণা হইয়াছিল—তাঁহার পুত্র হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছেন। সেনাপতি পুত্রবৎসলা জননীর নিকট রাজার বিপদের বিবরণ প্রকাশ করিলেন। সকল কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "তুই সেনাপতি, তুই রাজার অন্নে প্রতিপালিত, এত কাল ধরিয়া তাঁহার নিমক খাইয়াছিস। রাজার এই বিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া ঘরে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিস, ইহাই কি সেনাপতির কর্ত্তব্য ? রাজা তোকে হাতিয়ার দিয়াছেন, সে কি তোর পোশাকের বাহার খুলিবে বলিয়া ?"

সেনাপতি বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছ ; আমি রাজার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নিজের জীবনের বিনিময়ে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিব না ; রাজাও তাহা জানেন, এই জন্য তিনি আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত। আমি তাঁহার সেনাপতি, বিপদে সম্পদে তাঁহার আদেশপালনই আমার কর্ত্তব্য ! তাঁহার প্রদত্ত ভার যখন তিনি প্রত্যাহার করিলেন, তখন আমি আর কি করিতে পারি ? সেনাপতির কর্ত্তব্য তিনি আমাকে পালন করিতে দিলেন কৈ ? যদি তিনি আমাকে পদচ্যুত করিতেন, তাহা হইলে কি আমি অধিকতর অপমানিত হইতাম ?"

মা বলিলেন, "বিপদে রাজার মাথার ঠিক নাই ; তাই বলিয়া তুই সেনাপতির কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হবি ? আমি জানি, কাপুরুষরা প্রাণভয়ে তোর ঐ যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপদ দেখিয়া, শত্রু বলবান বলিয়া প্রাণভয়ে তুই তোর অকর্ম্মণ্যতার বোঝা রাজার ঘাড়ে চাপাইতেছিস ! বৃথা আমি বুকের রক্ত দিয়া তোকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলাম। আমি জানিতাম না, আমার গর্ভে যাহার জন্ম, সে বিপৎকালে হাতিয়ার ফেলিয়া, প্রাণভয়ে জেনানা-মহলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে।"

সেনাপতি এই তীব্র তিরস্কারে আহত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না। রাজা আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত ; ইহার অর্থ তাঁহার মুষ্টিমেয় ফৌজের শক্তিতে তিনি নির্ভর করিতে পারেন না ; ইহার অর্থ, আমি পদচ্যুত। সৈন্যপরিচালনের অধিকারেই যখন আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখন আমি কিরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিব ? তাঁহার রক্ষার চেষ্টা করিব ? তরবারি ধারণের অধিকার আর আমার নাই, মা !"

মা বলিলেন, "ইহাই যদি সত্য হয়, রাজার নিমক খাইয়া আজ যদি তোর হাতিয়ার ধারণের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ঐ হাতিয়ার ত্যাগ কর, জীবনে আর তাহা স্পর্শ করিস না। আর তোর মোচ-দাড়ি কামাইয়া ফেল। পৌরুষের চিহ্ন দাড়ি-গোঁফ ধারণেও আর তোর অধিকার নাই।"

সেনাপতি সেই দিন দাড়ি-গোঁফ বিসর্জ্জন দিলেন ; তাহার পর আর কেহ কোনও দিন তাঁহার মুখে দাড়ি-গোঁফ দেখিতে পায় নাই। আর কোনও দিন তিনি হাতিয়ার স্পর্শ করেন নাই। তাহার পর নূতন রাজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, রাজকীয় উৎসবে, দরবারে তিনি সম্মানিত হইয়াছেন, বর্ত্তমান রাজসরকারের তিনি অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্য ; কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই ; তিনি তরবারি বা অন্য হাতিয়ার স্পর্শ করেন না।

জানি না, ইহা সত্য অথবা কাল্পনিক কাহিনী। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি সম্ভবতঃ বহু দিন পূর্ব্বে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এত কাল পরে এখনও তাঁহার সেই 'শালপ্রাংশু মহাভুজ দীর্ঘ দেহ', আমার মানসনেত্রে উজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

(২২)

কিল্লাদারের প্রাসাদ-সংলগ্ন খোলার ঘর ত্যাগ করিয়া, আমরা বরোদা-ক্যাম্পের এক দ্বিতল অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আমি যেন নিশ্বাস ফেলিবার একটু অবসর পাইলাম। এই অট্টালিকা খোলা মাঠের ভিতর অবস্থিত ; ইহার পূর্ব্বে ও উত্তরে অনেকগুলি চন্দনতরু ; কিন্তু এ বাড়ীতে আলো ও বাতাসের অভাব ছিল না। মাঠের দ্বিতল বাড়ী, নিকটে কোন গৃহস্থের বাস ছিল না। দূরে দূরে অনুচ্চ স্তম্ভ ; তাহা বৃটিশ ও বরোদা-রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল। অদূরে বৃটিশ সীমার মধ্যে রেসিডেন্সি। রেসিডেন্টের বাস-ভবনের ঊর্দ্ধে সমুচ্চ পতাকা-দণ্ডের শিরোভাগে বৃটিশ পতাকা 'য়ুনিযন জ্যাক' উড়িয়া বৃটিশ-গৌরব ঘোষণা করিতেছিল।

অট্টালিকার নীচের তলায় আমাদের বাস ; দোতলায় মিঃ দেশপাণ্ডে নামক একটি ব্রাহ্মণ যুবক সপরিবারে বাস করিতেন। একখানি নীল শাড়ী কাছা দিয়া পরিয়া, খোঁপায় গোটাকতক ফুল গুঁজিয়া দেশপাণ্ডের স্ত্রী কোন দিন সকালে কোন দিন অপরাহ্নে নীচে বেড়াইতে আসিতেন ; তাঁহাকে দেখিয়া আমি গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। পাছে তিনি আমাদের দেখিয়া সঙ্কোচ অনুভব করেন, এই চিন্তায় আমি সঙ্কুচিত হইতাম ; কিন্তু সেই গম্ভীরপ্রকৃতি, অবগুণ্ঠনহীনা ব্রাহ্মণীর লজ্জাসঙ্কোচ কিছুই ছিল না।

দেশপাণ্ডে বিলাত-ফেরত ; ইংলণ্ডে তিনি কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিন জানিবার চেষ্টা করি নাই ; তবে বরোদা সরকারের তিনি পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং দেওয়ানের আফিসে চাকরী করিতেন। পদগৌরবে তিনি আমাদের দেশের ডেপুটী কালেক্টরদের সমকক্ষ ছিলেন। অবসরকালে তিনি কখনও কখনও অরবিন্দের ঘরে আসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেন। ইংরেজি ভাষাতেই তাঁহাদের আলাপ চলিত, কিন্তু অরবিন্দ

তাঁহার মিলিটারী বন্ধু লেফ্‌টেনাণ্ট মাধবরাও যাদবের সহিত যেরূপ প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন, দেশপাণ্ডের সহিত তাঁহাকে সেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে কোন দিন গল্প করিতে দেখি নাই। এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের গল্পে কবিতা বা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সংক্রান্ত কোনও প্রসঙ্গের স্থান ছিল না ; এ জন্য আমার মনে হইত, ঐ সকল বিষয়ে দেশপাণ্ডের আসক্তি ছিল না। বরোদা কলেজের যে সকল ছাত্র বি· এ· পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এবং ইংরেজি সাহিত্যে অনার পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিত, তাহাদের অনেকে অরবিন্দের বাসায় আসিয়া তাঁহার নিকট সেক্সপীয়ার, মিল্‌টন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিত। তাহাদের পাঠের সময় আমি কোন দিন অরবিন্দের কাছে যাইতাম না। কিন্তু শুনিয়াছি, তাহারা প্রোফেসার ঘোষের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হইত। তাহারা বলিত, তাহারা বহু অধ্যাপকের 'লেকচার' শুনিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ইংরেজ অধ্যাপকও অরবিন্দের মত কাব্য, নাটক পড়াইতে পারিতেন না। কলেজের ছাত্রেরা এই বাঙ্গালী অধ্যাপককে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। কোন কোন দিন সায়ংকালে বরোদা কলেজের কোন কোন অধ্যাপক অরবিন্দর সহিত দেখা করিতে আসিতেন। ঘোষের সহিত সাহিত্যালোচনায় তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতেন। এই সময় কবিবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার ছিল ; তিনি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই শ্রীঅরবিন্দের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত সমাজের বহু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেও এবং অরবিন্দ ছুটীর সময় বাঙ্গালাদেশে আসিয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করিলেও, তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই : কিন্তু অরবিন্দের প্রতিভা গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া মনে হয় না। অরবিন্দের মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বাবু কবিবর রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বড় দাদার বন্ধুর এই প্রতিভাবান ও সুপণ্ডিত দৌহিত্রকে প্রীতির পাত্র মনে করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এক এক সময় আমার মনে হইত, বিধাতার বিধান কি বিচিত্র ! মানুষের জীবনে, চরিত্রে পূর্ব্বজন্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হইত, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এই প্রভাব সুস্পষ্ট। অরবিন্দ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মের সন্তান ; তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের ধার ধারিতেন না ; তিনি সাহেবীয়ানার এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বৃটিশবর্ণ' প্রজার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন,—এই আশায় তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে পত্নী সহ তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বাধীনতার আগার শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রবক্ষে তাঁহার পত্নী সেই কনিষ্ঠপুত্রকে প্রসব করেন ; এই জন্য তিনি তাঁহাকে বারীন্দ্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়বাবু কুচবিহার রাজ্যসরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; সাহেবীয়ানায় তিনিও সেকালের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আদর্শ ছিলেন। অসংখ্য কুসংস্কারের আকর হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। অরবিন্দ ও তাঁহার মেজ দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন আবাল্য ইংলণ্ডে প্রতিপালিত, ইংরেজ সমাজে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত, ইংরেজ নর-নারীর সামাজিক জীবনের এবং এই খৃষ্টান জাতির ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল ; হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ধর্ম্মভীরু, উদারপ্রকৃতি সাধু পুরুষ ছিলেন ; পরিণত বয়সে তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা

ছিল, তাহা সেকালের বৃদ্ধদের অজ্ঞাত নহে। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু সমাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার জামাতা রাখাল বাবুর সম্পাদিত 'প্রচারে' লেখনী ধারণ করিলে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহার উক্তির ও যুক্তির বিরুদ্ধে যে তর্ক-যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের মতের বিরুদ্ধে যুক্তিবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারদের মধ্যে ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ছিলেন, এরূপ একটা জনরবের কথা অভিজ্ঞগণের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু সে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা ; এখন যাঁহারা প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন, এই সকল ব্যাপারের সহিত তাঁহাদেরও পরিচয় নাই।

যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, তাহার খেই হারাইলে চলিবে না। অরবিন্দ অবসরকালে বাঙ্গালায় আসিয়া কখনও কখনও দেওঘর হইতে কলিকাতায় পদার্পণ করিতেন ; কিন্তু এখানেও ব্রাহ্ম পরিবারেই বাস করিতেন। তিনি তাঁহার মেসো রাজনারায়ণ বাবুর অন্য জামাতা 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পরিবারে কিছুদিন কাটাইয়া যাইতেন। শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজের, হিন্দু পরিবারের সহিত অরবিন্দের সংস্রব ছিল না ; তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীও ব্রাহ্ম পরিবারে প্রতিপালিত, এবং বাঁকিপুরে অবস্থানকালেও ব্রাহ্ম সমাজের আবেষ্টনের মধ্যেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ; তথাপি অরবিন্দ মনে প্রাণে হিন্দু ; হিন্দুত্বের মহিমা-পরিপূত উচ্চ আদর্শের প্রতি তিনি সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা কি বিধাতার বিচিত্র বিধান নহে ? তাঁহার জীবনের বিস্ময়াবহ পরিণতি দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুর্লভ হইলেও এরূপ দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরিয়া এদেশে বর্ত্তমান।

অরবিন্দ প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তিলকের ভক্ত। যে যুগে দক্ষিণ-ভারতের শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিয়া, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিল, এবং ইহসর্ব্বস্ব, জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করিয়া হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি ও অনুশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছিল—সেই সময় বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র মহারাষ্ট্র খণ্ডের যুবক সম্প্রদায়কে উপদেশ দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; দক্ষিণ-ভারতে সনাতন সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় ভ্যালেন্‌টাইন চিরলের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তরুণ বাঙ্গালীর অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং নবযুগের বাঙ্গালীরহৃদয়-সিংহাসনে স্বদেশজননীর যে মহিমময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই দেশাত্মবোধ স্বধর্ম্মনিষ্ঠারই রূপান্তর। অরবিন্দ কঠোর সাধনাবলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভার এই বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দনাগীত রচনা করিয়া তাঁহাকে ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কথাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নির্ভরের পরিচয় পাইতাম। যিনি বাগদেবীর সুবর্ণ-ভৃঙ্গার হইতে অমৃতধারা পরিবেষণ করিয়া বাঙ্গালীর সুপ্ত নির্জ্জীব সমাজ-জীবনে অমরত্ব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্ম-জীবন গরুচোরের ও নারীনির্য্যাতকের ঘৃণিত মামলার সাক্ষীর জবানবন্দী ও রায় লিখিয়া নষ্ট করিতে হইয়াছিল, বাঙ্গালীর ইহা অল্প দুর্ভাগ্য নহে।

বরোদা ক্যাম্পে আমাদের বাসায় মধ্যে মধ্যে নূতন অতিথির সমাগম হইত। এক দিন

বোম্বাই হইতে অরবিন্দের একটি পুরাতন বন্ধুর আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম বাবুভাই, এম্ মজুমদার। আমি তাঁহাকে মিঃ মজুমদার বলিতাম। তিনি নাগর ব্রাহ্মণ, বয়স আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক ; অতি সুপুরুষ, এবং এরূপ গৌরবর্ণ যে, হ্যাটকোটে সজ্জিত দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে য়ুরোপীয় বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টার, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, এবং ইংরেজির মত অনর্গল ফরাসী ভাষা বলিতে পারিতেন। তিনি দুই একটা বাঙ্গালা কথাও বলিতে শিখিয়াছিলেন। আমাকে 'নভেলিষ্ট' বলিতেন। এক এক দিন বলিতেন, 'বাবু সাব্, তুমি কোলিকাত্তা যাবেন ?' আমাদের বাসায় থাকিতে থাকিতে মধ্যে মধ্যে তিনি ডুব মারিতেন, কোথায় যাইতেন জানি না. কিন্তু দুই চারি দিন পরে হঠাৎ আসিয়া হ্যাটকোট খুলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িতেন ; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'নভেলিষ্ট. আপনি কেমন আছো ?' তাঁহার হাসি ও গল্পের বিরাম ছিল না। মদে তাঁহার অরুচি ছিল না ; কিন্তু অরবিন্দের ভাণ্ডারে মদ দূরের কথা, একটা বোতলও দেখিতে পাওয়া যাইত না। কাজেই তাঁহাকে দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতে হইত, অরবিন্দের বাক্স বাক্স সিগারেট ধ্বংস করিয়া তিনি আতিথ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। এক এক দিন আমি. অরবিন্দ ও মাধবরাও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইতাম। কিন্তু পথে 'মজুমদার' কাহাকেও কথা কহিতে দিতেন না ; তাঁহার হাসি ও গল্প সমান তোড়ে চলিত ; এক এক দিন সোরাবজীর হোটেলের কাছে আসিয়া আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখা যাইত না। তিনি হোটেলে প্রবেশ করিয়া বোতলের মুখচুম্বনে বিরহানল নির্ব্বাপিত করিতেন। এক দিন 'বিয়ারে' গ্লাস পূর্ণ করিয়া ফেন-মুকুটিত গ্লাসটি আমার সম্মুখে ধরিলেন, আমি বলিলাম, "আমি তো নেশা করি না। ও রসে বঞ্চিত।" মজুমদার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বিয়ারে নেশা ?--তুমি হাসাইলে। বিয়ার গিলিলে স্ত্রীলোকেরও নেশা হয় না আর পুরুষ তুমি, তোমার নেশা হইবে ! মদ না খাইলে নভেলিস্ট হওয়া যায় ?"

অদ্ভুত লোক। তিনি হ্যাট খুলিয়া রাখিলে তাঁহার মাথায় টেরির ও মুড়ায় একটি সূক্ষ্ম শিখা দেখিতে পাইতাম। আবার তাঁহার হরিনামের একটি ঝুলি ছিল। স্নানের পর তিনি লুঙ্গি পরিয়া আহ্নিক করিতে বসিতেন, এবং মালা জপিতেন। তিনি বলিতেন, "পাঁঠা অপেক্ষা মুরগী লঘুপাক, অধিকতর মুখরোচকও বটে, পাঁঠা ছাড়িয়া ডিনারে পক্ষী আমদানী কর।"

বরোদায় তাঁহার শুভাগমনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, 'বরোদা ক্যাম্পে' রেসিডেন্টের নিকট বরোদ সরকার হইতে যে সকল মামলা মকর্দ্দমা প্রেরিত হয়, তিনি সেই সকল মামলা চালাইবার জন্য ব্যারিষ্টারীর উমেদার। বরোদা হাইকোর্টে তখন যে কয় জন জজ ছিলেন, বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দীন তায়েবজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মিঃ আব্বাস্ তায়েবজী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তায়েবজীর ও অন্যান্য জজের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল, কিন্তু তিনি বরোদা হাইকোর্টের কৌন্সিলী হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। অরবিন্দকে তিনি মুরুব্বি ধরিয়াছিলেন ; কিন্তু অরবিন্দ কোন বন্ধু-বান্ধবের জন্য মহারাজার নিকট সুপারিশ করিতে চাহিতেন না। তিনি অরবিন্দকে রাজী করাইতে পারেন নাই। তাঁহার ছেলেটিও তখন ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্যও তিনি সুপারিশ যোগাড় করিতে পারেন নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি বোম্বাই অঞ্চলের কোনও দেশীয় রাজ্যে দেওয়ানী হাকিম হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম, সেই রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এখন তিনি জীবিত আছেন কি না, জানিতে পারি নাই। জীবিত থাকিলে এখন তাঁহার বয়স ৭০ অতিক্রম

করিয়াছে।

বাপুভাই মজুমদার আমাদের বাসায় থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক দিন এক বাঙ্গালী যুবকের আবির্ভাব হইল। যুবকটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর ; দীর্ঘ দেহ, দেহের গঠন-ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, যুবকটি অসাধারণ বলবান, কিন্তু তাঁহার পায়ে জুতা ছিল না, দেহও অনাবৃত ; কাঁধে একখানি চাদর, পরিধানে সরু লাল পেড়ে ধুতি, তাহাও মলিন ; হাতে সুদীর্ঘ ও স্থূল বাঁশের লাঠি। তিনি নাম বলিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাঙ্গালার কোন জেলায় তাঁহার বাড়ী, তাহাও বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তাহা স্মরণ নাই ; তবে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী নহেন, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী, বর্দ্ধমান বা বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কোন এক জেলায় তাঁহার পিতৃগৃহ। বরোদায় আসিয়া তিনি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই ; তিনিও তাহা প্রকাশ করেন নাই। কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল, যুবক বুদ্ধিমান, বাক্‌চতুর এবং আত্মনির্ভরশীল। অরবিন্দ অসাধারণ পণ্ডিত এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব-স্বরূপ, এ কথা বহু স্থানেই শুনিয়াছিলেন ; এ জন্য অরবিন্দকে দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন বলিলেন। তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাহা প্রকাশ করিলেন না। এই শ্রেণীর ভবঘুরেরা কখনো কখনো বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের নিকট অর্থভিক্ষা করিত। অরবিন্দ কাহাকেও রিক্ত-হস্তে বিদায় করিতেন না। কাহারও কাহারও কথা শুনিয়া মনে হইত, ভিক্ষাই তহাদের উপজীবিকা, অরবিন্দের হৃদয় কোমল ও পরদুঃখকাতর বলিয়া তিনি তাহাদের বক্তৃতায় ভুলিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন বটে, কিন্তু বুঝিতাম, তাহারা প্রতারক, তাঁহাকে ভুলাইয়া কিছু লইয়া গেল। বস্তুতঃ তাহারা ঐ প্রকার অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নহে। অরবিন্দকে কখনো কখনো সে কথা বলিয়াছি, তাহা শুনিয়া অরবিন্দ যে ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইতে বুঝিতাম, তাঁহার মনের কথা এই যে, অভাবে না পড়িলে কি কেহ কাহারও নিকট অর্থ প্রার্থনা করে ? ভিক্ষা প্রার্থনায় যথেষ্ট হীনতা প্রকাশিত হয় ; যে ব্যক্তি আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচে এতখানি লঘুতা স্বীকার করে, সে অভাবের কথা, বা দারিদ্র্যের ব্যথা জানাইয়া কিছু অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে দু'টাকা সাহায্য করায় দোষ কি ? সে প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত কি না, ইহা যখন জানিতে পারি না, তখন আমাদের সেই অজ্ঞতার সুযোগ তাহাকেই দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ, দুই দিন পূর্ব্বে যাহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, দুই দিন পরে তাহার অর্থ-কষ্ট দুঃসহ হইতেও পারে। মানুষ অবস্থার দাস, সুতরাং কে সাহায্য লাভের যোগ্য পাত্র, এবং কে অপাত্র, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি ?—অরবিন্দ স্বয়ং এ বিষয়ের ভুক্তভোগী ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সেইরূপ মুক্তহস্তে ব্যয়ও করিতেন, এ জন্য তিনি তাঁহাদের ভবিষ্যতের সম্বল বলিয়া কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই ; তাহার পর সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের দুই ভাই মনোমোহনকে ও তাঁহাকে সেই বিদেশে কি দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাষায় তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ধনীর দুলাল তাঁহারা, কোন দিন যে তাঁহাদিগকে অর্থ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে—ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না ; কিন্তু যাহা কোন দিন কল্পনা করেন নাই, অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল, কষ্টের উপর লাঞ্ছনাও অল্প সহ্য করিতে হয় নাই। সে সময় তাঁহারা অন্যের কৃপাপ্রার্থী হইলে বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না।

মাইকেল মধুসূদনও এক দিন বিদেশে এই ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন ; অর্থ-কষ্টে তাঁহার দুর্গতির সীমা ছিল না। কিন্তু তাহা তাঁহার স্বকৃত ব্যাধি। মধুসূদন কোনও দিন সংযম শিক্ষা

করিতে পারেন নাই ; চিরদিন অন্ধভাবে হৃদয়াবেগেরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন : বিশেষতঃ অর্থব্যয় সম্বন্ধে। তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া ব্যবহারজীবীর পেশায় কোনও দিন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও আইনব্যবসায়ে সেই প্রতিভা বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার অর্থ্যভাগ্যও প্রসন্ন ছিল না ; তথাপি তিনি বলিতেন, ৪৮ হাজার টাকার কমে কোন ভদ্রলোকের বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন ! অথচ সে কালে অর্থের আপেক্ষিক মূল্য কত অধিক ছিল। কিন্তু তিনি বিলাতে ঋণগ্রস্ত হইয়াও মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পৃষ্ঠপোষক লাভ করিয়াছিলেন। এ দেশে আসিয়াও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় পৃষ্ঠপোষকবর্গের সহায়তায় তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই ; তথাপি অমিতব্যয়িতার ফলে দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবিয়োগের পর বিদেশে দারুণ অর্থকষ্টে তাঁহাকে বা তাঁহার দাদাকে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। কিন্তু দুঃখ-কষ্টে তিনি যে সংযম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্বের রক্ষাকবচ হইয়াছিল, এবং সিভিল সার্ব্বিসে বঞ্চিত হইয়াও কোন দিন তাঁহাকে মর্ম্মাহত বা বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। এইরূপ কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অভাবগ্রস্তের দুঃখ-কষ্ট তিনি বুঝিতে পারেতেন। এক দিনের ঘটনার কথা এখনও আমার স্মরণ আছে। সে দিন তিনি মণিঅর্ডার-যোগে তাঁহার মাতা বা ভগিনী, কাহারও নিকট টাকা পাঠাইতেছিলেন ; মণিঅর্ডারের ফরম লেখা হইয়াছে ; সেই সময় আমার মনে হইল, বাড়ীতে আমারও কিছু টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন। আমি তাঁহার নিকট ৫০টি টাকা চাহিলাম। তিনি তাঁহার পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া দেখিলেন, আমাকে ৫০ টাকা দিতে হইলে তহবিলে বিশেষ কিছু থাকে না : অন্য কোন লোক সেই অবস্থায় নিজের মণিঅর্ডার পাঠাইয়া আমাকে মাস-কাবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিতেন, এবং তাহাই স্বাভাবিক ; কিন্তু অরবিন্দ আমাকে টাকাগুলি দিয়া বলিলেন, তোমারই অভাব বোধ হয় অধিক, আমি পরে মণিঅর্ডার করিব, তুমি আজই টাকা পাঠাইয়া দাও। আমি আপত্তি করিলেও তিনি শুনিলেন না। তাঁহার মণিঅর্ডার ফরম পড়িয়া থাকিল। জানি না, এরূপ লোক সংসারে কয় জন আছেন ! 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের নমস্কারের' পাত্র কি কেবল তাঁহার প্রতিভার জন্য ?

অরবিন্দ আর একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার দাদা মনোমোহনের একটি কবি বন্ধু ছিলেন ; তিনি তাঁহার নাম বলিলেও এত দিন পরে ভুলিয়া গিয়াছি ; তাঁহার আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল যে, বাঙ্গালী কবির কথা বলিলে বলা যায়, 'নুণ আনতে পান্তা ফুরায়, পান্তা আনতে নুণ।' জুতা কিনিবার অর্থ জুটিত ত টুপি কিনিবার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। কিছু দিন পরে তাঁহার দাদার সেই কবি বন্ধুটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, সেই নাটক এরূপ উৎরাইয়া গেল যে, ক্রমশঃ লণ্ডনের চারিটি থিয়েটারে সেই সকল নাটক সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া মহাসমারোহে অভিনীত হইতে লাগিল। সেই ইংরেজ কবি বন্ধুটি সেই সময় তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, এত অধিক অর্থ তাঁহার হাতে আসিতেছিল যে, টাকার উপর তিনি গড়াগড়ি দিতেছিলেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত কেবল ও দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, কাহার কখন অর্থাভাব হয়, এবং সে জন্য অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়, তাহা অনুমান করা অসাধ্য ; সুতরাং প্রার্থী দানের যোগ্যপাত্র কি না, তাহাও নিরূপণ করা কঠিন।

কথায় কথায় আলোচ্য প্রসঙ্গ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; এখন যতীন্দ্রনাথের

কাহিনী শেষ করি। যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, তিনি ফৌজে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবেন, ইহাই তাঁহার দীর্ঘকালের সঙ্কল্প ; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাঁহার এই কামনা সফল হইবার আশা না থাকায় তিনি পশ্চিম-ভারতে আসিয়া এই উদ্দেশ্যে বহু দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়াছেন। জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, মেবার, ভূপাল, ইন্দোর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে ফৌজ আছে ; সেই সকল রাজ্যের অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্য-দলে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী বলিয়া কোন রাজ্যের দেশীয় সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি বরোদায় আসিয়াছেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভবনা নাই। তথাপি তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই।

অরবিন্দ তাঁহার এই সাধু সংকল্পের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বরোদার ফৌজেও তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ শুনিয়া অরবিন্দ তাঁহার প্রিয় সুহৃদ লেফটেনান্ট মাধব রাওর সহিত যতীন্দ্রনাথের অনুকূলে কোন আলোচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। অরবিন্দ যতীন্দ্রনাকে আদর করিয়া 'মিলিটারী' যতীন্দ্রনাথ বলিতেন। যরীন্দ্রনাথ কোন কোন দিন আমাদের বাসায় আহার করিতেন ; কিন্তু কোনও দিন সেখানে বাস করেন নাই। কয়েক দিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল, তিনি হতাশ হইয়া হয় ত স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি বলিাছিলেন, শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবেন না, তাঁহার সেই শেষ চেষ্টাটি কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল।

মাসখানেক পরে এক দিন আমাদের বাসায় হঠাৎ 'মিলিটারী' যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ! অরবিন্দও তাঁহাকে দেখিয়া খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত দিন কোথায় ডুব মারিয়া ছিলেন ?' 'মিলিটারী' হাসিয়া বলিলেন, 'মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীরপাতন,' কিন্তু দেহপাত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার 'মন্ত্রের সাধন' হইয়াছে। তিনি বরোদার অশ্বারোহী ফৌজে প্রবেশের চেষ্টা করিযা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি পদাতিক সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি বলিলাম, বরোদার সৈন্যদলেও বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, তবে কিরূপে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল ? তিনি বলিলেন, তাঁহার উপাধির মাথাটুকু ছাঁটিয়া ফেলিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বিশেষতঃ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় অর্দ্ধত্যাগ করাই পণ্ডিতের লক্ষণ ! কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। শেষে শুনিলাম, তিনি 'বন্দ্যোপাধ্যায়ের' 'বন্দ্য'টুকু বাদ দিয়া 'উপাধ্যায়' উপাধিধারী খাঁটি কনোজীয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া বরোদার পদাতিক সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং বন্দুকচালনা, 'প্যারেড' প্রভৃতি কার্য্য উৎসাহের সঙ্গে চলিতেছে। যতীন্দ্রনাথের ফন্দীর পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলেন।

আমি বরোদা ত্যাগ করিবার সময় শুনিয়াছিলাম, যতীন্দ্রনাথ তখনও সৈন্যদলে চাকরী করিতেছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা জানিতে পারি নাই ; কিন্তু এই জীবন-সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ ও মিলিটারী যতীন্দ্রনাথের কথা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন কি না, তাহা তিনিই জানেন। কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দুদিনের জন্য কত লোকের সংস্রবে আসিয়াছি, তাঁহাদের কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সুখের সংসারে যাহাদের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, তাহাদের স্মৃতি আজ স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে ; তথাপি এক এক দিন স্তব্ধ সন্ধ্যায় নিরানন্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষে জীবনের প্রান্তোপনীতের স্মৃতি-পথে দুই এক জনের মুখচ্ছবি ভাসিয়া আসিয়া উদাস-চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে।

আমরা যে সময় বরোদায় ছিলাম, তখন বরোদায় বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। ব্যবসায় ও চাকরী উপলক্ষে সে সময় বোম্বাই নগরে অনেক বাঙ্গালী বাস করিতেন। বোম্বাই হইতে বরোদার দূরত্বও অধিক নহে, বোম্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ ষ্টেশনের অদূরে বি, বি, সি, আই, রেলপথের কোলাবা ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে রাত্রি দশটায় সময় ট্রেনে চাপিলে প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বরোদায় উপস্থিত হইতে পারা যায়; অথচ বোম্বাই হইতে বরোদায় বাঙ্গালীর গতিবিধি ছিল না, এজন্য বরোদায় বাঙ্গালীর অভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতাম। গিরীন্দ্রবাবু নামক এক জন বাঙ্গালী জুয়েলার এই সময় ব্যবসা উপলক্ষে বরোদায় বাস করিতেন। মিঃ ফাড়্কের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি কোন কোন দিন অপরাহ্নে পণ্ডিতজীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার দোকানে যাইতাম। এক দিন দেখিলাম, গিরীন্দ্রবাবুর দোকানে তাঁহার কারিগররা স্বর্ণনির্ম্মিত এক জোড়া ব্রেস্‌লেট হীরকখচিত করিতেছিল। ব্রেসলেটযুগলের শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্যুতিমান হীরকরাশি দ্বারা নির্ম্মিত একটি নাম ব্রেস্‌লেটের ভিতর ঝক্‌মক্ করিতেছিল; তাহার উপর দীপালোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার ঔজ্জ্বল্যে চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছিল। আমি নামটি পাঠ করিলাম—'আমিনা তায়েবজী।' গিরিন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কাহার নাম ?" গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন, "উনি বোম্বে হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দীন তায়েবজীর কন্যা, এবং বরোদা হাইকোর্টের জজ মিঃ আব্বাস্ তায়েবজীর স্ত্রী।" বুঝিলাম, মিঃ আব্বাস তায়েবজী মিঃ বদরুদ্দীন তায়েবজীর কেবল ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার জামাতাও বটেন। মিঃ আব্বাস্ তায়েবজী তখনও স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই, এবং মহাত্মা গান্ধী তখনও দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী, সুতরাং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বরোদার শিক্ষিত সমাজে সে সময় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন পরিচয় পাই নাই। বোম্বাই অঞ্চলের কোনও দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস তখনও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। একালেই বা কোন্ দেশীয় রাজ্য কংগ্রেসকে আমল দিতেছে ? নাভার মহারাজা না কি কংগ্রেসভাবাপন্ন ছিলেন।

এই সময় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষ ইংলণ্ড হইতে বরোদায় আসিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা তাঁহার বয়স কিছু অল্প ছিল। এক দিন অপরাহ্নে—কাহার নিকট শুনিলাম স্মরণ নাই—সংবাদ পাইলাম, বরোদা ক্যাম্পে এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী আসিয়া ডাক-বাংলোতে বাস করিতেছেন—তাঁহার নাম মুলার ঘোষ। নাম শুনিয়া মনে হইল, ভদ্রলোক হয় ত এল্‌ফ্রেড বোসের মত বাঙ্গালী খৃষ্টান, দেশপর্য্যটন উপলক্ষে বরোদায় আসিয়াছেন। তথাপি তিনি আমার স্বদেশবাসী, এজন্য তাঁহাকে দেখিতে আগ্রহ হইল। অরবিন্দ বলিলেন, তিনি যখন বরোদায় আসিয়াছেন, তখন দেখা হইবেই। বস্তুতঃ এই আশা পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের বাসায় অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শুনিলাম, তিনি আমাদেরই মত খাঁটি হিন্দু। এই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিস্ মুলার নাম্নী বিদূষী ইংরেজ-মহিলা এদেশে আসিলে, প্রতিভাবান্ উচ্চাভিলাষী অক্ষয়কুমার তাঁহার স্নেহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে অক্ষয়কুমারকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নিজের নামের সহিত তাঁহার নাম সংযোজিত করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই ইংলণ্ডে তিনি মুলার এ, কে, ঘোষ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মের সহিত এই নামের সংস্রব ছিল না। থিয়োলজি শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত, বিবেচক যুবক খৃষ্টধর্ম্মের প্রলোভনে মুগ্ধ হইবেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল, হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে

বিশ্ববরেণ্য, এবং পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির তাহা অনুসরণের যোগ্য, ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন ; কিন্তু কিছুকাল য়ুরোপে বাস করিয়া তিনি য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন ও প্রতীচ্য সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার খাঁটি মানুষ, তবে তিনি অল্পদিন য়ুরোপে বাস করায় য়ুরোপীয় সভ্যতা তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে না ; শীঘ্রই উহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, অক্ষয়কুমার মিস্ মুলারের স্নেহে যত্নে লণ্ডনে বাস করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন ; ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে ও সাহিত্যেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সিভিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিবেন ; এতদ্ভিন্ন তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মানুষের সকল চেষ্টা সফল হয় না ; কিছুদিন পরে মিস্ মুলারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় অক্ষয়কুমার সেই সুদূর বিদেশে এরূপ অর্থ-সঙ্কটে পড়িলেন যে, ভবিষ্যৎ উন্নতির সকল আশাই ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি পার্শী কুলভূষণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারকে স্বদেশে প্রত্যাগমনোন্মুখ দেখিয়া দাদাভাই নৌরজী তাঁহার অনুকূলে বরোদার বর্ত্তমান মহারাজার নিকট এক সুপারিশ পত্র দিয়াছিলেন। এ সকল কথা পরে শুনিয়াছিলাম। ভিন্নপ্রদেশবাসী সে কালের বৃদ্ধরা একালের বৃদ্ধদের অপেক্ষা বাঙ্গালীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

অক্ষয়কুমার বরোদায় আসিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং মহারাজা যদি কোন চাকরীবাকরী দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন, এই আশায় তিনি অরবিন্দের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; অরবিন্দ তাঁহাকে মহারাজার প্রিয় সুহৃদ এবং বরোদা সরকারের প্রধান কর্ম্মচারিগণের অন্যতম মিঃ খাসেরাও যাদবের সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। খাসেরাও সাহেবও অল্পসময়ের মধ্যেই অক্ষয়কুমারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ; এই নবাগত বাঙ্গালী যুবক সম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল ধারণাই হইয়াছিল। কিন্তু খাসেরাও সাহেবকে বা অরবিন্দকে অক্ষয়কুমারের অনুকূলে মহারাজার নিকট সুপারিশ করিতে হয় নাই। গুণগ্রাহী গায়কবাড় অক্ষয়কুমারের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অবিলম্বেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তবে বিদেশাগত অপরিচিত এক জন বাঙ্গালীকে বরোদা সরকারে বহু সুশিক্ষিত মারাঠা যুবকের আকাঙ্ক্ষিত উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে মহারাজার আগ্রহ দেখিয়া, মহারাজার কোন কোন পদস্থ কর্ম্মচারী অক্ষয়কুমারের প্রতিকূলে কোন কোন কথা বলিলে, খাসেরাও সাহেব না কি অক্ষয়কুমারের সমর্থন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহারাজা এরূপ দৃঢ়চিত্ত এবং নিজের বিচার-বুদ্ধিতে এরূপ নির্ভরশীল যে, তিনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, কাহারও প্রতিবাদে তাঁহাকে সেই পথ হইতে এক তিলও বিচলিত হইতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ মহারাজা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অক্ষয়কুমারকে সিধপুরে অহিফেন বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। সিধপুর গুর্জ্জরের একটি প্রধান তীর্থস্থান ; এবং উক্ত অঞ্চল 'পিতৃগয়া' নামে পরিচিত। এই নগরে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে নাগর ব্রাহ্মণগণের বাস। এই সকল গুজরাটী ব্রাহ্মণের অনেকেই অদূরবর্ত্তী মুসলমান রাজ্যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় মুসলমানরা মাথা গণিয়া যোগ্য হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে উচ্চপদ অধিকার করিতে পারিত না বলিয়া একযোগে মাথা নাড়িয়াছে, বা কোন খাঁ বাহাদুরকে 'ন্যাতা' বানাইয়া তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছে, সে কালে এরূপ ভেদবুদ্ধি গজাইয়া তুলিবার মানুষ সেই সকল রাজ্যে

কেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না ; এজন্য উক্ত অঞ্চলের মুসলমান নরপতিশাসিত রাজ্যে হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারিগণের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকিলেও সাম্প্রদায়িক বিরোধের চিহ্নমাত্র কোথাও লক্ষিত হইত না ; এবং হরিজনবর্গকে খোঁচাইয়া তাহাদের মস্তকে অশান্তির আগুন জ্বালিবার জন্য কাহারও হাতে পতিতোদ্ধারের মশাল না থাকায় তাহারা নিরুপদ্রবে শান্তির সহিত সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছিল। গুর্জ্জরের আমেদাবাদ অঞ্চলে আজ যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহিত হরিজনদের কথায় কথায় লাঠালাঠী আরম্ভ হইতেছে, এবং পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে, উচ্চবর্ণের হিন্দু গৃহস্থের গাই বলদ গোশালায় মরিয়া, পচিয়া ফুলিয়া ঢাক হইতেছে, তাহা ভাগাড়ে ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে না, আবার হরিজনেরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ক্ষেতে খামারে, বেড়ায় বাগানে, মজুরী করিতে না পাইয়া অনাহারে শুকাইয়া কঙ্কালসার হইতেছে, প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে গুর্জ্জরখণ্ডে এরূপ দৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দেশ দিন দিন উন্নতির উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিতেছে—কে ইহা অস্বীকার করিবে ?

অক্ষয়কুমার সিধপুরের অহিফেন কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া বরোদা সরকারের অহিফেন বিভাগের কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই অঞ্চলে বরোদা সরকারের বিস্তর অহিফেন উৎপাদিত হইয়া সিধপুরে গোলাজাত হইয়া থাকে। বরোদা সরকারের ইহা লাভজনক ব্যবসায়গুলির অন্যতম।

আমি যখন বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করি, অক্ষয়কুমার তখনও বরোদা সরকারে চাকরী করিতেছিলেন। তিনি অবসর পাইলেই সিধপুর হইতে বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতাম, এই চাকরীতে তাঁহার আনন্দ বা তৃপ্তি ছিল না। কেবল অর্থোপার্জ্জনই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা এই চাকরীতেই লিপ্ত থাকিতেন। অক্ষয়কুমারও কার্য্যদক্ষতাগুণে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বরোদা সার্ভিসের শাসন-বিভাগের কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মজীবনের সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন।

কিন্তু অরবিন্দের ন্যায় অক্ষয়কুমারেরও দাসত্বের স্পৃহা ছিল না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনের পর শুনিয়াছিলাম, তিনি বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিয়া বরোদা সরকারের চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বিলাতে গিয়া কিছুকাল চেষ্টার ফলে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন আমি বসুমতীর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় অক্ষয়কুমারকে দুই এক দিন স্বর্গীয় সুহৃদ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম ; শুনিয়াছিলাম, তখন তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র সাহিত্যিক তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ও উচ্চসম্মানিত ব্যক্তির সহিত অসঙ্কোচে মিশিবার বা ভাবের আদান-প্রদানের যোগ্য নহে মনে করিয়া, সেই প্রাচীন পরিচয়ের খাতিরে ময়ূরপুচ্ছাবৃত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহসী হন নাই বা সঙ্গত মনে করি নাই ; কারণ, সুরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তাবশতঃ আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আত্মীয়তা করিলেও তাহা যে সম্পূর্ণ আন্তরিক, ইহার বহু পরিচয় পাইয়া ছিলাম ; অধিক কি, আমার দুই কন্যার বিবাহে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আমার মেহেরপুরের পল্লীভবনে পদধূলি দান করিয়াছিলেন। এক দিন আমার কাকা বলিয়াছিলেন, সুরেশবাবুর শিষ্টাচারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারায় প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, সুরেশবাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার সম্মুখে

সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় ধূমপান করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হইবার পর সুরেশবাবু কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন, আমার কাকা তাঁহার পিতৃবন্ধু ও সতীর্থ, উভয়ে একত্র কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কাকাকে গুরুজনের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে চুরুট স্পর্শ করেন নাই। কাকা বলিয়াছিলেন, এ কালের ছেলেদের নিকট তিনি কখনও সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নাই। সুতরাং আমি সুরেশবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলেও, তাঁহার কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে আমি সর্ব্বদা এড়াইয়া চলিতাম। কারণ, জানিতাম, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত সৌজন্যের সহিত আলাপ করিলেও, তাহা মৌখিক শিষ্টাচার মাত্র ; তাঁহারা মনে মনে আমাদের অবজ্ঞা করেন। এই জন্য তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য কখনো আগ্রহ বা প্রবৃত্তি হয় নাই। পরে কখনো কখনো সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব নিজেকে তফাৎ রাখিয়াই চলিয়াছি। কলিকাতায় আমি দীর্ঘকাল বাস করিলেও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ ব্যারিষ্টার সে কালের বরোদাপ্রবাসী মিঃ এ কে ঘোষের সহিত অধিকবার আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমাদের বরোদা ক্যাম্পের বাসায় এক দিন প্রভাতে এক সুবেশধারী সাহেব লোকের আবির্ভাব হইল ; তিনি ইটালীয়ান কি ফরাসী, চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আমাদেরই মত বাঙ্গালী। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম, তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত শশিকুমার হেস। তিনি য়ুরোপ হইতে 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সকল পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেশে থাকিতে তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতাম, সুতরাং তাঁহার নাম আমার অপরিচিত ছিল না। তিনি য়ুরোপ হইতে ভারতে ফিরিয়াছেন, তাহা জানিতাম না, এ জন্য তাঁহাকে বরোদায় দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

একালের তরুণরা শশিকুমারবাবুকে হয় ত চিনিবেন না ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে তিনি সুদক্ষ শিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিহাস অতি বিচিত্র। প্রথম-যৌবনে তিনি ময়মনসিংহ জেলার কোন পল্লীর বাঙ্গালা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ময়মনসিংহের স্বর্গীয় মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে তিনি য়ুরোপে গমন করেন, এবং বিভিন্ন দেশে শিক্ষা লাভ করিয়া এই সময় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি স্বদেশে আসিবার সময় সার জর্জ্জ বার্ডউডের নিকট হইতে মহারাজ গায়কবাড়ের নামে এক সুপারিশ চিঠি আনিয়াছিলেন ; সেই পত্রানুসারে মহারাজা তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া বরোদার 'গেষ্ট হাউসে' তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বরোদার 'গেষ্ট হাউস'কে বঙ্গ ভাষায় 'অতিথিশালা' বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় তাহার অসম্মান করা হইবে। বাঙ্গালা দেশে অতিথিশালা বলিলে গ্রাম্য জমিদারদের গৃহ-বিগ্রহের মন্দিরের অদূরবর্ত্তী ঝাঁপের বেড়াবিশিষ্ট, বাতায়নবিহীন, অনুচ্চ কুটীর শ্রেণীর কথাই আমাদের মনে পড়ে, গৃহস্থের গো-শালা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা উন্নত নহে ; সম্প্রতি বাঙ্গালার জমিদারদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় এই গ্রাম্য অতিথিশালাগুলিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। বরোদা সরকারের 'গেষ্ট হাউস'কে অতিথিশালা বলিলে তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। বরোদা নগরের এক প্রান্তে এই রাজ অতিথিশালা সংস্থাপিত। উদ্যান-পরিবেষ্টিত এই সুরম্য হর্ম্ম্য আমাদের দেশের কোন ধনাঢ্য ও বিলাসী জমীদারের বিলাসিতাপূর্ণ প্রমোদভবন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। 'গেষ্ট হাউস'

য়ুরোপীয়ের রুচির অনুসরণে য়ুরোপীয় প্রথায় সজ্জিত। ইহার ড্রয়িং-রুম, বিভিন্ন শয়ন-কক্ষ, খাবুর্চিখানা, আস্তাবল প্রভৃতি দেখিলে মনে হয়, কোন য়ুরোপীয়ের সুরুচিসম্পন্ন বাসভবনে প্রবেশ করিয়াছি। পরিদর্শকের জিম্বায় নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় এখানে সঞ্চিত থাকে। এখানে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করিয়াও একত্র বাস করিতে পারেন। তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট গাড়ীঘোড়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, এবং সুবেশধারী কোচম্যান, সহিস তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। বোম্বাই, শিমলা, কলিকাতা (ভারতের রাজধানী তখন কলিকাতায় ছিল) প্রভৃতি স্থান হইতে নানা কার্য্যোপলক্ষে যে সকল য়ুরোপীয় অতিথি বরোদায় যাইতেন, তাঁহারা এই গেষ্ট হাউসেই বাস করিতেন। সম্ভ্রান্ত দেশীয় অতিথিরাও এখানে স্থান পাইতেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরোদার দেওয়ানী পদ গ্রহণের পূর্ব্বে একবার বরোদায় গমন করিয়া মহাবাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গেষ্ট হাউসেই বাস করিতেন। শ্রীযুত শশিকুমার হেস মহাশয় বরোদায় উপস্থিত হইলে মহারাজার আদেশে গেষ্ট হাউসেই বাস করিতেছিলেন। সে সময় সেখানে অন্য কোন অতিথি ছিলেন না।

অরবিন্দের সহিত শশিকুমারের পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের নাম জানিতেন। শশিকুমারের পিতা সেকেলে গোঁড়া হিন্দু হইলেও, শশিকুমার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন; এবং তিনি অরবিন্দের মেসো শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ছিলেন। এজন্য প্রথম পরিচয়ের পর তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। এক জন কবি, আর এক জন চিত্রশিল্পী; কিন্তু উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! আমি বলিলাম, "আপনাদের উভয়ের মধ্যে বয়সে কে বড়, বুঝিতে পারিতেছি না।" শশিকুমার অরবিন্দকে বলিলেন, "আপনি অনুমান করিতে পারেন, আমার বয়স কত? দয়া করিয়া আমাকে বুড়োর দলে ফেলিবেন না।" শুনিলাম, তাঁহার বয়স তখন ত্রিশ অতিক্রম করে নাই। অরবিন্দ পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, শশিকুমারের চেহারা অনেকটা ইটালীয়ানের চেহারার অনুরূপ এবং চিত্রশিল্পীর আকৃতিগত বিশেষত্ব তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট। শশিকুমারের জীবনযাপনের প্রণালীর পরিচয় পাইয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। আমি অরবিন্দকে আমার ধারণার কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে বিলাসী; তাঁহাদের কেহই অবস্থানুযায়ী অল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।" পরবর্ত্তী কালে শশিকুমারের জীবনযাপনের প্রণালীতেও অরবিন্দের এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

শশিকুমার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব অধিক ছিল। ফরাসী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় ফরাসী ভাষার ন্যায় অনর্গল আলাপ করিতে পারিতেন না; অরবিন্দের সহিত ইংরেজি ভাষায় আলাপ করিবার সময় তাঁহার অনেক কথা বাধিয়া যাইতেছিল; এবং উচ্চারণেরও ত্রুটি ছিল। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল—চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি কিছু দিন ইংলণ্ডে বাস করিলেও ইংরেজি সাহিত্যের অনুশীলনে তাঁহার আগ্রহ ছিল না; ইংরেজের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজনীতিসংক্রান্ত অভিমতেও ফরাসী রাজনীতিকরাই তাঁহার গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু অরবিন্দ কোন দিন তাঁহার সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন না। রাজনীতিক্ষেত্রে ফরাসী জাতি কিরূপ উদার, তাহাদের সাম্যনীতি কিরূপ প্রশংসাযোগ্য

ইত্যাদি কত কথারই তিনি আলোচনা করিতেন। অরবিন্দ সহিষ্ণু শ্রোতার ন্যায় তাঁহার সকল কথা শুনিতেন, কিন্তু মতামত প্রকাশ করিতেন না। তবে শশিকুমার ফরাসী কাব্য উপন্যাস সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিতেন, অরবিন্দ তাহার সমর্থন করিতেন। শশিকুমার সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর যেরূপ প্রশংসা করিতেন, তাঁহার মুখে কোন দিন কোন ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাই নাই।

শশিকুমার মহারাজার সম্মানিত অতিথিরূপে বরোদার গেষ্ট হাউসে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বরোদা সরকারের চিত্রবিভাগ-সংক্রান্ত কোন্ কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইবে, তাহা স্থির না হওয়ায় তাঁহার অবসরের অভাব ছিল না। এজন্য তিনি গেষ্ট হাউসের এক সুদৃশ্য ব্রুহামে চাপিয়া কোন দিন সকালে, কোন দিন অপরাহ্ণে বরোদা ক্যাম্পে আসিতেন। সে সময় মোটর-গাড়ী ভারতে আমদানী না হওয়ায় সম্ভ্রান্ত-সমাজে জুড়ি-গাড়ীই ব্যবহৃত হইত। কেবল সে কাল কেন, এ কালেও প্রধান প্রধান রাজকীয় উৎসবে মূল্যবান মোটর-গাড়ীর পরিবর্ত্তে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ীই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে দিনও ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো বোম্বাই হইতে স্পেশাল ট্রেনে ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, ঘোড়ার গাড়ীতেই ষ্টেশন হইতে প্রাসাদে যাত্রা করিয়াছিলেন বহু অশ্ব-পরিচালিত, সুসজ্জিত ও আড়ম্বরপূর্ণ ঘোড়ার গাড়ীর সহিত যে সমারোহ ও সম্ভ্রমের ভাব বিজড়িত, বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের 'রোল্‌স রয়েস্' সিডান-কারে তাহা নাই।

শশিকুমার কোন কোন দিন অপরাহ্ণে আমাদের বাসায় আসিয়া অরবিন্দকে এবং আমাকে তাঁহার সঙ্গে কিছু কাল বেড়াইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। আমার মত সমান্য লোককে তিনি তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য কি জন্য অনুরোধ করিতেন, তাহা বুঝিতে পারিতাম না ; কিন্তু কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে এরূপ করিতেন বলিয়াও মনে হইত না। আমি বঙ্গ-সাহিত্যের নগণ্য সেবক হইলেও তিনিও সাহিত্যসেবা করিতেন, এবং আমার রচনার পক্ষপাতী ছিলেন, এই জন্য তাঁহার অনুরোধ মৌখিক শিষ্টাচারমাত্র বলিয়া মনে হইত না ; তাঁহার অনুরোধে আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া আমি তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম না। তিনি আমাদের উভয়কে সম্মানের আসনে বসাইয়া স্বয়ং বিপরীত দিকে বসিতেন। অরবিন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরের বারান্দায় দীর্ঘকাল পাদচারণ করিতেন ; ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্যায়াম ছিল। যে দিন আমরা শশিকুমারের সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতাম, সে দিন অরবিন্দ বারান্দার পাদচারণে বিরত থাকিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া শশিকুমার রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে অনর্গল কত কথার আলোচনা করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অরবিন্দ সহিষ্ণুভাবে সকল কথা শুনিয়া যাইতেন, তিনি কদাচিৎ দুই একটি কথা বলিতেন ; কিন্তু মতের অমিল হইলে শশিকুমার কোন দিন অরবিন্দের সহিত তর্ক করিয়া নিজের অভিমতের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। তিনি অরবিন্দের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। অরবিন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রেল-ষ্টেশন, ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা গেষ্ট হাউসে উপস্থিত হইতাম। মহারাজার অতিথি সেখানে অতিথিসৎকারের যে ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতার ও গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইত। ভোজন-টেবলে নির্দ্দোষ পানীয় ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ের বোতলের আবির্ভাব হইত না। শশিকুমার সুরা স্পর্শ করিতেন না ; কিন্তু গেষ্ট হাউসে নানা প্রকার বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য সুরার অভাব ছিল না। শশিকুমার সে পথের পথিক হইলে সুরার 'জলছত্র' বসাইতে পারিতেন। আমার মনে হইত, সেই সময় আমাদের দলে বাপুভাই

মজুমদার থাকিলে তিনি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া বোতলের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন।

তৈল-চিত্রাঙ্কনে শশিকুমার কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহার কোন পরিচয় পাই নাই ; তবে যিনি প্যারিস, মিউনিক, ভিনিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান সাধকের সেই সাধনা ব্যর্থ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, এক দিন তিনি লণ্ডনস্থ তাঁহার 'ষ্টুডিও' প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। কথায় কথায় এক দিন তিনি বলিলেন, লণ্ডনের ষ্টুডিওতে তিনি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের (কিংবা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের, এত দিন পরে ঠিক স্মরণ হইতেছে না) একখানি পূর্ণাকৃতি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া এরূপ স্থানে রাখিয়াছিলেন যে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথমে সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত! তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় না হইলেও সেই কক্ষে আলো অন্ধকারের খেলা চলিতেছিল, আলো-অন্ধকারের সেই মিলনক্ষণে চিত্রার্পিত মূর্ত্তি চিনিতে পারা যাইতেছিল! সেই সময় শুভ্র দাড়ি-গোঁফ, শুভ্র কেশ, পারসীশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী বেড়াইতে বেড়াইতে শশিকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ চিত্রকর ষ্টুডিয়োতে আছেন শুনিয়া, তিনি ষ্টুডিয়োতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে দত্ত উপবিষ্ট! বৃদ্ধের ক্ষীণ দৃষ্টির পক্ষে ছায়া ও কায়ার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইল, তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দত্ত, আপনি এ অসময়ে এখানে?"—শশিকুমার তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, তাঁহার তুলি আর কখনও এরূপ উচ্চ প্রশংসালাভ করিতে পারিবে না।

শশিকুমারের এই গল্প শুনিয়া আমি তাঁহাকে স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে অনুরূপ একটি গল্প বলিয়াছিলাম। গল্পটি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিকট কি অন্য কাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে এক দিন 'নীলদর্পণের' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় নীলকর সাহেবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ-কালের অনেকেই বোধ হয় জানেন না, অর্দ্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে 'সাহেব' নামেই পরিচিত ছিলেন, এবং যখন তিনি সাহেবী পোশাকে কোন য়ুরোপীয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেন, তখন তাঁহার অভিনয় এরূপ নিখুঁত হইত যে, কি কণ্ঠস্বরে, কি অভিনয়-কলায় দর্শকগণকে মুগ্ধ হইতে হইত। বরোদা হইতে ফিরিয়া 'ষ্টার রঙ্গমঞ্চে' আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' সম্পাদক হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ, শশিকুমার হেস প্রভৃতি কয়েক জন সম্মানিত বন্ধুর সহিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রসিদ্ধ নাটক প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিত গিয়াছিলাম। অর্দ্ধেন্দুবাবু সে-দিন পর্ত্তুগীজ দস্যু রডার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূমিকাটি ক্ষুদ্র, রডার বক্তব্য অধিক ছিল না ; কিন্তু অভিনয়ভঙ্গীতে তিনি আমাদের সকলের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং নীলদর্পণে নীলকর সাহেবের ভূমিকায় তিনি কিরূপ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, না দেখিলেও তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সেই ইতর নীলকর যখন কৃষক-কন্যা অসহায়া গর্ভবতী ক্ষেত্রমণিকে কবলে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, দর্শকগণ তখন স্তম্ভিত-হৃদয়ে মুস্তফী মহাশয়ের সেই অভিনয়-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিতেছিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া সেই নারীনির্য্যাতক

নীলকরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সর্ব্বজন-বন্দনীয় চটিজুতা ষ্টেজের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মুস্তফী মহাশয় তাঁহার অভিনয়-সাফল্যের এই নিদর্শনে উৎফুল্ল হইয়া, সেই চটি শিরোধার্য্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয়-সাফল্যের এরূপ প্রশংসা তিনি জীবনে কখনও লাভ করেন নাই।

শশিকুমার অতঃপর অরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি অরবিন্দের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিবেন, এজন্য তাঁহাকে দুই তিন বার 'সিটিং' দিতে হইবে। অরবিন্দ তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে অরবিন্দ 'গেষ্ট হাউসে' আসিয়া দুই তিন দিন শশিকুমারের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ে শশিকুমার সেই চিত্রখানি শেষ করিয়াছিলেন, এবং তুলির দুই এক টানে অরবিন্দের মুখের প্রসন্ন ভাবটি এরূপ চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, কোন সাধারণ চিত্রশিল্পীর তুলিকায় তাহা অসাধ্য। শশিকুমারের আন্তরিক শ্রদ্ধার সেই উপহার অতীত স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপ অরবিন্দ পরবর্ত্তী কালে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন কি কাহাকেও তাহা দান করিয়াছিলেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। বরোদা ত্যাগকালে তিনি তাহা দেশে লইয়া আসিয়া থাকিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্তরা সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়াছেন।

শশিকুমারের সহিত আমি দুই এক দিন বরোদার 'লক্ষ্মীবিলাস' প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। মলহর রাও গায়কবাড় বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মলহর রাও গায়কবাড় বহু অর্থব্যয়ে বহু মণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা এক জোড়া সোনার ও এক জোড়া রূপার কামান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ইংরেজ পর্য্যটক তাহা দেখিয়া মলহর রাওর চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন, মলহর রাও বিকৃতমস্তিষ্ক ও অপব্যয়ী ছিলেন ; কিন্তু এই হতভাগ্য সিংহাসনচ্যুত নরপতির সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং শিল্পকলার আদর্শ কিরূপ প্রশংসনীয় ছিল, তাহা লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের শিল্প-নৈপুণ্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজ লেখকরা নিরপেক্ষভাবে তাঁহাকে চিত্রিত করিবেন—ইহা আশা করিতে পারা যায় না।

লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের একটি সুপ্রশস্ত হলঘরে সুবিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মার অঙ্কিত কতগুলি বৃহৎ চিত্র আছে। শুনিয়াছিলাম, রবিবর্ম্মা বরোদায় আসিয়া কিছুদিনের জন্য গায়কবাড়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মহারাজার অভিপ্রায় অনুসারে লক্ষ মুদ্রা পারিশ্রমিকে ঐ সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল চিত্রের প্রতিলিপি বাজারে বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না। দুইখানি চিত্রের কথা এখনও আমার মনে আছে। একখানি চিত্রের বিষয় কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতেছিল ; ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীররা সভায় অধোমুখে উপবিষ্ট, ভীম রাজকুল-বধূর অপমান দর্শনে নিরুপায় হইয়া ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিলেন ; গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নিষ্ক্রিয়। আর অপমানশঙ্কাকুলা অসহায়া দ্রৌপদী আতঙ্ক-বিস্ফারিত নলিন নেত্র উর্দ্ধে তুলিয়া করজোড়ে অগতির গতি অনাথের নাথ পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। দ্রৌপদীর মুখে, চোখে, অর্দ্ধাবৃত দেহের প্রতি অঙ্গে তাঁহার ভয়, ক্রোধ, অভিমান এবং অন্তর্বেদনা চিত্রকরের তুলিতে কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে! বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যজীবনে গ্রাম্য বারোয়ারীতলায় নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা স্বর্গীয় মতি রায়ের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের' পালায় যে গানটি শুনিয়াছিলাম—তাহা হঠাৎ মনে পড়িল,—'এ ত সুধা নয় সুধা নয়, কুরুকুলক্ষয়কারী গরলরাশি, খেলায় সাগরে সে রূপসী!' আরও মনে পড়িল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই রচনা, যে রচনায় তিনি দ্রৌপদী-চরিত্রের সমালোচনা উপলক্ষে

কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ভগবানের প্রতি নির্ভরতাপূর্ণ উক্তির প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন, "ইহা কবিত্বের চরমোৎকর্ষ!" ইহার উপর আর লেখনী চলে না।